বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

খাগড়াছড়ি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

খাগড়াছড়ি

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমন্বয়কারী

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

সংগ্রাহক

চিংলামং চৌধুরী

পপেন ত্রিপুরা

অমল বিকাশ ত্রিপুরা

লিসা চাকমা

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
খাগড়াছড়ি

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১৭

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত পঞ্চাশ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : KHAGRACHARI (Present state of Folklore in Khagrachari District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 250 only. US$: 5

ISBN-984-07-5326-06

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্ত র্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার

www.pathagar.com

জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements)

www.pathagar.com

কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/ উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/ উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/ উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/ উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/ উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/ উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/ উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/ উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/ উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/ বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics)

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথষ্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

www.pathagar.com

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায়

www.pathagar.com

করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক মো. নাজমুল হুসাইন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে খাগড়াছড়ির সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৭২
ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. বনভূমি ও গাছপালা
ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঙ. জনবসতির পরিচয়
চ. নদ-নদী ও খাল-বিল
ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি
ঞ. মুক্তিযুদ্ধ
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৭৩-৯৫
ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকছড়া

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৯৬-১০৬
লোকশিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১০৭-১১৮
ক. লোকপোশাক
খ. অলংকার

লোকসংগীত ও গাথা (folk song & ballad) ১১৯-২২৪

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২২৫-২২৭
ক. খাম/খ্রাম/ঢোল
খ. সুমুর/বাঁশি/বাঝি
গ. দাংদু/হেংগরং/ খ্রেখ্রং
ঘ. ধুদুক

www.pathagar.com

ঙ. শিঙে
চ. মুরোলি বাঝি

লোকউৎসব (folk festival) ২২৮-২৪১
ক. ত্রিপুরা বিবাহ
খ. মারমা বিবাহ
গ. চাকমা বিবাহ
ঘ. হাল পালানি
ঙ. লক্ষ্মীপূজা
চ. প্রবারণা পূর্ণিমা
ছ. কামি মাই খুলুম
জ. মারমাদের নববর্ষের উৎসব: সাংগ্রাই

লোকখাদ্য (folk food) ২৪২-২৪৫
ক. চাখৈ/চাখ্রৈ
খ. বাংসু/মিডুক্যেয়্যে
গ. গুদক/গুদ্যেয়্যে
ঘ. মৈত্রু/আপ্রেং/উচ্ছ্যে
ঙ. মৈ প্রেংজাক
চ. মুজাক/হেবাং
ছ. হাংজাক/শিক্যে
জ. লাকসু/হোর্বো
ঝ. মাইমি ও আওয়ান পুংজাক/বিনিহগা
ঞ. মাইজি প্রেংজাক,
ট. সান্যে পিঠা,
ঠ. বিন্নি হগা পিঠা
ড. বরা পিঠা

লোকনৃত্য (folk dances) ২৪৬-২৫৪
ক. ত্রিপুরা লোকনৃত্য : গরিয়া
খ. ত্রিপুরা লোকনৃত্য : কের
গ. মারমা লোকনৃত্য : সইঙ-আকাহ্

লোকক্রীড়া (folk games) ২৫৫-২৫৯
ক. ত্রিপুরা লোকক্রীড়া
সুকৈ, চু, দাং, গুদু, কেশক রলাইনাই, বাঁশ ঠেলা, চেচুং,
খ. চাকমা লোকক্রীড়া
গুদু হারা

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৬০-২৬৬
ক. অচাই
খ. বৈদ্য
গ. গ্রাম্য নাপিত
ঘ. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
ঙ. মৌসুমি ব্যবসায়ী
চ. জুমচাষী বা জুমিয়া

লোকচিকিৎসা (folk medicine) **ও তন্ত্রমন্ত্র** (chant) ২৬৭-২৬৯
বনজ ঔষধি ব্যবহার, দেবতা পূজা, তাবিজ, মন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ২৭০-২৭২

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২৭৩-২৭৬

লোকবিশ্বাস (folk belief) **ও লোকসংস্কার** (folk superstition) ২৭৭-২৮৭

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২৮৮-২৯৩
ক. লুসি
খ. দুক
গ. কাপড় বুননের প্রযুক্তি
ঘ. দাবা
ঙ. গাদা
চ. বাংবু
ছ. মদ বানানোর পদ্ধতি

লোকভাষা (folk language) ২৯৪-২৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

নানা জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য খাগড়াছড়ির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিকর্তা যেন নিজ হাতে যত্ন করে সাজিয়েছেন খাগড়াছড়িকে। ফেনী, চেঙ্গী ও মাইনী নদীর উপত্যকায় সাজানো পাহাড়ি গ্রাম যেন প্রকৃতির সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের প্রকৃত উদাহরণ। এখানে নলখাগড়ার বন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আপন আলোয় উদ্ভাসিত করে, হাজারো পাহাড়ি ছড়া ও চঞ্চল ঝর্ণা ছুটে চলে আপন খেয়ালে। ছোট-বড় পাহাড়, পাহাড়ের খাদ দিয়ে এঁকে বেঁকে মিলিয়ে যাওয়া সর্পিল পথ ও পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা আদিবাসী সংস্কৃতি বিমোহিত করে প্রকৃতি-প্রেমীদের।

খাগড়াছড়ি নামের উৎপত্তি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। ১৯৬৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত খাগড়াছড়ির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে তেমন লেখা হয় নি। ১৮৬০ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে জারিকৃত বৃটিশ সরকারের প্রজ্ঞাপন নং-৩৩০২ অনুসারে আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে 'রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০' মূলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' জেলা ঘোষিত হওয়ার সময় খাগড়াছড়ির 'রামগড়' ছিল তিনটি মহকুমার মধ্যে একটি। ১৯৬৮ সালে খাগড়াছড়িকে থানা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এটি রামগড় মহকুমাধীন মহালছড়ি থানার অধীনস্থ একটি ইউনিয়ন ছিল মাত্র। মধ্যযুগে খাগড়াছড়ির মাইনী উপত্যকাটি ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ 'রিয়াং' প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করেন, খাগড়াছড়ি নামটি এই শহরের বুক চিরে ছুটে চলা 'খাগড়াছড়ি' নামের ছোট ছড়ার নামে হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পৌরসভার মধ্যকার 'খাগড়াপুর' নামক গ্রামের নামেই খাগড়াছড়ি নামকরণ হয়েছে। তাহলে আসুন দেখা যাক, 'খাগড়াপুর' নামটিই বা কিভাবে এসেছিল। এই গ্রামের বয়োবৃদ্ধ গুনাধর ত্রিপুরা (হর্দমিনিফা) বলেন, বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে ভাগ্যের সন্ধানে আসা দিঘলীরাম ত্রিপুরা তাঁর তিন পুত্র জাঙ্গারাই, মুজারাই ও তুজারাই নলখাগড়ার বন পরিস্কার করে এখানে বসতি গড়ে তোলেন। এই গ্রামের জমিজমার দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করলে এখনও এই তিন ভাইয়ের নাম পাওয়া যাবে। একসময় তাঁরা একটি প্রাইমারি স্কুল করার উদ্যোগ নেন। প্রাইমারি স্কুলটির নাম দিতে গিয়েই অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঠিক করা হয় 'খাগড়াপুর'- নলখাগড়া কেটে গড়ে তোলা গ্রাম। এই নামকরণের পূর্বে গ্রামের নামটি সাকা পাড়া, হারুং পাড়া ও খামা পাড়া তিন ভাগে পরিচিত ছিল। আর এই খাগড়াপুর নাম থেকেই খাগড়াছড়ি নামটি এসেছে বলে অনেকের ধারণা। তবে এ নিয়ে কিছু ভিন্নমতও পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, খাগড়াছড়ি নামের অনুকরণেই খাগড়াপুরের নামকরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

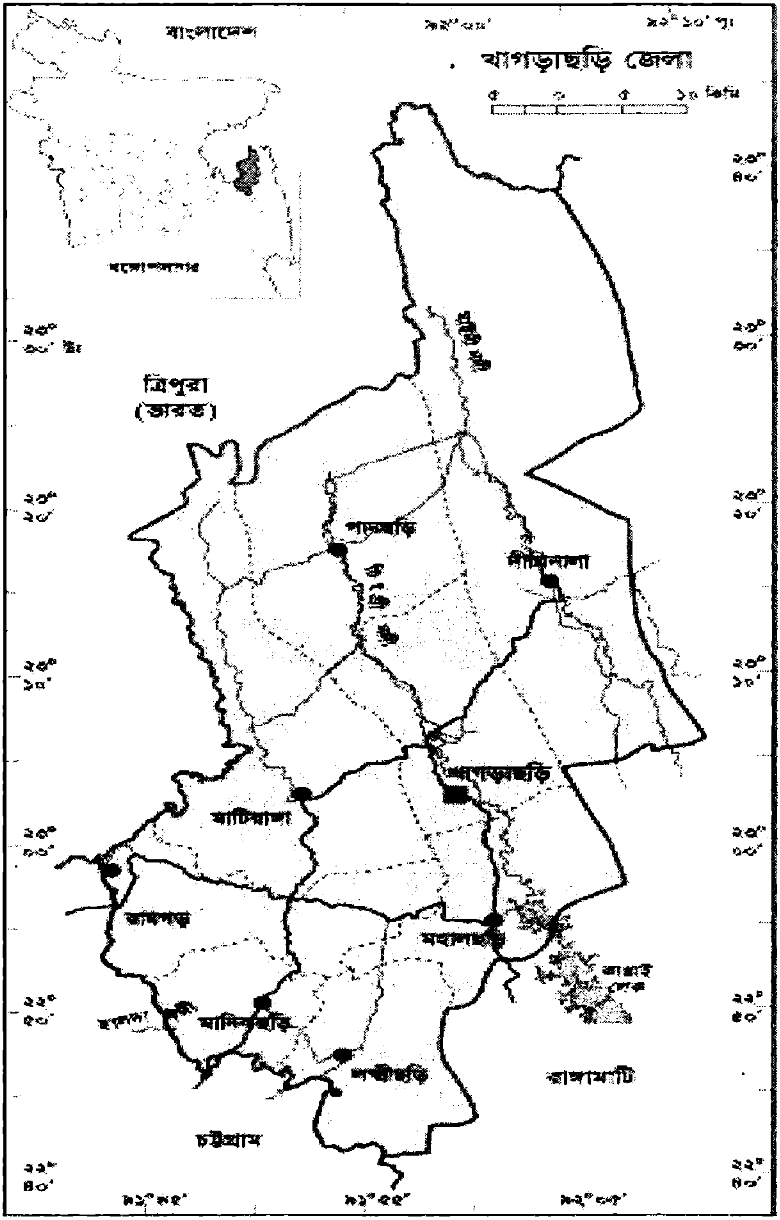

মানচিত্রে খাগড়াছড়ি জেলা

www.pathagar.com

অন্যদিকে চাকমা সমাজে অতি প্রচলিত একটি লোকশ্রুতি অনুসারে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে রামকমল চাকমা নামের একজন ভাগ্যান্বেষী তার জ্ঞাতি ভাইদের সাথে নিয়ে খাগড়াছড়ির তীরে একটি গ্রাম গড়ে তোলেন। তারা সেখানে বসতি স্থাপনের সময় কিছু পুরনো বসতি, আম, কাঁঠাল, তেঁতুল ও বটগাছ দেখেছিলেন বলে জানা যায় এবং গ্রামটি ত্রিপুরাদের একটি গোত্র রিয়াং জনগোষ্ঠির পরিত্যক্ত বসতি ছিল বলে তারা জানতে পারেন। রামকমল চাকমা নানিয়ারচর এলাকার তৈচাংমা থেকে প্রথমে খাগড়াছড়ির দক্ষিণে কমলছড়ি এলাকায় কিছুদিন থেকে পরে খাগড়াছড়ি ও চেঙ্গী নদীর মোহনায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেন। নদীর তীরে ধানী জমিতে ধান চাষ করে কর্মঠ রামকমল ও তাঁর জ্ঞাতিরা একসময় মহাজনে পরিণত হন। ফলে তাঁদের গ্রামটির নাম 'মহাজন পাড়া' নামে পরিচিতি লাভ পেতে থাকে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি শহরে প্রবেশের মুখে মহাজন পাড়া নামের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম দেখা যায়। তারা বসতি গড়ার সময় খাগড়াছড়ি ছড়ার দুই পার প্রচুর নলখাগড়ায় আচ্ছাদিত ছিল বলে খাগড়াছড়ি নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

সরকারি দলিলপত্রাদিতেও খাগড়াছড়ি নামের উৎপত্তি হিসেবে বলা হয়েছে, নামটি এসেছে নল খাগড়ার বন থেকে। খাগড়াছড়ি শহরের বুক চিরে বয়ে চলা পাহাড়ি ছড়া খাগড়াছড়ির দুই তীরে ছিল একসময় গভীর নলখাগড়ার বন। এই নলখাগড়ার বন থেকেই খাগড়াছড়ি নামের উৎপত্তি বলে জানা যায়। খাগড়াছড়ি জেলা তথ্য বাতায়নে খাগড়াছড়ির প্রাচীন নাম 'তারক' ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজাদের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'শ্রী শ্রী রাজমালা' গ্রন্থে ত্রিপুরা মহারাজা হরিরায় রাজপুত্রদের মধ্যে প্রদেশ বা বিভিন্ন শাসনাঞ্চলের শাসনভার প্রদানের বিবরণে 'তারক' নামের একটি শাসনাঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। শ্রী শ্রী রাজমালার বিবরণে বলা হয়-

নিজরাজ্য ভ্রমি রাজা সকল দেখিল।
সপ্তদশ পুত্রে রাজ্য ভাগ করি দিল।।
রাজাফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান।
রাজা করিল তাকে 'রাজনগর' স্থান।।
আর পুত্র 'তারক' স্থানেতে রাজা হৈল।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ৫০৯১ বর্গমাইল সীমানাবিশিষ্ট দেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন জেলার মধ্যে প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ জেলা হল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি জেলাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামে জেলার মর্যাদা লাভ করে ১৮৬০ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হতে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে এবং খাগড়াছড়ি জেলা স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা পায় ১৯৮৩ সালে। খাগড়াছড়ি জেলাটি ২২.৩৮ ডিগ্রি হতে ২৩.৪৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৪৪ ডিগ্রি হতে ৯২.১১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। প্রায় ২৭০০ বর্গ

www.pathagar.com

কিলোমিটার সীমানা বিশিষ্ট এই জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা এবং পশ্চিমে ফেনী নদী ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে উঁচু-নিচু পাহাড়, জানা-অজানা পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য পাহাড়ি ছড়া, নদী, ঝর্ণা এবং সমতল ভূমি খাগড়াছড়ির বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। জেলার মোট ভূমির ২,২৪২.৪৪ বর্গকিলোমিটার বনাচ্ছাদিত। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মোট ৮টি উপজেলা রয়েছে; খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, মহালছড়ি ও লক্ষীছড়ি। এই জেলার মোট পুলিশ থানার সংখ্যা ৯ টি, ইউনিয়ন সংখ্যা ৩৬ টি, মৌজা সংখ্যা ১২১ টি এবং গ্রামের সংখ্যা ১,৭০২ টি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধিকাংশ এলাকা মং সার্কেলের অধীনে এবং কিছু অংশ চাকমা সার্কেলের অধীনে। জেলার উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণির মধ্যে আলুটিলা (সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ১০০০ ফুট উঁচু), মায়ুং কপা বা হাতি মুড়া (সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় সাড়ে ১২০০ ফুট উঁচু), মাতাই তুয়ারি বা মাতাই পুখির (সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু), মাতাই লাখু (সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ৮০০ ফুট উঁচু), ভগবান টিলা (সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ১৬০০ ফুট উঁচু) অন্যতম।

গ. বনভূমি ও গাছপালা

খাগড়াছড়ি বনাচ্ছাদিত একটি জেলা। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও এখানে এমন অনেক বন ছিল যেখানে বনের আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্যের তাপ মাটিতে পৌঁছাতে পারতো না। তাই সবসময় এখানকার মাটি স্যাঁতস্যাঁতে থাকতো। বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতো বনের ভিতর। পাহাড়, ছড়া, নদী ছিল গাছ-পালা আর সবুজে ঘেরা। মানবজাতির চাহিদা অনুসারে বনজ ঔষধি গাছপালা, লতাগুল্ম পাওয়া যেতো বনে, এমনকি লোকালয়ের কাছাকাছিতেও। বিশাল উঁচু গাছপালার ডালে শোভা পেতো নানা রঙের অর্কিড ফুল।

পার্বত্য অঞ্চলের গাছপালা নানা স্তরে বিভক্ত। কিছু কিছু স্তরের গাছপালা বিশালাকৃতির হয়। এটিকে গাছপালার প্রথম স্তর বলা যেতে পারে। আকাশছোঁয়া উচ্চতার এসব গাছপালা প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ মিটার লম্বা হয়। এসব গাছপালার গুঁড়ি ও আকার বেশ বড়ো হয়। তীব্র রোদ ও বাতাসের সাথে মোকাবেলা করে এসব গাছপালা টিকে থাকে। এই স্তরের গাছপালায় ঈগল পাখি, বানর, হনুমান, উল্লুক, বাদুর, ধনেশ পাখি, রাজধনেশ, ভীমরাজ পাখির বসবাস চোখে পড়ে।

৩০ থেকে ৩৫ মিটার উচ্চতার গাছপালা দেখা যায় দ্বিতীয় স্তরের বনে। বনাঞ্চলের সবচেয়ে ঘন এবং সবুজ গাছপালার স্তর এটি। উপর থেকে দেখলে এটিকে সবুজ ছাউনির মতো মনে হয়। এই স্তরের গাছগুলোও প্রচুর সূর্যের আলো আর বৃষ্টির স্পর্শ পায়। এই স্তরের গাছপালা থেকে বনের পশু-পাখি সহজে খাবার সংগ্রহ করতে পারে। তাই এই স্তরের গাছপালায় নানা জাতের পাখি বাসা বাঁধে। এ স্তরের গাছপালায় বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে কাঠবিড়ালী, কাঠঠোকরা, ময়না, টিয়া, লেমুর, বানর, ব্যাঙ, সাপ ও নানা প্রজাতির সরীসৃপ অন্যতম।

www.pathagar.com

তৃতীয় স্তরের বনে জন্মায় কচি গাছপালা আর লতাগুল্ম। বনের ঘন সবুজ ছাদ ভেদ করে সামান্য কিছু সূর্যের আলো এই স্তরে পৌঁছায়। তবে এখানেও বিভিন্ন ধরণের প্রজাপতি, ব্যাঙ, আর সাপের দেখা মেলে। মাটির সবচেয়ে কাছাকাছি বা চতুর্থ স্তরের বনে বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন, তৃণলতা ও চারা গাছের অবস্থান। বেঁচে থাকার জন্য যেসব প্রজাতির খুব অল্প আলো প্রয়োজন হয়, শুধু সেসব প্রজাতিই এই স্তরে জন্মায়। বনের এই স্তরে সূর্যের আলো পৌঁছায় মাত্র ২ শতাংশ। এই বনের মাটি প্রায় সময়ই স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। এই মাটিতে প্রচুর ঝরাপাতা, মরা গাছ-পালা, মৃত পশু-পাখির দেহ পঁচে থাকে। এসব মৃতদেহ পঁচে মাটিকে উর্বর করে তোলে। তাই গাছপালা দ্রুত বড় হয়ে ওঠে।

খাগড়াছড়ির বনে বিচরণ করা প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, গয়াল, শিয়াল, হায়েনা, বাঘদাস, বনবিড়াল, গন্ডার, বুনো শুকর, কাঠবিড়ালী, গুই সাপ, অজগরসহ নানা জাতের সাপ, লাল শালিখ, কালো শালিখ, বক, ডাহুক, বাদুই, বাবুই, হরিণ, বল্লা হরিণ, ময়না, শ্যামা পাখি, খঞ্জন, কাকাতুয়া, তিতির পাখি, বনমোরগ, মথুরা, শকুন, লজ্জাবতী বানর, কাক, মাছরাঙা, বুনো হাঁস, কচ্ছপ, ঘুঘু, বনকবুতর, পেঁচা, হুতুম পেঁচা, বউ কথা কউ, ময়ূর, বনরুই, ব্যাঙ, ভোঁদর, সাপ, তক্ষক, নানা জাতের গিরগিটি, নানা জাতের ঝিঁ ঝিঁ পোকা ইত্যাদি। আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগেও খাগড়াছড়ির বনে বনে হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, ময়ূর ইত্যাদি প্রাণী দেখা গেলেও এখন এসব প্রাণী বিরল প্রজাতির মধ্যে পড়ে।

খাগড়াছড়ির বনে নানা ধরণের জঙ্গলী ফলদ গাছও দেখা যায়। ফলদ গাছগাছালির মধ্যে ডুমুর, গুটগুটি, লটকন, আমলকি, বহেরা, হরিতকি, জাম, গাব, বনকাঁঠাল, মাধবী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

খাগড়াছড়িতে জন্ম নেওয়া বনজ গাছগাছালির মধ্যে গর্জন, বনতেঁতুল, কড়ই, গামারী, সেগুন, চাপালিশ, ঝাঁটা বড়ই, চাঁপাফুল, শিমুল, জারুল, কনক গাছ, স্বর্ণালী, মিন্দা, জাম, বট, বকুল, নিম, বুরু, কৃষ্ণচূড়া, মাধবী, থুঁত রাঙা, ছাতিম, উদোলগাছ ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া নানা জাতের বাঁশও খাগড়াছড়ির বনে জন্মায়।

এছাড়া সৃজিত বাগানের ফলফলাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- তেঁতুল, আম, কাঁঠাল, লিচু (চায়না-২, চায়না-৩), কমলা, জাম্বুরা, মালতা, সাতকড়া, লটকন, আমলকি, বহেরা, হরিতকি, কুল (আপেল কুল, বাউকুল, দেশী কুল ইত্যাদি), জাম, গোলাপ জাম, পেঁপে, কলা (চাঁপা কলা ও কঁঠালি/বাংলা কলা ব্যাপকভাবে প্রচলিত), নারিকেল ইত্যাদি।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপজেলাভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

উপজেলার নাম	বন (বর্গকিলোমিটার)
দিঘিনালা	২৯৮.৮৭
সদর	২৭৭.৮৬
লক্ষীছড়ি	১৪০.৮৫
মহালছড়ি	২০২.৬৯
মানিকছড়ি	৮০.৩৮
মাটিরাঙ্গা	৪০৪.৯৩
পানছড়ি	৩০৫.৭৭
রামগড়	১২৭.১৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১

www.pathagar.com

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন অংশ তখন বিভিন্ন গোত্রীয় প্রধানদের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। ১৬৬৬ খ্রি. হতে ১৭৬০ খ্রী. পর্যন্ত মোগল শাসনামলে এবং ১৭৬০ হতে ১৮৬০ খ্রি. পর্যন্ত বৃটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলটি 'কার্পাসমহল' নামে পরিচিত স্বতন্ত্র একটি শাসন বহির্ভূত পার্বত্য অঞ্চল ছিল। এই সময়ে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠির সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ পার্বত্য অঞ্চলের উপর ছিল না। ১৮৬০ সালে জুন মাসের ২০ তারিখে জারিকৃত বৃটিশ সরকারের প্রজ্ঞাপন নং- ৩৩০২ আনুসারে আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে 'রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০' মূলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' জেলা নামের একটি স্বতন্ত্র জেলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সময় রামগড় মহকুমার অধীনে রামগড় সদর, মহালছড়ি ও দীঘিনালা নামের তিনটি থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে (১৭ জানুয়ারি ১৯০০ খ্রীঃ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত বা শাসন বহির্ভূত অঞ্চলের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পাকিস্তান শাসনামলের ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এই মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। ১৯৬৮ সালে খাগড়াছড়িকে থানায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে জারিকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন নং- ED (J. AII 76183-348) dated 13th October 1983 মূলে খাগড়াছড়ি জেলা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ১ নভেম্বর তারিখ হতে কার্যকর হয়।

রামগড় মহকুমা থাকাকালে ব্যবহৃত মহকুমা প্রশাসকের বাংলো

www.pathagar.com

অন্যদিকে, স্মরণাতীত কাল হতেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাটি স্থানীয় বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠির গোত্রভিত্তিক গোত্র প্রধানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হতো। স্মরণাতীত কাল থেকেই ছোট ছোট এলাকা ও পাড়াভিত্তিক সামন্ত জমিদার ও মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে চলতো নিজস্ব সামাজিক বিচার-আচারসহ সকল শাসনব্যবস্থা। মূলত ১৭৬০ সালে বৃটিশ শাসনের ছোঁয়া লাগার সাথে সাথে পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। শাসন বহির্ভূত বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা দিয়ে রাখলেও কর আদায়ের সুবিধার্থে মোগল ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি এখানে কিছু শাসনব্যবস্থা প্রয়োগের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৮৮২ সালে বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কাসালং, মাইনি, চেঙ্গী ও ফেনী নদী উপত্যকার মধ্যবর্তী পাহাড় শ্রেণীর শিরা বরাবর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে 'মং সার্কেল' প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয়ে একটি একক শাসন কাঠামোর আওতায় চলে আসে। এই মং সার্কেলের সদর দপ্তর মানিকছড়ি থানায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

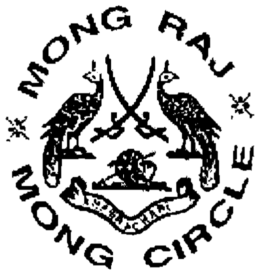

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলের মধ্যে মং সার্কেলের ঐতিহাসিক দলিল পত্রাদি খুবই সীমিত। এটা ধারণা করা হয় যে, মং সার্কেলের প্রথম রাজা ছিলেন রাজা কংজয়, যিনি তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'D'poy' বা 'The Royal Sword' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক হিসেবে একটি তলোয়ার উপহার পেয়েছিলেন। এই ঘটনাবলী সম্ভবত ১৮১০ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। রাজা কংজয় এই উপাধির কারণে রাজা কংজয় ডি'পয় নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেন।

মং সার্কেলের বর্তমান রাজা সাচিং প্রু চৌধুরী ২০০৯ সালে অভিষিক্ত হন। মং সার্কেলের অন্যান্য রাজা বা সার্কেল প্রধানরা হলেন রাজা ক্যজ সাইন (১৮২৬-১৮৭০), রাজা নারোবোধি সাইন (১৮৭০-১৮৭৯), রাজা ক্যউজ প্রু সাইন (১৮৭৯-১৮৮৪), রাজা নেপ্রু সাইন (১৮৮৪-১৯২৯), রানী নিউমা দেবী (১৯২৯-১৯৫৪), রাজা মংপ্রু সাইন (১৯৫৪-১৯৮৪), রানী নিহার দেবী (১৯৮৪-১৯৯১), রাজা পাইহ্লাপ্রু চৌধুরী (১৯৯১-২০০৮)।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মং সার্কেলের তৎকালীন রাজা মংপ্রুসাইন পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। ১৯৭১ সালের ১ মে দেশপ্রেমিক এই রাজা তাঁর রাজ্য, রাজত্ব, রাজভান্ডার, রাজসিংহাসন, অগুণতি ধন সম্পদের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাজবাড়ী ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সপরিবারে চলে যান।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যার সমাধান করে এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে দফায় দফায় সংলাপের আয়োজন করে। এক পর্যায়ে এই আলোচনায় অনিশ্চয়তা দেখা দিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ১৯৮৮ সালে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপ শুরু করে। সংলাপের এক পর্যায়ে ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়, যা জাতীয় সংসদে তিনটি বিল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কার্যকর করা হয়। সংলাপে জাতীয় কমিটির নেতৃত্ব দেন তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন উপেন্দ্র লাল চাকমা। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং ৬ মার্চ তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। ১০ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে এই পরিষদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহবায়ক আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই চুক্তি সম্পাদনকালে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের পতন হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহম্মদ-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি জেএসএস-এর সাথে আলোচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলেও উভয় পক্ষ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। অন্যদিকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় সংসদের চীপ হুইফ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এই কমিটির সাথে ধারাবাহিক সংলাপ শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মতি দেয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ্‌ ও পার্বত্য জনগণের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে পার্বত্য এলাকায় কয়েক দশক ধরে বিরাজমান অস্থিতিশীল সমস্যার সমাধানের নানা ব্যবস্থা ছিল বিধায় এটি 'শান্তিচুক্তি' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই চুক্তির ফলে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গেরিলা শাখা শান্তিবাহিনীর যোদ্ধারা অস্ত্রসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া সকল শরনার্থী স্বদেশের ফিরে আসেন। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালের ১০ নং আইনের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে তা পুনর্গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই পরিষদটি জেলার সকল সরকারি দপ্তর এবং এনজিওসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমম্বয় সাধন করে আসছে। জেলার জনগণের কাছে পরিষদটি উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ঙ. জনবসতির পরিচয়

প্রকৃতি, জনসমষ্টি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বাঙ্গালি ও সাঁওতালদের আবাসভূমি। বৃটিশ আমলের পূর্ব হতেই এখানে জনবসতি ছিল বলে জানা যায়। আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এলাকাভিত্তিক সামন্ত জমিদাররা নিজ নিজ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাই এখনো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধিকাংশ গ্রাম বা পাড়ায় একক জনগোষ্ঠি বা জাতিগোষ্ঠির মানুষের বসবাস দেখা যায়। চাকমা গ্রামে কেবল চাকমা, মারমা গ্রামে কেবল মারমা, ত্রিপুরা গ্রামে কেবল ত্রিপুরা, সাঁওতাল গ্রামে কেবল সাঁওতাল এবং বাঙালি গ্রামে কেবল বাঙালিরাই বসবাস করেন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে এখন অনেক এলাকায় বিশেষ করে হাট-বাজারের কাছাকাছি এবং শহরের পাড়া-মহল্লাগুলোতে এখন মিশ্র জাতিগোষ্ঠির মানুষদের বসবাস দেখা যাচ্ছে এবং তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সর্বত্র চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই তিন জাতিগোষ্ঠির মানুষের বসতি দেখা যায়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার

www.pathagar.com

আগে এই জেলার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে বিশেষ করে রামগড়, মাটিরাঙা, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা, পানছড়ি ইত্যাদি এলাকায় ত্রিপুরাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বলে বিভিন্ন প্রাচীন দলিল ও প্রতিবেদনে দেখা যায়। স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা এই অঞ্চলে বসবাস করতো। এই জাতিগোষ্ঠির রিয়াং গোত্রের লোকদের এখন আর বাংলাদেশে দেখা যায় না। মাইনি উপত্যকা বা মাইনি ভ্যালি নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত দীঘিনালার বিস্তীর্ণ উপত্যকা একসময় রিয়াং প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। জীবিকার সন্ধানে বা অন্য কোনো অজানা কারণে তারা খাগড়াছড়ির মূল ভূখণ্ড হতে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে হতে মাইনি উপত্যকায় গিয়ে বসতি গড়ে তুলে। ১৮৬০ সালের দিকে বৃটিশ সরকার এই এলাকাকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করলে রিয়াংদের শেষ দলটি মাইনি ছেড়ে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের মূল ভূখণ্ডে চলে যায়।

পার্বত্য অঞ্চলের জনবসতি বিষয়ে বিরাজ মোহন দেওয়ান তাঁর 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন- 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে চাকমারা ধীরে ধীরে এই জেলায় প্রবেশ করেন.. .. ..। এই জেলায় তাহাদের আগমনের পূর্বে এই জেলার অধিবাসীরূপে তখন ত্রিপুরা, রিয়াং, মগ আর কুকিরাই ছিল প্রধান। চেঙ্গী ও কাচলং ভেলী সম্পূর্ণ ত্রিপুরা জাতিতে অধ্যুষিত ছিল। তখনকার সময়ে প্রসিদ্ধ ত্রিপুরা সর্দার তমজাং রোয়াজা সমস্ত চেঙ্গী ও কাচলং ভেলী শাসন করিতেন।'

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা ৬,১৩,৯১৭ জন যার মধ্যে পুরুষ ৩,১৩,৭৯৩ জন এবং মহিলা ৩,০০,১২৪ জন। জেলার মোট পরিবার সংখ্যা ১,৩৩,৭৯২ টি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই জেলায় পাহাড়ি ও বাঙ্গালি জনসংখ্যার অনুপাত ৫২:৪৮। পাহাড়িদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমা ৫৪.১১ শতাংশ, ত্রিপুরা ২৪.৯৪ শতাংশ, মারমা ২০.৬৯ শতাংশ এবং অন্যান্য ০.২৫ শতাংশ। জেলার মোট গ্রামের সংখ্যা ১,৭০২ টি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২২৩ জন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার আয়তন:

উপজেলার নাম	মোট আয়তন (বর্গকিলোমিটার)
দিঘিনালা	৬৯৪.১১
সদর	২৯৭.৯১
লক্ষীছড়ি	২২০.১৪
মহালছড়ি	২৫১.২২
মানিকছড়ি	১৬৮.৩৪
মাটিরাঙ্গা	৪৯৫.৪০
পানছড়ি	৩৩৪.১০
রামগড়	২৮৭.৮৯

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১

www.pathagar.com

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষার হার:

উপজেলার নাম	শিক্ষার হার	নারী	পুরুষ
দিঘিনালা	৪৬.২	৩৯.১	৫২.৫
সদর	৫৭.১	৫০.৪	৬৩.২
লক্ষীছড়ি	৩৫.২	২৬.৭	৪৩.১
মহালছড়ি	৪৪.৪	৩৭.৪	৫০.৯
মানিকছড়ি	৪০.৭	৩৭.৩	৪৪.১
মাটিরাঙ্গা	৪৪.২	৩৯.৩	৪৯.০
পানছড়ি	৪২.৩	৩৫.৭	৪৮.৭
রামগড়	৪৪.৯	৩৯.৮	৪৯.০

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রধান প্রধান নদী হল চেঙ্গী, মাইনি ও ফেনী। এছাড়া অসংখ্য পাহাড়ি ছড়া ও ঝর্নার অবস্থান এই জেলায় রয়েছে। তেরাং তৈ ক্লাই ও তৈদু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অন্যতম প্রাকৃতিক ঝর্না যা পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু নুনছড়ি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত মাতাই তুয়ারি বা মাতাই পুখির একটি প্রাকৃতিক লেক। সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা জনজাতির নিকট এই লেকটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পূজিত হয়। লেকটি পর্যটকদের নিকট 'দেবতাপুকুর' হিসেবে অধিক পরিচিত। খাগড়াছড়ির কয়েকটি প্রধান প্রধান নদ-নদীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল–

ফেনী নদী

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রাচীন শহর রামগড়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর নাম ফেনী। ত্রিপুরা মহারাজা ধন্য মাণিক্যের আরাকান বিজয়ী সেনাপতি রামচন্দ্র নারায়ণের দূর্গ এই নদীর কূলে স্থাপিত ছিল বিধায় শহরের নাম হয়েছিল রামগড়। এটি তিন পার্বত্য জেলার প্রাচীন মহকুমাগুলোর মধ্যে একটি। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা বরাবর ফেনী নদীটি বয়ে চলেছে। এই নদীর উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ি জেলার ভগবান টিলায় আঠারমুড়া পর্বত। এটি রামগড় নদী হিসেবেও পরিচিত। উৎপত্তিস্থল হতে ফেনী জেলার মূল ফেনী নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ কিলোমিটার। এই নদীটি বিভিন্ন এলাকায় তৈমা, বড় নদী ইত্যাদি নামে পরিচিত। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত হতে উৎপন্ন প্রায় ২০০ ছড়া ও হাজাসহ বিভিন্ন ছোট ছোট নদী এই নদীর সাথে মিশে গেছে।

www.pathagar.com

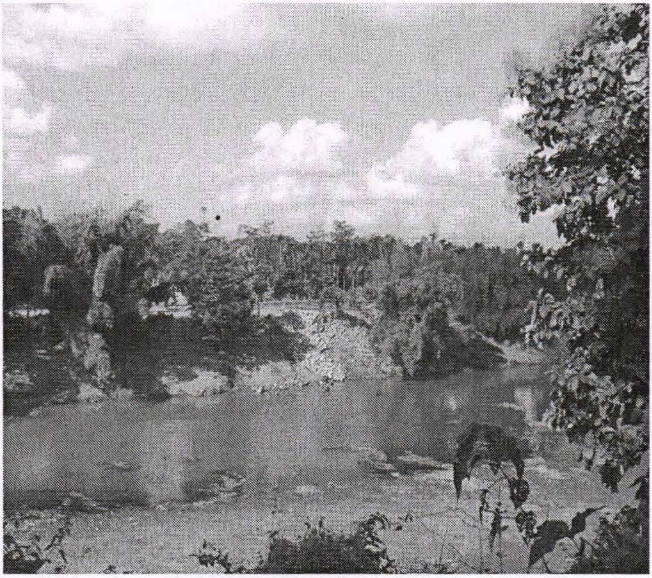

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা বরাবর বয়ে চলা ফেনী নদী

চেঙ্গী নদী

খাগড়াছড়ি শহরের বুক চিরে বয়ে চলা জেলার প্রধান নদীর নাম চেঙ্গী। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎপত্তি। আঠারমুড়া থেকে প্রবাহিত হয়ে লোগাং, পানছড়ি, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি, মাইসছড়ি হয়ে মহালছড়িতে গিয়ে কাপ্তাই লেকের সরোবরে মিলিয়ে গেছে চেঙ্গীনদীর স্রোতধারা। এই নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। কথিত আছে ত্রিপুরা মহারাজের এক সেনাপতির নাম ছিল চেঙ্গী। তিনি জনৈক বিধবা রমণীর রূপে প্রেমাসক্ত হন। উক্ত রমণী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেনাপতি এই নদের পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। ত্রিপুরার সেনাপতি চেঙ্গীর আত্মবিসর্জনের জলস্রোত হিসেবে তাই কালে কালে এই নদের নাম চেঙ্গীনদী নামে পরিচিতি লাভ করে। সেনাপতি চেঙ্গী যে স্থানে বসত করেছিলেন, সেই স্থানের নাম আজও চেঙ্গী পাড়া ও চেঙ্গী মৌজা হিসেবে পরিচিত। খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত হতে নির্গত প্রায় ২৫০টি ছড়া চেঙ্গী নদে মিলিত হয়েছে।

মাইনি নদী

ত্রিপুরা রাজ্যের লংতরাই পর্বত ও লুসাই পর্বতসহ অসংখ্য পাহাড়ি ছড়ার স্রোতধারা মিলে মাইনি নদী সৃষ্টি হয়েছে। দীঘিনালা উপজেলার পূর্বভাগে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলি নদীতে মিলিত হয়েছে নদীটি। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। অতীতে মাইনি নদীর অববাহিকায় ত্রিপুরা জাতির রিয়াংগণের আবাসস্থল ছিল। এর উর্বর উপত্যকায়

www.pathagar.com

প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো বিধায় নদীটির নাম হয়েছে মাইনি। ত্রিপুরা 'মাইনি হা' শব্দের অর্থ হলো 'ধানের দেশ'। ত্রিপুরা মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য ১৬৬২ থেকে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মাইনি নদীর তীরে নির্বাসন জীবন কাটিয়েছিলেন। এই সময় তিনি এই উপত্যকায় যে দীঘিটি খনন করেছিলেন সেই দীঘির নামেই এই উপজেলার নাম হয়েছে দীঘিনালা।

আলুটিলা পাহাড়ের উপর থেকে চেঙ্গী নদীর দৃশ্য

উর্বর পলিমাটিতে বেষ্টিত মাইনি নদী

www.pathagar.com

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৪৭ টি। তার মধ্যে কলেজ ৭টি, হাই স্কুল ৭১ টি (সরকারি ৫ টি ও বেসরকারি ৬৬ টি), প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪২০ টি (সরকারি ৩২০ টি ও বেসরকারি ১০০ টি), কিন্ডারগার্টেন স্কুল ৯ টি, মাদ্রাসা ১৩ টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২২ টি, কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ১ টি এবং টেক্সটাইল ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১ টি। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানিকছড়ি রাণী নিহার দেবী উচ্চ বিদ্যালয়, রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ ও রামগড় সরকারি কলেজ অন্যতম।

খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সামান্য দক্ষিণে চেঙ্গী নদীর অববাহিকায় আলুটিলার কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা একটি নিভৃত ত্রিপুরা জনপদ ঠাকুরছড়া গ্রাম। এই গ্রামের কৃতি সন্তান শিক্ষানুরাগী শরৎচন্দ্র রোয়াজা। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে একটি 'নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়' যা তখন লোওয়ার প্রাইমারি (এলপি) স্কুল হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত ছিল। এই বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন মংসাঅং মগ জি.টি.। ১৯২২ সালে মতান্তরে ১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্র রোয়াজা, গোলাবাড়ী মৌজার হেডম্যান রাজচন্দ্র চৌধুরী, মহাজনপাড়া নিবাসী রাজকমল মহাজন এবং তদানিন্তন সাব স্কুল ইন্সপেক্টর কৃষ্ণ কিশোর চাকমা-এর প্রচেষ্টায় মহাজনপাড়া লোওয়ার প্রাইমারি (এলপি) স্কুল ও ঠাকুরছড়া লোওয়ার প্রাইমারি (এলপি) স্কুল একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শান্তি আশ্রম উচ্চ প্রাইমারি স্কুল'। প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় খবংপড়িয়া নিবাসী জয় চাকমা জি.টি.কে।

উদ্যোক্তাদের গতিশীল চিন্তা-চেতনায় ও প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালে এই আপার প্রাইমারি (ইউপি) স্কুল মিডল ইংলিশ (এমই) স্কুলে রূপান্তরিত হয়। প্রবোধ চন্দ্র মুৎসুদ্দি আই.এ. ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক। এই বছরেই বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'খাগড়াছড়ি এম ই স্কুল' রাখা হয়। কোনপ্রকার সরকারি মঞ্জুরি ছাড়াই এই এম ই স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। জনগণের চাহিদা ও উত্তরোত্তর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৬ সালে এই স্কুলটিকে জুনিয়র স্কুল করার জন্য আবেদন করা হয়। শিক্ষা বোর্ড সচিব মিঃ ভি. সি. প্রিন্স স্কুল পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৪৭ সাল থেকে ৭ম শ্রেণি খোলার অনুমতি দেন। ফলে ১৯৪৮ সাল হতে জুনিয়র স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। ঠাকুরছড়া নিবাসী বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা বি,এ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ।

১৯৫৭ সালে এই স্কুলে ৯ম শ্রেণি খোলা হয় এবং এই বছরেই সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন অত্র এলাকার কৃতিছাত্র নবীন কুমার ত্রিপুরা বি.এ। ১৯৫৮ সালে ১০ম শ্রেণি খোলা হলে এটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় অর্থাৎ খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় রূপে আবির্ভূত হয়। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিপুলেশ্বর দেওয়ান বি.এ। ১৯৬১ সালে

www.pathagar.com

সহকারী প্রধান শিক্ষক নবীন কুমার ত্রিপুরা-কে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর কর্মকালিন সময়েই ১৯৭৭ সালে এ বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৯১ সাল থেকে খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফ্‌ট্ চালু করা হয়।

রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অন্যতম প্রাচীন একটি উপজেলার নাম রামগড়। বর্তমানের রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি সম্পূর্ণ সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল রামগড় উচ্চ বিদ্যালয়। ১০ একর ৫২ শতক জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটি ১৯৬৮ সালের ১ মে জাতীয়করণ করা হয়। ২২৯ নং মৌজার তৎকালীন হেডম্যান বাবু কংজঅং চৌধুরীর দান করা জমির উপর এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন এ এম ইসহাক।

রামগড় উচ্চ বিদ্যালয় একটি সমন্বিত বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই পড়ালেখা করতো। কিন্তু ১৯৬৪ সালে এই উপজেলায় বালিকাদের জন্য বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয় 'রামগড় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হলে এই স্কুলে কেবলমাত্র বালকদের ভর্তির সুযোগ রাখা হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে তাই এই স্কুলে কেবল ছাত্রদেরই ভর্তি নেওয়া হচ্ছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বিদ্যালয়ের মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১ নং সেক্টর-এর সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান যুদ্ধ চলাকালীন সময় মাস খানেক সময়ের জন্য বিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারি প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নান লস্কর-এর অফিসকক্ষে অবস্থান করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, দলিল, নথি ও কাগজপত্র আক্রান্ত হয়। তাই, এখন এই স্কুলের প্রাচীন কোন দলিল আর পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রাচীন জেলা না হলেও পুরনো দিনের কিছু রাজপরিবারের স্মৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনা ও নিদর্শন এই জেলায় রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থাপনার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

মানিকছড়ির মং রাজবাড়ি

অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত মং রাজার প্রাসাদ খাগড়াছড়ির অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই প্রাসাদটি ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও সমতল থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল। পরে পাক হানাদার বাহিনী প্রাসাদটির দখল নিয়ে এর ভেতরকার মূল্যবান সম্পদ তছনছ করে দিলেও এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত নানুমা দেবী হলটি ১৯৭১ সালে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও অসুস্থ শরণার্থীদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

মানিকছড়ির প্রাচীন মং রাজবাড়ির একটি অংশ

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নানা ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী এই রাজবাড়ি। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে সম্মুখ সমরে বহু পাকিস্তানি সেনাকে সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তিবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ি পুনরুদ্ধার নিশ্চিত হলে পাকিস্তানি সেনারা এই প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রাসাদটি খাগড়াছড়ি জেলা সদর হতে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে পড়ে। জেলার প্রাচীন লোকালয়গুলোর মধ্যে এই রাজপ্রাসাদের অবস্থান যেখানে, সেই মানিকছড়ি অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই মানিকছড়িতে বহু গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন সংঘটিত হয়েছিল।

বিজিবি'র জন্মস্থান

বর্তমানের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সূচনা হয়েছিল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলায়। বীরত্ব ও ঐতিহ্যের গৌরবমণ্ডিত সুশৃঙ্খল এই আধা-সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন সশস্ত্র বাহিনী। বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার প্রতিরোধসহ অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে অতন্দ্র প্রহরি এই বিজিবি-এর বয়স এখন সোয়া ২শ' বছর। এই বাহিনীর প্রথম নাম ছিল 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন'। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গঠিত 'ফ্রন্টিয়ার প্রটেকশন ফোর্স'-এর নাম পরিবর্তন করে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' নামে এই বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাকালে ৪৪৮ জন সদস্যের দুইটি অনিয়মিত অশ্বারোহী দল ও ছয় পাউন্ড গোলার চারটি কামান নিয়ে এই বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮৬১ সালে ১৪৫৪ (মতান্তরে ১৪৫৮ জন) জন নিয়মিত ও অনিয়মিত পুলিশ বাহিনীর সদস্য নিয়ে 'ফ্রন্টিয়ার গার্ডস' নামে রামগড় লোকাল বাহিনীর পুনর্গঠন করা হয়। এই বাহিনীর সদরদপ্তর স্থাপন করা হয় চট্টগ্রামে, যার অধীনে কামরূপ, গোয়ালপাড়া, লক্ষীপুর, সিলেট ও ত্রিপুরার সীমান্ত ফাঁড়িগুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৭৯ সালে 'স্পেশাল রিজার্ভ ফোর্স' মতান্তরে 'স্পেশাল রিজার্ভ কোম্পানি' নামে এই বাহিনীর সদস্যগণ পিলখানায় ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং তখন থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে এই বাহিনীর কার্যক্রম এখানে পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৮৯১ সালে এই বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ' এবং ঢাকা, খুলনা, ভাগলপুর ও গ্যাংটক এই ৪টি কোম্পানিতে ভাগ করে একজন ইউরোপীয় সুবেদারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯২০ সালে বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশের নাম পরিবর্তন করে 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেল্‌স' রাখা হয় এবং ১৬টি প্লাটুনে বিভক্ত করে সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এই বাহিনীর নাম হয় 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স' যা সংক্ষেপে 'ইপিআর' নামে পরিচিত। কোলকাতা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি দল, কতিপয় বাঙালি সদস্য ও তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের এক হাজার প্রাক্তন সৈনিক এই বাহিনীতে যোগ দান করেন। পরবর্তীতে তিন হাজার বাঙালি সদস্য এই বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তখন থেকেই দক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার স্বার্থে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৫৮ সালে এই বাহিনীর হাতে চোরাচালান দমনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এই বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন এবং ১৪২ সদস্য জাতীয় বীরত্বপূর্ণ খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ এই বাহিনীর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স (বিডিআর)'। ১৯৮০ সালের ৩রা মার্চ তারিখে রাইফেল্‌স সপ্তাহ প্যারেড অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ রাইফেল্‌সকে জাতীয় পতাকা হস্তান্তর করেন। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বাহিনীর সদর দফতর পিলখানায় সংঘটিত বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) আইন, ২০১০' পাশ হয় এবং ২০ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়। এরপর থেকে সীমান্তের এই অতন্দ্র প্রহরিরা 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' বা সংক্ষেপে 'বিজিবি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

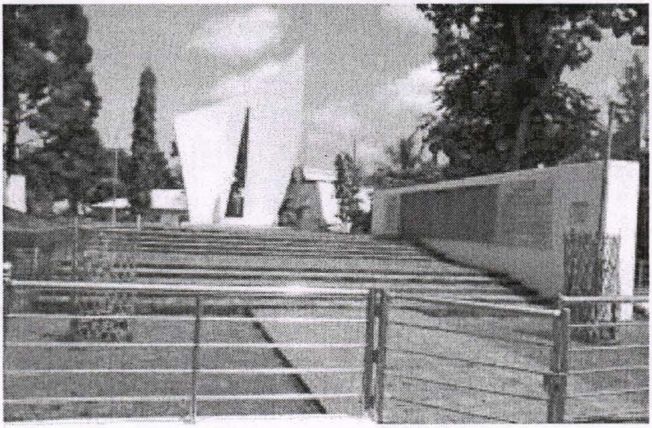

রামগড়ের বিজিবি স্মৃতিফলক

রামগড়ের বিজিবি'র জন্মস্থানে স্থাপিত রেপ্লিকায় বিজিবির পোশাকের ক্রমবিবর্তন-

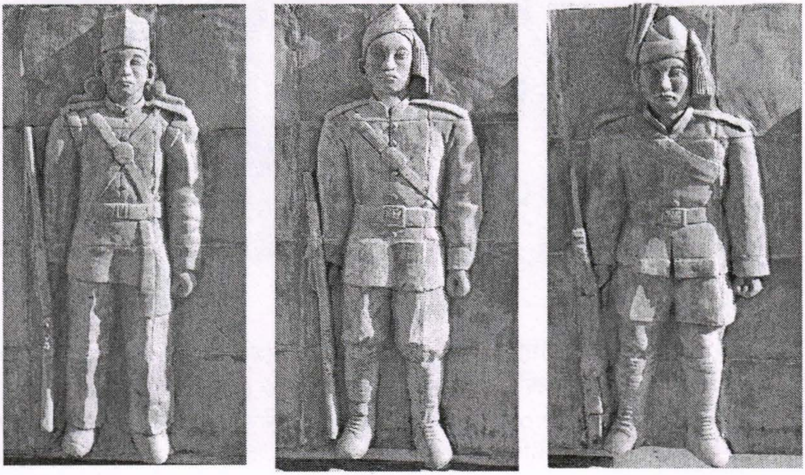

www.pathagar.com

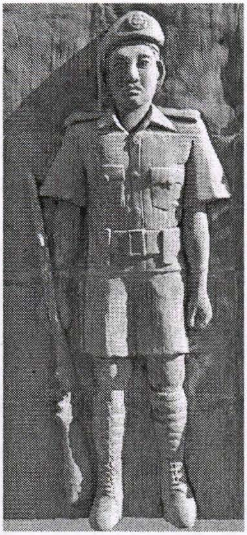

য়ংড বৌদ্ধবিহার

খাগড়াছড়ি বাজারের দক্ষিণপ্রান্তে য়ংড বৌদ্ধবিহার নামের একটি শতবর্ষী স্থাপনা রয়েছে। ১৮৯৭ সালে খাগড়াছড়ি'র স্বনামধন্য ধনাঢ্য ব্যক্তি রেম্রাচাই চৌধুরী এই বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ১৯০৪ সালে বিহারটির আধুনিকায়ন করা হয়। বিহারের অভ্যন্তরে বুদ্ধ মূর্তিটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বালম্বিভাবে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্থাপিত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ বিগ্রহগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা রেম্রাচাই চৌধুরী ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ১৮৯৭ সালে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার পর দেখলেন মন্দিরটিকে ঘিরে বিভিন্ন পূজা-পার্বন অনুষ্ঠিত হলে পূজা সামগ্রী বিকি-কিনির জন্য ছোট-খাটো হলেও একটি হাট বা বাজার বসানো দরকার। তাই তিনি একটি হাট বসানোর উদ্যোগ নিলেন। হাট বসাতে গিয়ে যখন ক্রমে জনবসতি বাড়তে থাকলো এবং নানা ধর্মের মানুষ এই হাটে নানা উপলক্ষে সমবেত হতে শুরু করলো তখন সকল ধর্মের মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি হিন্দুদের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও মুসলমানদের জামে মসজিদ তৈরির জন্য তাঁর নিজের নামীয় জমি দান করেন। খাগড়াছড়ি জেলায় প্রথম বাঙালি বসতি স্থাপনকারী আনছু মিঞা (বলি) এই রেম্রাচাই রায়বাহাদুরের হাত ধরেই খাগড়াছড়িতে এসেছিলেন বলে জানা যায়। মৃত্যুকালে রায়বাহাদুর এই আনছু মিঞাকে ৩২ কানি জমি দান করে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমান খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি খাগড়াছড়ি এমই স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালে তিনি সেই স্কুলের জন্যও জায়গা দান করেছিলেন।

এই বৌদ্ধ বিহারকে ঘিরে যে মেলাটি স্বদেশের মাটির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেটি ছিল বুদ্ধ মেলা। ফাল্গুনী পূর্ণিমারতিথিতে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বিধায় প্রতি ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে এই বুদ্ধমেলা শুরু হতো। কথিত আছে যে, মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করতে পারলেও মেলাটির শেষ নির্ণয় করা ছিল খুবই কঠিন। এই মেলা একবার শুরু হলে এলাকাবাসী মেলার জোয়ারে এমন নিমগ্ন থাকতো যে দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ আর পক্ষের পর মাস চলে গেলেও মেলায় অংশগ্রহণকারীদের ঘরে ফেরার হুঁস থাকতো না। শেষ পর্যায়ে এমনও নাকি হয়েছিল রীতিমত পুলিশ নামিয়ে অংশগ্রহণকারী ও ব্যবসায়ীদের ঠেঙিয়ে মেলার এলাকা হতে বের করে দিয়ে তবেই মেলা সমাপ্ত করা সম্ভব হতো। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে মূলত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে মানত করা শত শত ব্যক্তি প্রবর্জ্জা (স্বল্পকালীন সময়ের জন্য গৃহত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ঘেরোয়া বসন ধারন করে মন্দিরবাসী হওয়া) গ্রহণ করার জন্য য়ংড মন্দিরে আসতো। মেলাটি সাধারণত একমাস সময়কাল ধরে চলতো।

মেলাকে ঘিরে সার্কাস, পুতুল খেলা, বলি খেলা, যাদু খেলা, যাত্রাপালা ইত্যাদির আয়োজন করা হতো। তাই মেলাটি কেবল বাঁধাধরা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি পেরিয়ে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতো। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সকল ধর্মের মানুষ এই মেলায় সমবেত হতো।

বিহারের অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বালম্বিভাবে অর্ধশায়িত মহামতি বুদ্ধ ও তাঁর সামনে বসা শিষ্যদের মূর্তি তাঁর পরিনির্বাণকালে শিষ্যদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দৃশ্যের একটি রিপ্লিকা। শাস্ত্রে আছে মহাপরিনির্বাণকালে গৌতম বুদ্ধকে তাঁর শিষ্যরা ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ জানতে চেয়েছিলেন। কোনো কোনো শিষ্য তাঁদের ভেষজ পাণ্ডিত্য ব্যবহার করে মহামতি বুদ্ধকে ঔষধ খাইয়ে সুস্থ করতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, সকল মানবের জন্ম যেমন সত্য, তেমনি তার মৃত্যুও

www.pathagar.com

অবধারিত। তাই, ঔষধ খেয়ে তাঁর আরোগ্য লাভের কোনো বাসনা নেই। গৌতম বুদ্ধের এই পরিনির্বাণকালে অন্যান্য শিষ্যদের সাথে তাঁর প্রধান শিষ্য নন্দলাল, বোধিসত্ব প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। য়ংড মানে আয়েশে শায়িত।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস মহামতি বুদ্ধ পরিনির্বাণকালে আয়েশে শয়ন করে নির্বাণে গমন করেছিলেন। এই বিহারে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন সুবিধাও প্রদান করা হয়। খাগড়াছড়ির বিখ্যাত 'বুদ্ধ মেলা' পার্বত্য অঞ্চলের প্রাচীন মেলা পার্বনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে প্রখ্যাত ছিল। কালের বিবর্তনে এই মেলার জৌলুস আর আগের মতো নেই। বিভিন্ন বৌদ্ধপার্বন, পূর্ণিমা তিথি ও চৈত্রসংক্রান্তির সময়ে এই মন্দিরে দায়ক-দায়িকার পাশাপাশি বহু ধর্ম ও জাতির ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল নামে। এখনও নানান বৌদ্ধ তিথিতে এখানে দর্শনার্থী ও পূণ্যার্থীদের সমাবেশ ঘটে। এই মন্দিরকে ঘিরে এখনও উৎসবে মেতে ওঠে পাহাড়ি-বাঙালি সকলে।

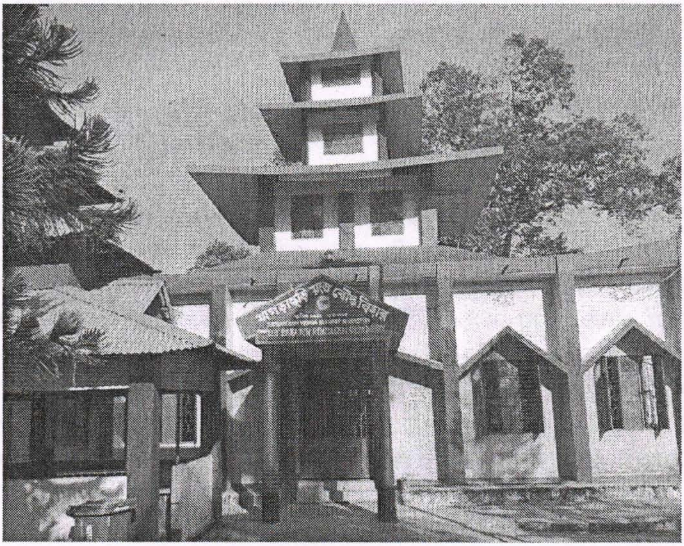

জেলার প্রথম শহিদ মিনার

১৯৬৮ সালে বর্তমান রামগড় উপজেলার রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়-এ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় । ১৯৬৮ সালে শহীদ মিনারটি ছিল তিন ফুট (আনুমানিক) কাঁচা ইটের তৈরি। রামগড়ের স্থায়ী বাসিন্দা ও তৎকালিন রামগড় মহকুমার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু মং-ম্রাইহ্লাপ্রু চৌধুরীর সহায়তায় তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এই মিনারটি নির্মাণ করেন। ১৯৭১ সালের নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৮ ডিসেম্বর রামগড় হানাদার মুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে রামগড়ের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে অমলিন রাখার লক্ষ্যে এই মিনারটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। মিনারের ডিজাইন সংগ্রহ করেন রামগড় সরকারি উচ্চ

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ের তৎকালীন বিএসসি শিক্ষক এমআর খান। নির্মাণ কাজে মিস্ত্রী ছিলেন আব্দুর রউফ। মুক্তিযোদ্ধা মুলকুতুর রহমানের উদ্যোগে স্থানীয় বিত্তশালীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মিনারটির আধুনিক রূপ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সুলতান আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা দুলাল চন্দ্র দেসহ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা এই শহীদ মিনার নির্মাণে বিশেষ অবদান রাখেন। বর্তমানে এই শহীদ মিনারটি রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে নির্মিত শহিদ মিনারটিই এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

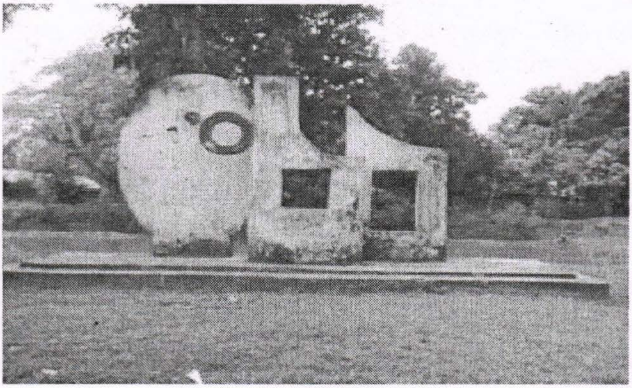

শহিদ মিনার

ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

খাগড়াছড়ি নানা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ভরপুর একটি জেলা। বৃটিশ সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার আগে এই জেলাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বিভিন্ন স্থানীয় সামন্ত রাজাদের দ্বারা পরিচালিত হত। ১৮৬০ সালে এখানে বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের সময় এই এলাকাটি পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে খাগড়াছড়ির সর্বস্তরের জনগণ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে সম্মুখ সমরে শহীদ হন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন আবতাবুল কাদের, স্থানীয় চাকমা সমাজপতি চিত্তরঞ্জন কার্বারি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করেন এই জেলার মং রাজা মংপ্রুসাইন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মং সার্কেলের তৎকালীন রাজা মংপ্রুসাইন পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। ১৯৭১ সালের ১ মে দেশপ্রেমিক এই রাজা তাঁর রাজ্য, রাজত্ব, রাজ ভাণ্ডার, রাজ সিংহাসন, অগুণতি ধন সম্পদের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাজবাড়ী ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সপরিবারে চলে যান। তিনি তাঁর রাজ ভাণ্ডার হতে ৩৩ টি উন্নত মানের আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি উইলি জীপ ও একটি ফোর্ড কার মুক্তিবাহিনীকে দান করেন এবং পাক হানাদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সমতল জেলাগুলো থেকে পালিয়ে আসা

www.pathagar.com

শরণার্থীদের আশ্রয়ের জন্য তিনি রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে শরণার্থী শিবির স্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি সদলবলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ইত্যবসরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মং রাজবাড়ী দখল করে নেয় এবং রাজবাড়ীতে রক্ষিত ৮টি হাতি, ৭টি উন্নত জাতের ঘোড়া, ১৭০টি মহিষ, ১৬৬৩টি গরু, চিড়িয়াখানা ভর্তি বাঘ, হরিণ, জেব্রা, গিনিপিগ, সজারু, খরগোস, ভাল্লুক, জিরাফ ইত্যাদি, ৯০,০০০ হাজার আড়ি ধান, ১০,০০০ অতিথিকে একসাথে খাওয়ানোর মতো বিভিন্ন দেশের সৌখিন ডিনার সেট, অসংখ্য খাটপালঙ্ক, চেয়ার, স্বর্ণের বুদ্ধমূর্তি, উন্নত মানের বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, ১টি ভক্সওয়াগন কার, ১টি মারসিডিজ ব্যান্ড কার, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত দুইটি বড় তলোয়ার, বিভিন্ন দামী স্বর্ণালংকার ভর্তি একটি তেরজুরি (লোহার সিন্দুক), দামী বাদ্যযন্ত্রসহ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটপাট করে।

ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

লাল সবুজের পতাকা ও বিশ্ব-মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের মানুষের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি নারী-পুরুষ বীর সাহসী যোদ্ধাদেরও ছিল অনন্য অবদান। পাহাড়-পর্বতসংকুল ছড়া ঝর্না উপত্যকাবেষ্টিত চিরচেনা পাহাড়িয়া জনপদে আগন্তুক হানাদার শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালি মুক্তিসেনারা নিজস্ব ঢঙে রণনীতি রণকৌশল রচনা করে সহসা পরাজিত করতেন শত্রুসেনাদের। মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের ঘটনাবহুল অন্যান্য অঞ্চলের মতো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাও ছিল অন্যতম।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষণার পর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জনপদের মুক্তিপাগল মানুষগুলো সংগঠিত হতে শুরু করে। তৎকালীন খাগড়াছড়ির রামগড়, মহালছড়ি, দীঘিনালাসহ বিভিন্ন থানায় গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। পুরো মহকুমায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার জন্য গঠিত এই সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে নেতৃত্ব দেন দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও নূর বক্স মিঞা।

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার খবর খাগড়াছড়িতে এসে পৌঁছালে সকাল ১০ টায় সংগ্রাম কমিটি, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রজনতা বিশাল মিছিল নিয়ে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। রাঙামাটির অদূরে এবং ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় মহালছড়ি ছিল রণ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই জনপদ দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছার পথকে রোধ করার জন্যই এই কৌশলগত অবস্থান নেওয়া হয়। পাকিস্তানি হানাদাররা প্রতিনিয়ত রাঙামাটি হতে বুড়িরঘাট দিয়ে নৌপথে লঞ্চে করে মহালছড়িতে প্রবেশের চেষ্টা চালাতে থাকে। এই পথ দিয়ে পাকহানাদারদের আগমন ঠেকাতে গিয়েই বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ, ক্যাপ্টেন আবতাবুল কাদেরসহ নাম জানা-না জানা অনেক মুক্তিসেনা শহীদ হন।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক খাগড়াছড়িতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী, উইং কমান্ডার শামসুদ্দিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচ. টি. ইমাম, সুলতান আহম্মদ, কর্নেল অলী আহম্মদ বীরবিক্রম, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর রফিকুল ইসলাম, এম ওহাব, এম এ মান্নান, আব্দুল্লাহ আল হারুন, মির্জা আবুল মনছুর, মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর খালেদ মইন, ড. এ আর মল্লিক, সৈয়দ অধ্যাপক আলী আহসান, এস বি বিশ্বাস, সিরাজুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান, ক্যাপ্টেন আলী, ক্যাপ্টেন ভূঞা, গ্রুপ ক্যাপ্টেন সুলতান মাহমুদ, মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন মারী, ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম হতে রাঙামাটি এবং সেখান থেকে নৌপথে মহালছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি প্রবেশ করেন। এ সময় মহালছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি লঙ্গরখানা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাংগঠনিক ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। লঙ্গরখানার দায়িত্ব পালন করেন মহালছড়ির বীর মুক্তিযোদ্ধা মোবারক মাস্টার।

হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যাওয়ার প্রথম দিকে মুক্তিসেনাদের হাতে অস্ত্র বলতে ছিল কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল ও কিছু চাইনিজ রাইফেল। আর যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত অফিসার বলতে ছিলেন সুবেদার মফিজুল বারী ও সুবেদার জয়নাল আবেদীন। অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের পাশাপাশি স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করতে থাকেন সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ। ভারত থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ খাগড়াছড়ির গণ্ডি ছাড়িয়ে রাঙামাটি ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন রণক্ষেত্রেও সরবরাহ করতে হতো। রামগড় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সম্পাদক সুলতান আহম্মদের পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম এলাকার কংগ্রেস নেতারা মুক্তিযোদ্ধাদের হয়ে এসব অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতেন। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান এসেছিল। দুই ট্রাকে পাঠানো অস্ত্রের সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ ৩২ টি জীপে পরিবহন করে চট্টগ্রামের হাটহাজারি ও কালুরঘাট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনায় পাঠানো হয়েছিল। এপ্রিলের প্রথম থেকেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষের ঢল। তাঁদেরকে মহালছড়িতে অভ্যর্থনা জানিয়ে রামগড়ে নিয়ে আসা হতো চাঁদের গাড়ি বা খোলা জীপে করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে আসা যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ফিল্ডে পাঠানো, আশ্রয়ের খুঁজে সীমান্ত পাড়ি দিতে আসা বিভিন্ন এলাকার মানুষদের সংগঠিত করতে এ সময়ে হিমশিম খেতে হচ্ছিল সংগঠকদেরকে। ৯ এপ্রিল ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের যুদ্ধে অংশ নিতে আসা দামাল ছেলেদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন, যা ১০ এপ্রিল তারিখ হতে পূর্ণ মাত্রায় শুরু হয়।

প্রথম থেকেই রামগড়ে যুদ্ধপরিকল্পনা করে ঠিকঠাকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে বেগ পেতে হচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধা সংগঠকদেরকে। খুব কম সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে রণজিত দেববর্মন (ত্রিপুরা), বিজয়কুমার সাহা, জীতেন্দ্র মজুমদার ও মোহাম্মদ সিরাজুল হককে নিয়ে সুলতান আহম্মদ রামগড়ের টেলিযোগাযোগের পরিচালনা করতে

www.pathagar.com

থাকেন। উল্লেখ্য, রামগড় পতনের পর লাইনম্যান সোলেমান টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুমে স্থানান্তর করেন। এই সময়ে জেলা প্রশাসক এইচ. টি. ইমাম এবং এর কিছুদিনের মধ্যে মেজর জিয়া কিছু সামরিক অফিসার নিয়ে রামগড়ে আসেন। পরে মেজর রফিকুল ইসলামও রামগড়ে আসলে দুই মেজরের নেতৃত্বে খাগড়াছড়ির মুক্তি সংগ্রাম নতুন মাত্রা পায়।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আসা ও আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিতে আসা মানুষদের পানাহার ব্যবস্থার জন্য মানিকছড়ির মং রাজা বীর মুক্তিযোদ্ধা মংপ্রু সাইন গরুর গাড়ি ও জিপে করে চাউল, ডাল, তরকারি পাঠাতে থাকেন। এছাড়া তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য তাঁর নিজস্ব বাহিনীর বন্দুক ও নিজের ব্যবহৃত গাড়িও পাঠান।

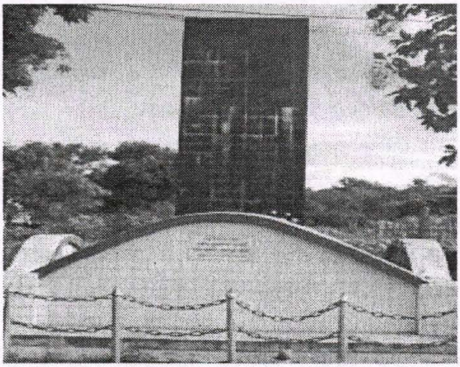

খাগড়াছড়ির সম্মুখ সমরের বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ
ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদেরের স্মৃতি ভাস্কর্য

সম্মুখ যুদ্ধের কিছু ঘটনাপ্রবাহ

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের দিকে পাকহানাদার বাহিনী খাগড়াছড়ি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ২৫ এপ্রিল মেজর মীর শওকত খাগড়াছড়িতে মেজর জিয়াসহ মুক্তিসেনাদের সংগঠিত করে যুদ্ধের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন এবং পরের দিন ২৬ এপ্রিল মেজর শওকত মহালছড়ির দিকে এবং মেজর জিয়া রামগড়ের দিকে চলে যান। এই সময় থেকেই খাগড়াছড়িতে সম্মুখ সমর শুরু হয়।

২৭ এপ্রিল পাকবাহিনী রাঙামাটি থেকে লঞ্চযোগে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মুক্তিসেনারা প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের প্রবল সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং হানাদার বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেন। কিন্তু আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত ও সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকবাহিনীর সাথে নামেমাত্র প্রশিক্ষণ পাওয়া মুক্তিসেনাদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সম্মুখযুদ্ধে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হলে তাঁকে রামগড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রামগড়ে নেওয়ার পথে জালিয়াপাড়ায় তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। পরে পূর্ণাঙ্গ সামরিক মর্যাদায় তাঁকে রামগড়ে কবর দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন কাদের শহিদ

www.pathagar.com

হওয়ার ফলে মহালছড়ির পতন হলো। ফলে হানাদার বাহিনীর সাহস আরও বেড়ে গেল। পাকহানাদার বাহিনী এবার রামগড়ের পতন ঘটিয়ে সীমান্ত এলাকা দখলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। রামগড়ের উদ্দেশ্যে তারা তিনদিক থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু করলো। মুক্তিসেনারা সম্মুখ সমরে টিকতে না পেরে কৌশলগত অবস্থানে সরে যেতে থাকেন।

২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল সময়কালের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলগত অবস্থানে সরে যেতে থাকেন। খাগড়াছড়ির দিক থেকে আসা হানাদার বাহিনীর আক্রমের ফলে জালিয়াপাড়ার মুক্তিযোদ্ধারা দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও নূর বক্সের নেতৃত্বে রামগড়ের দিকে পিছু হটতে থাকেন। অন্যদিকে করের হাট ও হেঁয়াকোর দিকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকা মেজর সামছুদ্দিন ও সুবেদার ফারুক উদ্দিনও প্রাণপণ চেষ্টা করে ডিফেন্স রক্ষা করতে না পারায় রামগড়ের পিছু হটে আসেন। এ সময় ক্যাপ্টেন অলির নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে অগ্রসরমান মুক্তিফৌজ হিঙ্গুলিকরের হাট ও তুলাতুলি এলাকা ছেড়ে হেঁয়াকোতে অবস্থান নেন। পাকসেনাদের উপর্যুপরি হামলায় টিকতে না পেরে মুক্তিসেনারা হেঁয়াকো ছেড়ে রামগড়ের দিকে পিছু হটেন।

১ মে পাকিস্তানের একটি সেনা ব্রিগেড তিন দিক থেকে রামগড় আক্রমণ শুরু করে। মেজর রফিক মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষার জন্য কয়েক রাউন্ড ৪´´ মটারের গোলা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। বিকাল ৪ টার দিকে সকল মুক্তিযোদ্ধা নিরাপদে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের শেষ দল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে তাঁরাও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। হানাদার বাহিনী রামগড় পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। করেরহাট থেকে রামগড় পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয় পাক হায়েনাদেরকে। মাত্র ৩০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে তাই তাদের পুরো সাতদিন লেগে যায়। রামগড় পতনের ফলে পুরো খাগড়াছড়ি মহকুমা পাকিস্তানিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম পাকিস্তানিবাহিনী দখলে নেয়।

রামগড় দখল করার পর বর্বরবাহিনী জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে এবং রামগড় হতে ভারতে চলাচলের জন্য নির্মিত সংযোগ ব্রিজটি ভেঙ্গে দেয়। খাগড়াছড়ি মহকুমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তারা ঘাঁটি স্থাপন করে এবং বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী গঠন করে। শুরু হয় বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে বর্বর অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ। পাকবাহিনী রামগড়, গুইমারা, মানিকছড়িসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে পাহাড়ি রমনীদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে অমানুষিকভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণ করে এবং ক্যাম্পে উলঙ্গ অবস্থায় বন্দি করে রাখে। বন্দি অবস্থায় অসভ্য পাক হায়েনারা তাদের ক্যাম্পের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ফেনী নদীতে বন্দি পাহাড়ি নারীদের গোসল করানোর জন্য নিয়ে যেতো। এই দৃশ্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম এলাকা থেকে স্পষ্ট দেখা যেতো। এভাবে কয়েকদিন দেখার পর ভারতে আশ্রয় নেওয়া জনতা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালে বন্দি নারীদের নদীতে নিয়ে গোসল করানো বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি চিরঅম্লান হয়ে আছে রামগড়ের ‘বিজয়’ স্মৃতিভাস্কর্যে

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম থেমে থাকে নি। তাঁরা খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর ভারতের অংশে সমবেত হতে থাকেন এবং বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানগুলোতে ঘাঁটি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

১ নং সেক্টরের আওতায় ৫ মে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হয়। এই দল গঠনে নেতৃত্ব দেন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা। এটি পরবর্তীকালে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। হেমদারঞ্জন ত্রিপুরাকে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই কোম্পানির অধীনে গ্রুপ নং- ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫ সংযুক্ত করা হয়। ১নং সেক্টরের অধীনে হরিণা থেকে ৩০ কি. মি. দূরবর্তী সীমান্ত এলাকা ভারতের বৈষ্ণবপুরে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে সাব-সেক্টর স্থাপন করা হয়। সেখানে অবস্থানরত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। পার্বত্য এলাকায় অবস্থানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলের সুবিধা, শত্রুপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত নাকাপা, কুমারী, পাগলাপাড়া, মানিকছড়ি, ডাইনছড়ি, যোগ্যাছলা ও গাড়ীটানা এলাকার গহীন অরণ্যে মুক্তিবাহিনীর গোপন ক্যাম্প বা আশ্রয়স্থল স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত গোপন গেরিলাক্যাম্পে ঐ এলাকার হেডম্যান-কার্বারীসহ সকল স্তরের জনগণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করতেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঐ সমস্ত এলাকার জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পাকবাহিনীর গতিবিধি এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করতেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শিলছড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালিকুজ্জামান চৌধুরীর পরামর্শে তবলছড়ির মুক্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ১৬ জুন পাকহানাদার বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলে মুক্তিযোদ্ধারা

www.pathagar.com

ক্যাম্প গুটিয়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। পরবর্তীতে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ১ নং সেক্টরের হরিনা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ শেষে বাংলার দামাল ছেলেরা সীমানা অতিক্রম করে নিজ দেশের মাটিতে এসে প্রবল বিক্রমে দেশমাতার মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জুলাই-আগষ্ট মাসে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেপ্টেম্বর মাস হতে খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন শুরু করে। এবারের অপারেশনে পাকহানাদার বাহিনী আর রুখে দাঁড়াতে পারে নি। প্রতিটি অপারেশনে সফলতার সাথে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে মুক্তিসেনারা।

ডাইনছড়ি আপারেশন

ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় মুক্তিসেনাদের অপারেশন। ১৯৭১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে কমান্ডার হেমদারঞ্জন ত্রিপুরার নেতৃত্বে মানিকছড়ির ডাইনছড়িতে পাকিস্তানিবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেন। ডাইনছড়ির গহিন অরণ্যে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ক্যাম্পে প্রায় ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন। একদিন দুপুরে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান স্থানীয় মারমা ও ত্রিপুরা গ্রামগুলোতে পাকিস্তানিহানাদার বাহিনী প্রবেশ করেছে। কামান্ডার হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা কালবিলম্ব না করে ১২ জনের দুর্ধর্ষ একটি গেরিলা দল নিয়ে একটি এসএমজি, ২টি এলএমজি, ৯টি এসএলআর ও বেশ কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড ও গোলাবারুদ নিয়ে অপারেশনে বেরিয়ে পড়েন। প্রায় ৩ কিলোমিটার পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে ডাইনছড়ির চেম্প্রু পাড়ার নিকটস্থ একটি টিলায় মুক্তিসেনারা অবস্থান নেন। সেখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের একটি মারমা পাড়ায় তখন অবস্থান নিয়ে ছিল হানাদার বাহিনী। এলাকাটি মানিকছড়ির মং রাজার প্রাসাদের দিকে যাওয়ার রাস্তা বিধায় পাক হানাদার বাহিনী যে কোন সময় এই পথ দিয়ে মং রাজবাড়ির দিকে যেতে পারে ভেবে মুক্তিসেনারা এই কৌশলগত অবস্থান নেন। ইতোমধ্যে মং রাজবাড়ি দখল করে পাকিস্তানিবাহিনী সেখানে তাদের ক্যাম্প বানিয়েছে। চেম্প্রু পাড়ার টিলাতে ১০ জন যোদ্ধাকে পজিশনে রেখে হেমদারঞ্জন ২ সহযোদ্ধাকে নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর অবস্থানস্থল রেকি করতে যান। উক্ত গ্রামে আক্রমণ করলে গ্রামবাসীদের ক্ষতি হতে পারে, তাই মানিকছড়ি যাওয়ার পথেই আক্রমণ চালানোর জন্য মুক্তিসেনারা সিদ্ধান্ত নেন। রেকি শেষে হেমদারঞ্জন, আলী আশরাফ ও সহযোদ্ধা দ্রুত ক্রলিং করে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে উক্ত টিলার একটি গাছের আড়ালে অবস্থান নিলেন। টিলার উপর অবস্থান নেওয়া সহযোদ্ধারা তাদের কমান্ডার হেমদারঞ্জন ও সহযোদ্ধাদের গতিবিধি লক্ষ রাখছিলেন। ঠিক সেই সময় দেখা গেল ৫০/৬০ জন পাকিস্তানিসেনা তাঁদের পিছু পিছু এসে প্রায় ৫০ গজ রেঞ্জের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। শত্রুসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে হেমদারঞ্জন, আলী আশরাফ ও টিলার উপরে অবস্থান নেওয়া অন্যান্য যোদ্ধাদের অস্ত্র একসাথে গর্জে ওঠে। অকস্মাৎ আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে হানাদার সেনারা। প্রথম ব্রাশফায়ারেই পাকিস্তানিবাহিনীর ক্যাপ্টেন গুলিবিদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যান্য পাকিস্তানিসেনারাও গুলিবিদ্ধ হয়ে চিৎকার-আহাজারি শুরু করে দেয়। পাকিস্তানিবাহিনীও মুক্তিসেনাদের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ও মর্টারের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ পাহাড়ের উপর থেকে পাকবাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ করে। এই যুদ্ধে একজন ক্যাপ্টেনসহ ১২ জন পাকসেনাকে খতম করে নিরাপদে ফিরে যান মুক্তিসেনারা। বিপর্যস্ত পাকসেনারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আশপাশের মারমা পাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

যোগ্যাছলা অপারেশন

ডাইনছড়ি অপারেশনে সফলতার পর মুক্তিসেনারা একের এক বিজয় অভিযান চালিয়ে যেতে থাকেন। কমান্ডার হেমদারঞ্জন ত্রিপুরার ৯১ নং গ্রুপ অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে মানিকছড়ির যোগ্যাছলা এলাকায় পাকিস্তানিবাহিনীর বিরুদ্ধে আরও একটি সফল অপারেশন পরিচালনা করে। এই এলাকাটি মুক্তিবাহিনী তাদের গুপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতো। তখন এই কেন্দ্রে হেমদারঞ্জন ত্রিপুরার নেতৃত্বে ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন। একদিন ইনফরমার এসে খবর দেয় যে, পাকবাহিনীর একটি দল টিলার উপরে থাকা মুক্তিবাহিনীর এই গোপন ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। ইনফরমারের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে কমান্ডার হেমদারঞ্জন তাঁর যোদ্ধাদেরকে যার যার অস্ত্র নিয়ে পজিশন নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মুক্তিবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল লাইট মেশিনগান, এসএমজি, এসএলআর রাইফেল এবং হ্যান্ড গ্রেনেড। মুক্তিসেনারা পজিশন নেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে শত্রুসেনারা তাঁদের রেঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করে। সাথে সাথে কমান্ডার হেমদারঞ্জন ফায়ারের নির্দেশ দেন। মুক্তিসেনাদের সব অস্ত্র একসাথে গর্জে ওঠে। সন্ত্রস্ত পাকিস্তানিবাহিনী মর্টারের গোলা বর্ষণ করে আক্রমণের জবাব দেয়। প্রায় ২০ মিনিট গুলিবিনিময়ের পর শত্রুপক্ষ টিকতে না পেরে পিছু হটে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ৯ জন পাকিস্তানিসেনাকে খতম করেছিলেন। এই যুদ্ধে মুক্তিসেনাদের কেউই হতাহত হন নি।

কালাপানি অপারেশন

খাগড়াছড়ির বর্তমান মাটিরাঙা উপজেলার গুমতি ইউনিয়নের একটি গ্রাম কালাপানি যা উচ্চারণ বিকৃতিতে কালাপান্যা বা কালাপানিয়া নামেও পরিচিত। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনীর একটি দল তবলছড়ির দিকে ভারতের সীমান্ত এলাকা দখলের মতলবে অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তানিসেনারা কালাপানি নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের আগমনের খবর শুনে ৯৪ নং গ্রুপের কমান্ডার আলী আশরাফ দল নিয়ে পাকিস্ত ানিসেনাদের বাধা প্রদানের জন্য তবলছড়ি থেকে ছুটে যান। মুক্তিসেনাদের সাথে পাকিস্তানিসেনাদের ভয়াবহ সংঘর্ষ বাঁধে কালাপানি পাড়ায়। নায়েক সুবেদার খায়েরুজ্জামান কিছু সৈন্য নিয়ে আশরাফ গ্রুপকে সাহায্যের জন্য সেদিকে অগ্রসর হন। এদিকে পিছন থেকে মর্টারের গোলা বর্ষণ করে বিএসএফ-এর আর্টিলারি গ্রুপ আশরাফ গ্রুপকে সাহায্য করে। অবস্থা বেগতিক দেখে হানাদার বাহিনীর সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর পুরো গুমতি এলাকায় পাকিস্তানিবাহিনীর একক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

দেওয়ান বাজার অপারেশন

অক্টোবর মাসে ভারতের সীমান্তে দেওয়ান বাজার বিওপি'র বিপরীতে ঘোড়া কাফকা এলাকায় মিত্রবাহিনী বিএসএফ-এর ফাঁড়ি পাকিস্তানিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবলছড়ি থেকে দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও মোবারক আলী মাষ্টারের নেতৃত্বে নিয়মিত বাহিনীর কিছু সেনা বিএসএফ-কে সাহায্য করার জন্য ঘোড়া কাফকার দিকে অগ্রসর হয়। আনুমানিক রাত ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত একটানা গোলাগুলি বিনিময় হয়। মুক্তিসেনা, ইপিআর ও মিত্রবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানিহানাদার বাহিনীর সেনারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ইপিআর-এর একজন সৈনিক সামান্য আহত হন এবং বিএসএফ-এর এক জওয়ান সীমান্তের ফেনী নদীতে পড়ে গেলে সাঁতার না জানার কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

মহামুনি অপারেশন

রামগড়ের মহামুনি এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল পাকিস্তানিহানাদার বাহিনী। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা হতে অনতিদূরে এই এলাকার অবস্থান বিধায় স্থানটি মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানিবাহিনী উভয়ের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুপরিকল্পিতভাবে এই অবস্থানটি দখলদারমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। হেমদারঞ্জনের বাহিনীর সুদক্ষ যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে ক্যাপ্টেন মাহফুজ এই গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেন। পাকিস্তানিবাহিনীর অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে সুদক্ষ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিবাহিনীর একজন কর্ণেলসহ ১৭ জন পাকিস্তানিসেনাকে ঘটনাস্থলেই খতম করেন এবং বহু পাকিস্তানিসেনাকে আহত করেন। এই অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধারা মর্টার ব্যবহার করেন। এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন হেমদারঞ্জনের বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা রনজিৎ ত্রিপুরা ও ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা।

রামশিরা অপারেশন

গুমতিস্থ রামশিরা এলাকায় স্থানীয় পাহাড়ি গ্রামগুলোতে অবস্থান নিয়েছিল পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকাররা। ইনফরমার মারফত তাদের অবস্থানের সংবাদ তবলছড়িতে পৌঁছালে তবলছড়ির মুক্তিযোদ্ধা হেডকেয়ার্টারের নায়ে সুবেদার খায়েরুজ্জামান ও এফএফ গ্রুপের কামভার আলী আশরাফের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জনের একটি গেরিলা দল সেদিকে অগ্রসর হন। পাকিস্তানিবাহিনী ও রাজাকারেরা টের পাওয়ার আগেই গেরিলারা চারিদিক থেকে রামশিরা এলাকাকে ঘিরে ফেলেন। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই পাকিস্তানিবাহিনী ও রাজাকারদের অবস্থানের চারিদিকে শক্ত অবস্থান গড়ে তোলেন মুক্তিযোদ্ধারা। শেষ রাতে যুৎসই সময় দেখে গেরিলারা গুলিবর্ষণ শুরু করেন। পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকাররাও পাল্টা জবাব দেয়। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে গোলাগুলি বিনিময় হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই অতর্কিত হামলায় টিকতে না পেরে পাকিস্তানিবাহিনী ও রাজাকাররা পিছু হটে গিয়ে খেদাছড়া হয়ে পলায়ন করে। এতে রামশিরা দখলদারমুক্ত হয়।

www.pathagar.com

পাতাছড়া অপারেশন

পাতাছড়ার এলাকার কালাপানি নামক স্থানে আস্তানা গেড়েছিল পাকিস্তানিবাহিনীর হানাদার সেনারা। কমান্ডার হেমদারঞ্জনের বাহিনী এই হানাদারদের ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করলো। অক্টোবরের শেষ দিকে কোন এক সময়ে হেমদারঞ্জনের বাহিনীর সাথে অংশোয়ে অং (জুলু বাবু) ও আলী আশরাফের বাহিনী মিলে তিন বাহিনীর যৌথ আক্রমণের কৌশল ঠিক করা হলো। এই তিন কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রায় ৯০-৯৫ জনের মুক্তিসেনা তিন দিক থেকে পাকিস্তানিসেনাদের অবস্থানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত হামলায় দিকবিদিক হারিয়ে পাকিস্তানিসেনারা এলোপাতাড়ি গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে হানাদার বাহিনীর সাথে গোলাগুলি বিনিময় হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে পাক হায়েনারা গভীর জঙ্গল দিয়ে মানিকছড়ির দিকে পালিয়ে যায়।

ভাইবোনছড়া অপারেশন এবং রাজাকারদের আত্মসমর্পণ

পাকসেনারা খাগড়াছড়িতে তাদের আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে পানছড়িসহ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সৈন্য ও রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করতো। সৈন্য ও রসদ পরিবহনের এই লাইন ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নভেম্বর মাসে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য আলী আশরাফ ও নিয়মিত বাহিনীর নায়েক খায়েরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা সীমান্ত এলাকা তবলছড়ি হতে ভাইবোনছড়া এলাকার দিকে অগ্রসর হন। প্রায় ১২ মাইল পাহাড়ি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মুক্তিসেনারা চেঙ্গী নদীর পশ্চিম তীরে গিয়ে উপস্থিত হন। নদীর পূর্ব তীরেই খাগড়াছড়ি থেকে পানছড়ি যাওয়ার রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই পাকিস্তানিসেনারা পানছড়িতে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করে। নদীর পশ্চিম তীরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মুক্তিসেনারা অপেক্ষা করতে লাগলেন। একসময় পাকিস্তানিসেনারা মুক্তিসেনাদের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসলে গ্রুপ লিডার আলী আশরাফ ও নায়েক খায়েরুজ্জামান গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানিহানাদাররা পাল্টা গুলিবর্ষণের চেষ্টা করলেও অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার এক সপ্তাহের পর ভাইবোনছড়া ও তবলছড়ি এলাকার মধ্যবর্তী কমলাবাগান নামক স্থানে দশজন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। তাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীর ১ নং সেক্টরের হরিণা ক্যাম্পে পাঠানো হয়।

রামগড় বিজয়

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। লালসবুজের মাঝখানে সোনালি রঙের মানচিত্র আঁকা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হলো। বিজয়ের বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে পাহাড়ে, ছড়া থেকে উপত্যকায়। এই বিজয় অর্জনের আগে ৬ ও ৭ ডিসেম্বর টানা দুইদিন ধরে পাকহানাদার বাহিনীর রামগড় হেডকোয়ার্টারের চারিদিক থেকে আক্রমণ করা হয়। স্থল ও আকাশ উভয় পথে মুক্তিসেনারা এই আক্রমণ পরিচালনা করেন। ৬ ডিসেম্বর কোনরকম আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে পারলেও দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় রামগড় হেডকোয়ার্টার

www.pathagar.com

ছেড়ে পালিয়ে যায় পাক-হায়েনারা। ডিসেম্বরের স্বচ্ছ আকাশে পত পত করে উড়তে থাকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-এর পতাকা।

তবলছড়ি, পানছড়ি ও ভাইবোনছড়া বিজয়

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ১ নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে খাগড়াছড়ি বীর মুক্তিযোদ্ধা দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী এফএফ সাবডিভিশন কমান্ডার ও সাব এডমিনিস্ট্রেটর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ৮ ডিসেম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে তাঁর প্রেরিত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি ট্রাকে করে তিনি হরিণা হতে তবলছড়ি চলে আসেন। সেখানে ক্যাপ্টেন অশোক দাশগুপ্ত ওরফে বাবুল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি খাগড়াছড়ির বিভিন্ন এলাকা মুক্তকরণের অভিযানে নেমে পড়েন। নিয়মিত বাহিনী ও এফএফ মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ অভিযানের মাধ্যমে তবলছড়ি, পানছড়ি ও ভাইবোনছড়া শত্রুমুক্ত করা হয়।

খাগড়াছড়ি বিজয়

খাগড়াছড়ি হেডকোয়ার্টার তখনও শত্রুদের কবলে ছিল। ১৪ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন অশোক ও সাবডিভিশন কমান্ডার দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ভাইবোনছড়ায় একটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং ফাইটিং পেট্রল পার্টি নিয়ে খাগড়াছড়ির দিকে অগ্রসর হন। শত্রুবাহিনীর দোসর মিজোবাহিনীর একটি দল খাগড়াছড়ি প্রবেশের মুখে গাছবান এলাকায় অবস্থান করছিল। মুক্তিযোদ্ধারা গাছবানের কাঠের সেতুর উপর পা রাখার সাথে সাথে পাহাড়ের উপর ওঁৎ পেতে থাকা মিজোবাহিনীর সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুক্তিসেনারা গুলির পাল্টা জবাব দিলে মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে মিজোরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুক্তিসেনাদের খাগড়াছড়িতে প্রবেশ নিষ্কন্টক হয়ে যায়। ১৫ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি শত্রুমুক্ত হয়। শত্রুমুক্ত হওয়ার পর সকাল ১১ টায় সাবডিভিশন কমান্ডার দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী খাগড়াছড়ি মহকুমা সদর হেডকোয়ার্টারে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

১৬ ডিসেম্বর শেষ শত্রু নিধন

১৫ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি বিজয় চূড়ান্তভাবে সাধিত হলেও মিজোদেরকে পুরোপুরি নিধন করা সম্ভব হয় নি। ১৬ ডিসেম্বর দীঘিনালায় মিজোরা হঠাৎ বিদ্রোহ শুরু করলে স্থানীয় লোকজনের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। বীর মুক্তিযোদ্ধা উকিল আহম্মদ কিছু সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁদেরকে মিজোদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। মুক্তিসেনাদের হাতে এই যুদ্ধে প্রায় ৩০.০ জন মিজো ও রাজাকার নিহত হয়। দীঘিনালা যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিযোদ্ধারা বীরবিজয়ের বেশে খাগড়াছড়ি ফিরে আসেন এবং খাগড়াছড়ি পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়।

www.pathagar.com

খাগড়াছড়ির রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন

মং রাজা মংপ্রু সাইন

১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল। পতন হলো চট্টগ্রাম শহর। চট্টগ্রামসহ আশপাশের সব এলাকা পাকিস্তানিহানাদার বাহিনীর দখলে। চারিদিকে শুরু হয়েছে বর্বর বাহিনীর গণহত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ। ভীত-সন্ত্রস্ত নগরবাসী সবকিছু ফেলে প্রাণের মায়ায় ছুটে চলেছে ভারত সীমান্তের দিকে। চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-নাজিরহাট-ফটিকছড়ি-নারায়ণহাট-হেঁয়াকো-রামগড় হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে গিয়ে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সকলে ব্যতিব্যস্ত। সেই জনস্রোতের একটি অংশ গিয়ে আছড়ে পড়েছে মং রাজার রাজবাড়ীর হেডকোয়ার্টার মানিকছড়িতে। মানিকছড়িতে এসে ভারতগামী শরণার্থীরা জমায়েত হতে থাকলে মং রাজা মংপ্রু সাইন তাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেন। পুরো মং রাজবাড়ীই তখন শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব আশ্রয়হীন অসহায় মানুষের মুখে আহার যোগানোর জন্য রাজবাড়ীর লঙ্গরখানা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাজপ্রাসাদের কম্পাউন্ডের মধ্যে খোলা হয় অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র।

এদিকে যুদ্ধের দামামা জোরদার হয়ে উঠলে রাজা মংপ্রুসাইনের তৎপরতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজবাড়ীর সর্বস্ব তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বিলিয়ে দেন। নিজস্ব প্রাইভেট কার, জীপ, নিজের ব্যবহারের সৌখিন অস্ত্র, রাজরক্ষীবাহিনীর উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি দান করেন মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকবাহিনীর হাতে রামগড় ও মানিকছড়ি পতন অত্যাসন্ন দেখে ১ মে তারিখে তিনি সপরিবারে মানিকছড়ি'র রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ত্রিপুরা রাজ্যে পাড়ি জমান। রাজা প্রথমে পরিবার পরিজনসহ ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুমে আশ্রয় নিলে সেখানে পাকিস্তানিসেনাদের গোলার আঘাত আসতে থাকায় নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় মুক্তিবাহিনীর হরিণাক্যাম্প সংলগ্ন রূপাইছড়িতে চলে যান। রাজা মংপ্রু সাইন তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে তিনি পার্শ্ববর্তী হরিণাক্যাম্পের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের রিক্রুটিং, সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণদান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা পদ্ধতির ছোটখাটো অপারেশন পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে থাকেন।

এদিকে বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকরা রূপাইছড়ি ও হরিণা ক্যাম্পে এসে রাজা মংপ্রু সাইনের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে রাজা মংপ্রু সাইন-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল একটি বিশেষ সংযোজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার আবেদন জানান। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক সরকার রাজা মংপ্রু সাইনকে তাদের পক্ষে কাজ করানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠলে তাঁকে হত্যা অথবা অপহরণ করার জন্য খাগড়াছড়ির পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থানকারী পাকহানাদার বাহিনীর দোসর মিজো বিদ্রোহীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

সংবাদটি ভারতের সীমান্তরক্ষীবাহিনী বিএসএফ জানতে পারলে রাজা মংপ্রু সাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আগরতলায় নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় অবস্থান করে মং রাজা মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। চৌকস শ্যুটার রাজা মংপ্রু সাইন তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অপারেশনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। নভেম্বর মাসের শেষদিকে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে রাজা মংপ্রু সাইন মিত্রবাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিত্রবাহিনীর সদস্যরা রাজা মংপ্রু সাইনকে অনারারী কর্নেল র‍্যাঙ্ক প্রদান করে তাদের একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নের সাথে সম্মুখযুদ্ধে পাঠান। আখাউড়া অপারেশনের পর তিনি মিত্রবাহিনীর ইউনিটের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান। তিনি আশুগঞ্জ এবং ভৈরব অপারেশনেও অংশগ্রহণ করেন। ১৭ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সাথে তিনি ঢাকা এসে পৌঁছান। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তিনি সপরিবারে মানিকছড়ির রাজবাড়িতে ফিরে যান।

মং রানী নিহার দেবী

পাকিস্তানিহানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম শহর দখল করার পর শহর জুড়ে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকলে ভীত-সন্ত্রস্ত নগরবাসী সবকিছু ফেলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর ছেড়ে ভারত সীমান্তের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। চট্টগ্রাম হতে ভারতের সীমান্তে যাওয়ার একটি পথে শরণার্থীদের মানিকছড়ির উপর দিয়ে যেতে হয়। অন্যপথটি হেঁয়াকোর উপর দিয়ে চলে গেছে। মানিকছড়ি দিয়ে যাওয়া আশ্রয়প্রার্থীদের ঢল নামে মানিকছড়ির মং রাজবাড়ীতে। নরনারী শিশুসহ আবালবৃদ্ধ-বণিতার জনস্রোত মানিকছড়ির রাজবাড়িতে এসে জমায়েত হতে থাকে। ক্রমেই রাজবাড়িটি অসহায় জনতার একটি আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব অসহায় মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য রাজবাড়ির রান্নাভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয়। রাজবাড়ির বিশাল আকারের রান্নাঘরটিতে বড় বড় হাঁড়িতে পাক চলতে থাকে রাতদিন। রানী নিহার দেবী অসহায় জনতার আহার সংস্থানের তদারকিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এক সময় তিনি খেয়াল করেন আশ্রয়প্রার্থী জনতার মধ্যে নারী ও শিশুরা নানা রোগে ভুগছে। গর্ভবতী নারীরা কাতরাচ্ছে গর্ভযন্ত্রণায় বা প্রাক-প্রসব নানা স্বাস্থ্য জটিলতায়। রানী এসব অসুস্থ আশ্রয়প্রার্থীদের মাতৃস্নেহে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষা শুরু করেন। ক্রমেই রাজবাড়ি কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত নানুমা দেবী হলঘরটি হাসপাতালে পরিণত হতে থাকে। রাজা মংপ্রু সাইনের স্ত্রী রানী নিহার দেবী নিজেই ধাত্রী হিসেবে অসুস্থ মা-বোনদের চিকিৎসা সেবা দিতে থাকেন। বহু গর্ভবতী মা-বোনদের তিনি নিজ হাতে সন্তান প্রসব করতে সাহায্য করেন। রানীর দেখাদেখি এলাকার অনেক মা-বোন রোগীদের সেবায় এগিয়ে আসেন। রানী এভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের কাছে ত্রাতারূপে আবির্ভাব হয়েছিলেন। তাই শরণার্থীরা রানীকে মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতো।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকালীন হাসপাতাল মং রাজার রাজ বাড়ির 'নানুমা দেবী হল'

আফতাব কাদের

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসেবে যোগ দেওয়া আফতাবুল কাদের পরে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পান। খাগড়াছড়িতে সকলের নিকট শহীদ কাদের নামে বেশি পরিচিত। খাগড়াছড়ি শহর হতে রাঙামাটি ও মহালছড়ির দিকে যাওয়ার মূল রাস্তাটি তাঁর নামানুসারে (শহীদ কাদের সড়ক) নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ছুটিতে থাকা অবস্থায় ক্যাপ্টেন কাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পালিয়ে রামগড়ে চলে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের ১ নং সেক্টরে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তিনি। এই যুদ্ধে একটি গ্রুপের অধিনায়ক হিসেবে তিনি খাগড়াছড়ি মহকুমার মহালছড়িতে গিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি যখন মহালছড়িতে পৌঁছান সে সময় এলাকাটি ছিল পাকবাহিনীর রণকৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে। রাঙামাটি হতে পানিপথে মহালছড়িতে প্রবেশের প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছিল হানাদার বাহিনী। কারণ, মহালছড়ি দখল করতে পারলেই কেবল রামগড় পতন ঘটানো সম্ভব। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে মিজো যোদ্ধারা, যারা পাকসেনাদের হয়ে হত্যা-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৭ এপ্রিল বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে মিজো যোদ্ধারা হঠাৎ করে রণাঙ্গনে থাকা ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান নানা কায়দায় তাঁর বাহিনীকে নিয়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে থাকেন। হাজার হাজার মিজোর আক্রমণে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান পিছু হটে যেতে থাকেন। দিশেহারা ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য লেঃ মাহফুজ দুটি কোম্পানি নিয়ে মিজোদের উপর পাল্টা আক্রমণে অবতীর্ণ হন। মিজো যোদ্ধারা লেঃ মাহফুজের পুরো কোম্পানিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। শত্রুবাহিনী পরিবেষ্টিত অবস্থায় লেঃ

www.pathagar.com

মাহফুজ মহালছড়ির মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টারে মেজর শওকতের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ পাঠান। হিংস্র মিজোদের আক্রমণের তীব্রতা অনুমান করতে পেরে মেজর শওকত ক্যাপ্টেন কাদের ও ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ক্যাপ্টেন কাদের ও ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান লেঃ মাহফুজকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের নাজুক অবস্থা দেখে মেজর শওকত মহালছড়ি হেডকোয়ার্টার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সতর্কতা ও শক্তি নিয়োগ করেন। চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের প্রকৌশলী ইসহাকও মেজর শওকতকে সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সকল প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে সহস্রাধিক মিজো সেনা ও ১২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, শক্তিশালী মর্টার ও স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র নিয়ে আকাশ ও স্থল উভয় পথে আক্রমণ করে। পাকহায়েনা ও তাদের দোসর মিজোদের তীব্র আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত মহালছড়ি হেডকোয়ার্টার রক্ষায় গৃহিত মুক্তিযোদ্ধাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা ছিল প্রশিক্ষিত কমান্ডো যোদ্ধা। অন্যদিকে মিজো বাহিনীর প্রতিটি যোদ্ধা ছিল পাহাড়ে যুদ্ধ করতে পারদর্শী ও হিংস্র যোদ্ধা। ক্যাপ্টেন কাদের গোলাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছুটে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকেন, যাতে করে অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু এমন চরম মুহূর্তে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার জীবন বাঁচিয়ে রাখা তিনটি এলএমজির একটি বিকল হয়ে পড়ে। তাতে অস্থির হয়ে পড়েন ক্যাপ্টেন আফতাব। ক্রলিং করে তিনি এলএমজিটি হাতে নিয়ে আবারও সচল করতে চেষ্টা করতে থাকেন। আর তখনই ঘটে যায় হৃদয়বিদারক ঘটনাটি। গোলাগুলির এক পর্যায়ে শত্রুর লাইট মেশিনগানের একটি গুলি ক্যাপ্টেন কাদেরের পাঁজর বিদীর্ন করে দেয়। মুহূর্তেই তরুণ অফিসারের তাজা রক্তে ভিজে যায় ঘামে ভেজা শার্ট। বাংলার মাটি ভিজে যেতে থাকে বীর সন্তানের রক্তে। বর্তমান মহালছড়ি উপজেলার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে থাকা কবরস্থানের ডানপার্শ্বের বটগাছের নিচে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। প্রচন্ড গোলাগুলির মধ্যে মেজর শওকতের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধা ফারুক সিপাহী আব্বাস ক্যাপ্টেন কাদেরকে চিকিৎসার জন্য রামগড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রামগড় নেওয়ার পথে জালিয়া পাড়ায় পৌঁছলে ক্যাপ্টেন কাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরে তাঁকে রামগড়ে নিয়ে গিয়ে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। ক্যাপ্টেন কাদের শহীদ হওয়ার পর রসদও নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে থাকেন এবং মহালছড়ির পতন ঘটে। শহীদ ক্যাপ্টেন কাদেরকে সমাহিত করার সময় তাঁর হাতে মেহেদীর রঙ জ্বলজ্বল করছিল, হাতের আংটিটিও তখন নতুন ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। হাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের লেখা *'মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আফতাব কাদের বীর উত্তম'* বই থেকে জানা যায়, পাকিস্তান আর্মির সদস্য ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পাওয়া আফতাব দেশের উত্তাল সময়ে ১৯৭১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছুটি নিয়ে ঢাকায় ফেরেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে তাঁর প্রেমিকা জুলিয়ার সাথে দেখা করতে যান এবং হঠাৎ বিয়ের পিঁড়িতে বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি একে অপরকে আংটি পড়িয়ে দেন। এরপরই তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ততদিনে উত্তাল মার্চের দিনগুলি অনিবার্য যুদ্ধের হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। ২৭ মার্চ ভোরে

www.pathagar.com

প্রিয়জনদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘর ছাড়েন ক্যাপ্টেন আফতাব। ইচ্ছা ছিল চট্টগ্রামে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবেন। কিন্তু ফেনীতে পৌঁছামাত্র পাকিস্তানি সন্দেহে তাঁকে গ্রামবাসী আটক করে। পরে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জেনে তাঁকে তাদের সাথে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করেন। সেখানে বিভিন্ন সফল অপারেশনে অংশ নেন তিনি। পরে রামগড়ের উদ্দেশে ফেনী ছাড়েন আফতাব। রামগড়ে মুক্তিযুদ্ধে সদ্য যোগ দেওয়া যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভার পড়ে তাঁর উপর। মহালছড়ি থেকে মুক্তিসেনা পাঠানোর অনুরোধ আসায় আফতাব দলবল নিয়ে ১৪ এপ্রিল মহালছড়ি উপস্থিত হন। এর পরের ঘটনাপ্রবাহ সকলের জানা। সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পর্বতসংকুল খাগড়াছড়িতে এসেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসীম সাহসের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে বীরউত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তোফায়েল আহমেদ

খাগড়াছড়ির রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ। জন্ম বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার মিরপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম বসিরউল্লাহ খান এবং মায়ের নাম আরেফাতুননেছা। তোফায়েল আহমেদ চাকরি করতেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে বদলি হয়ে তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চট্টগ্রামস্থ সি কোম্পানিতে নায়েব সুবেদার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেলেন, রামগড় দখলের জন্য পাকিস্তানি সেনারা এগিয়ে আসছে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল অবস্থান চিকনছড়া নামের একটি স্থানে অবস্থান নেন। তোফায়েল আহমেদ এই দলে ছিলেন। এই দলটি পাকিস্তানি বাহিনীকে হেঁয়াকো থেকে রামগড়ে আসা রুখে দেওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। ৩০ এপ্রিল দুপুর একটার দিকে পাক হানাদার বাহিনী চিকনছড়া আক্রমণ করে। কমান্ডো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকসেনারা তড়িৎগতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভিতর প্রবেশ করে ১০০ গজের মধ্যে এসে অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। তাই অতর্কিত এই আক্রমণে তাঁরা বেশ বিপাকে পড়ে যান। তাঁদের পক্ষে বেপরোয়া পাকিস্তানি কমান্ডো সেনাদের মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও আহত হন। এতে তাঁদের একাংশের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ভীতসন্ত্রস্ত মুক্তিযোদ্ধারা অধিনায়ক ও প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশ ছাড়াই পিছু হটতে থাকেন। এতে যাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন তাঁরা পড়েন বিভ্রান্তিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক প্রতিরক্ষা থেকে আরেক প্রতিরক্ষা বলয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থায় প্রতিরোধরত মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে মনে করেন, অধিনায়ক বা প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশেই তাঁরা পিছু হটছেন। এরপর তাঁরাও পিছু হটতে উদ্যত হন। বেশ কয়েকজন ইতোমধ্যে পিছু হটতে শুরু করেন। তোফায়েল আহমেদ এই সময় তাঁর দলের অন্যান্য সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। একপর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল তাঁর দলই যুদ্ধ করতে থাকে। পাকিস্তানি

www.pathagar.com

হায়েনাদের বেপরোয়া আক্রমণে ক্রমশ তাঁদের অবস্থাও সংকটময় হয়ে ওঠে। তখন তাঁদেরও পিছু হটে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে তোফায়েল আহমেদ বাধ্য হয়েই তাঁদের পিছু হটতে বললেন। এদিকে সহযোদ্ধাদের নিরাপদে পিছু হটে যাওয়ার সুবিধার্থে তিনি নিজের জীবনের ওপর নিলেন বিরাট এক ঝুঁকি। তিনি তাঁর অস্ত্র নিয়ে অনবরত গুলি করে পাকিস্তানি সেনাদের ঠেকিয়ে রাখেন। এই সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধারা পিছু হটে যান। শেষে তিনি একা হয়ে গেলে গুলি বন্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য দূরে ঢিল ছুড়তে থাকেন। পাক দখলদাররা শব্দ লক্ষ করে গোলাগুলি করলে তিনি পিছু হটে যান। কিন্তু কিছু দূর যেতেই গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে মারাত্মক আহত হন। এভাবে নিজের জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে তোফায়েল আহমেদ তাঁর সহযোদ্ধাদেরকে বাঁচিয়ে একাত্তরের রণক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর অসীম সাহসের স্বীকৃতি স্বরূপ তোফায়েল আহমেদকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা

বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। ১৯৭১ সালের ৫ মে ১৬ জন স্থানীয় যুবককে নিয়ে পার্বত্য এলাকার প্রথম মুক্তিযোদ্ধা দল সংগঠিত করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এই ছোট দলটিকে নিয়ে তিনি ১ নং সেক্টর হরিণা ক্যাম্পে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্যের অম্পিনগরে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১ নং সেক্টরে ফিরে আসলে তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রথম মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নেতৃত্বাধীন এই দলটিকে পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই কোম্পানির অধীনে গ্রুপ নং- ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪ ও ৯৫ সংযুক্ত করা হয় এবং এই এলাকার পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ও নিষ্ঠার সাথে তিনি বিভিন্ন অপারেশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯৭১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সংঘটিত ডাইনছড়ি অপারেশনে পাকিস্তানিবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ১২জন পাকিস্তানিসেনা নিহত হয়, পাতাছড়া অপারেশনে পাকসেনাদের বিতাড়ন করা হয়, ৭ অক্টোবর সংঘটিত যোগ্যাছলা অপারেশনে ৯ পাকসেনা নিহত হয়। পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ির মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সফল অপারেশনের নায়ক এই বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা। তাঁর অপারেশনে পাকবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তার মৃত্যুসহ বহু ক্ষতি সাধিত হয়, যা মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়কে তরান্বিত করেছিল।

রণবিক্রম ত্রিপুরা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য ছিলেন রণবিক্রম ত্রিপুরা। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চারিত ও পরিচিত একটি মুখ। ১৯৬৫ সালে তিনি ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সমাবেশে অংশ নিতেন। অসাম্প্রদায়িক ও নিপীড়নবিহীন একটি দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বকীয় অস্তিত্ব মর্যাদার সাথে সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতি থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ২৫ মার্চের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্রোহী ই,পি,আর ইউনিট ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে পালিয়ে আসা সৈনিকদের রসদ সরবরাহ করার কাজে এবং তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার এইচটি ইমামের তত্ত্বাবধানে তাদেরকে সংগঠিত করতে সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন রণবিক্রম ত্রিপুরা। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের হরিণা নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপনে তিনি সরাসরি অংশ নেন। এই ক্যাম্পটিই পরবর্তীতে ১ নং সেক্টর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি সেখারে আব্দুল মান্নান, মোশাররফ হোসেন, এসএম ইউসুফ, জহুর আহমেদ চৌধুরী, মহিউদ্দীন চৌধুরী, খাজু মিয়া প্রমুখের সাথে একসাথে কাজ করেন। এই ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন এনাম, মেজর জিয়া ও মেজর রফিকও ছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা রণবিক্রম ত্রিপুরা ভারতের দেরাদুনে সামরিক প্রশিক্ষণ নেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়, মানিকছড়ি, গাড়িটানা, যোগ্যাছোলা, ডাইনছড়ি, বাটনাতলী ও চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি এলাকায় অপারেশন করেন। তিনি যুদ্ধের শেষের দিকে বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্সের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কমান্ডার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সান্ত্বআ জার্নালের সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমি পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সেখানকার অধিবাসীরা বিশেষ করে ত্রিপুরা জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাদের মাঝে আমি মুক্ত স্বদেশভূমির জন্যে উচ্ছ্বসিত আকাঙ্খা প্রত্যক্ষ করেছি।

শহিদ চিত্তরঞ্জন কার্বারী

১৯২২ সালে জন্ম নেওয়া এলাকায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন কার্বারী ছিলেন সকলের সাথে মিশুক ও প্রগতিশীল একজন সামাজিক নেতা। খাগড়াছড়ি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল হতে পাশ করার পর প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি মহালছড়ি থানা সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক যুবকদের সংগঠিত করার কাজে তিনি এলাকায় বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন। নিরাপদ আশ্রয়ের খুঁজে উজানের দিকে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিসংগ্রামের প্রথম দিকে যখন এই অঞ্চলে মুক্তিসেনাদের আগমন শুরু হয়, তখনও তাঁদের সাথে চিত্তরঞ্জন কার্বারীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। মহালছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টার থাকাকালে তিনি তাঁদের কার্যক্রমে নানাভাবে সহায়তা করতেন। খাদ্যসামগ্রীসহ যুদ্ধকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সহযোগিতা তিনি করতেন। মেজর শওকতসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা মহালছড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি তাঁদের সহায়তা করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৩ মে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে খাকি পোশাক পরা কয়েকজন পাকসেনা চিত্তরঞ্জন কারবারীর নাম ধরে ডাকে এবং মাইসছড়ি বাজারে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করার জন্য নির্দেশ দেয়। আগের দিনের বৃষ্টিতে চেঙ্গী নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে নদী পারাপারে অসুবিধার কথা বলায় সৈন্যরা ফিরে যায়। পাক সেনারা ফিরে যাওয়ায় চিত্তরঞ্জন কার্বারীর পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসী মনে করেছিল হয়ত এই যাত্রায় বেঁচে গেছেন তাঁদের প্রিয় মানুষটি। তিনি পরিবারের

লোকজনের সাথে পরামর্শ করলেন এই দুর্যোগ মুহূর্তে কি করা যায় ঠিক করার জন্য। এলাকাবাসীদের কথা ও পরিবারের লোকজনের কথা ভেবে সকলে তাঁকে বাড়িতেই অবস্থান নিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিধির কি নির্মম পরিহাস! সন্ধ্যায় চারদিক অন্ধকার হয়ে আসার সাথে সাথে পাক-হায়েনারা নৌকায় করে চিত্তরঞ্জন কার্বারীর বাড়িতে এসে তাঁকে মাইসছড়ি বাজারে নিয়ে যাওয়ার নাম করে নৌকায় তুললো। এই চলে যাওয়টা ছিল তাঁর শেষ চলে যাওয়া। মাইসছড়ি বাজারে নিয়ে এলাকার অন্য কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে চিত্তরঞ্জন কার্বারিকে অমানুষিক নির্যাতন করে পরের দিন ১৪ মে শুক্রবার তেলোনটাঙ্গ্যা নামক বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শহীদ চিত্তরঞ্জনের পুত্র প্রফেসর ডক্টর সুধীন কুমার চাকমা বলেন, 'ঘটনার দিন আমি এমএ পাশ করে বাড়িতে ছিলাম। সন্ধ্যায় পাকসেনারা ফিরে আসার আগে বাবা আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি পরিবারের কথা ভেবে, এলাকার কথা চিন্তা করে তাঁকে বাড়িতে থাকতে বলেছিলাম। সেদিন যদি বাবাকে অন্যত্র সরে যেতে বলতাম, তাহলে চিরদিনের জন্য তাঁকে হারাতে হতো না।'

শহিদ গৌরাঙ্গমোহন দেওয়ান

গৌরাঙ্গমোহন দেওয়ান ১৯২৫ সালে খাগড়াছড়ি গামারিঢালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট মহাপুরম জুনিয়র স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে আইয়ুব শাহীর মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে সরকারিভাবে ১৫৮ নং গামারী ঢালা মৌজার হেডম্যান নিয়োগপ্রাপ্ত হন। হেডম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৬৬-৬৭ সালে মাইসছড়ি হাইস্কুলের সেক্রেটারি পদে নির্বাচন করে জয়যুক্ত হন এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সারাদেশের মতো মহালছড়িতেও সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলে তিনি সেই কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মেজর জিয়াসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের তিনি তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে ব্যাপকভাবে সাঁহায্য করেন। ১৯৭১ সালের ১৩ মে অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে গৌরাঙ্গমোহন দেওয়ানকেও মাইসছড়ি বাজারে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয় এবং পরের দিন ১৪ মে তারিখে তেলোনটাঙ্গ্যা নামক বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শহিদ সব্যসাচী মহাজন

সব্যসাচী মহাজন ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদ্বাস্তু। কাপ্তাইয়ের পানি তাঁদের ঘরবাড়ি জলে নিমজ্জ করার আগে তিনি নানিয়ারচরের মরাচেঙ্গী নামক স্থানে বসবাস করতেন। কাপ্তাই বাঁধের ফলে সহায় সম্পত্তি ডুবে যাওয়ার পর ১৯৬২ সালে নুনছড়ি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সংস্কারক। একাত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন স্বতঃপ্রণোদিত একজন সংগঠক। মহালছড়ি থানা সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও কমিটিকে অকাতরে সহায়তা করতেন নিজের সম্বল অনুসারে। মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক ও অফিসারদেরকে তিনি খাদ্যসামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় নানা সহায়তা করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজে অংশগ্রহণ ও সহায়তা দানের অপরাধে তাঁকেও ১৩ মে তারিখে মাইসছড়ি বাজারে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নির্যাতন করে পরের দিন ১৪ মে বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলার প্রথম পতাকা উত্তোলক সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা

৭৭ বছর বয়সী বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা পেশায় সাংবাদিক। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। পিতার নাম যুগেশ চন্দ্র ত্রিপুরা ও মায়ের নাম জানকী দেবী ত্রিপুরা। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ভারতের দেমাগ্রী নামক স্থানে। দেশ ভাগের পর ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রামগড় মহকুমায় এসে বসবাস শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে রামগড় বর্ডার বেল্টের কমান্ডার ছিলেন তিনি। তাঁর কমান্ডে ১০৪ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। যুদ্ধের দামামা তুঙ্গে থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালের ১২ মার্চ রামগড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে খাগড়াছড়ি জেলার সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এইচ. টি. ইমামের উপস্থিতিতে পতাকাটি উত্তোলন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা। তাঁর ভাষ্যমতে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এইচ. টি. ইমাম-কে পতাকাটি উত্তোলন করতে বললে তিনি পতাকার রশিটি মুক্তিযোদ্ধা সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, পতাকাটি এই বীর মুক্তিযোদ্ধারই উত্তোলন করা উচিত। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা রামগড়ের পার্শ্বস্থ মাটিরাঙ্গা উপজেলার তবলছড়ি সীমান্তে তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং যুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে এলাকা শত্রুমুক্ত করেছিলেন।

www.pathagar.com

পার্বত্য লোকমানসে মুক্তিযুদ্ধ

প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল চলমান সমাজ ব্যবস্থা ও প্রকৃতির উপর ভর করে গড়ে উঠেছে। এসব জাতিসত্তার সমাজে প্রচলিত রয়েছে নানা নৃত্যগীত ও গীতিকাব্য। লোককাহিনিভিত্তিক এসব নৃত্যগীত গায়েন কবিদের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে। এসব গায়েন কবিদের পরিবেশনার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রায় সময়েই দেখা যায় সরল পাহাড়িয়া জীবনের মিষ্টিমধুর-কষ্টকরুণ কাহিণী। মানব-মানবীর প্রেম, বিরহ, দুঃখ, বেদনা, রাজাদের রাজ্য বিজয়, সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয় লোক গায়েনদের গানে গানে। পাহাড়ি গায়েন কবিদের মুখে মুখে রচিত নানা গীতিকাব্য ও পালাগানে উঠে আসে সমকালীন সমাজের নানা চিত্র। বাংলাদেশের ত্রিপুরাদের লোকসমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় গীতিকাব্য বা পালাগুলোর মধ্যে কুচুক হা সিকাম কামানি, পুন্দা তান্নাই, গাঁ তলিঅ থাঁমানি, লাঙ্গুই রাজা-ন বুমানি, খুম কামানি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা গায়েন কবিদের মধ্যে শশী কুমার ত্রিপুরা, বিদ্যারতন ত্রিপুরা, কাতালচান ত্রিপুরা, গাবিং কিতিং ত্রিপুরা, বিলাই খনা ত্রিপুরা, জনার্দন ত্রিপুরা, বিভূতি ভূষণ ত্রিপুরা প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত জনপ্রিয় গীতিকাব্যের পাশাপাশি একাত্তরের যুদ্ধকালীন ত্রিপুরা গ্রামগুলোর কিছু চিত্রও পাওয়া যায় এসব গায়েন কবিদের পালাগান থেকে। তারই কিছু নমুনা সাত্তুআ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

সদাব্যস্তময় ত্রিপুরা লোকসমাজে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল, তা গায়েন কবিরা বর্ণনা করেছেন এভাবে-

হুগ' কালাইনাই বাত' জাক
সাকাং মাইখালাই তেলাইজাক
য়াগ' চক কাপসা তৗইলাইজাক
খুগ' মৗই ফনসা বাললাইজাক
মিজুক সং কাইসা থাংফাইঅ
পাথান সং কাইসা থাংফাইঅ
পন্‌জাই আবাসনি রাউন্‌ন'
য়াকবাই ফিত খাইঅই হলফাইদং
হাপিং বুরানি লাইরবক
বজাং খালজাকনাই অ বিরক?

পরিশ্রান্ত সময়ে সমবেত আহারে বসেছে জুমিয়ারা। হঠাৎ সে মুহূর্তে কোন দিক থেকে যেন মিজুদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। কোথাও ছেয়ে গেছে পাঠানদের দলে। অর্ধ-শতাধিক রাউন্ডের গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ত্রস্ত গ্রামবাসীরা কোন দিকে পালাবে বুঝতে পারছে না। নারীরাই বা যাবে কোন দিকে, এ চিন্তায় ব্যাকুল কবি।

হাপং খিকরক মাইবিদি
দুরুম দারাম-ন খানাদি

www.pathagar.com

পাথান ফাইমানি নুংয়াদই?
সইন্য ফাইমানি নুংয়াদই?
সইন্য সং কাইসা থাংপাইয়ই
লাম' পেসোয়া রগইদং।

গোলাগুলির আওয়াজে সন্ত্রস্ত পাহাড়। পাঠানদের উৎপাত দেখবে নাকি অন্য সৈন্যদের আনাগোনা দেখবে! কোন দল যেন রাস্তার মুখে বসিয়েছে পাহারা। ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রধারী সৈন্যরা আসছে। পথে পথে নির্যাতন করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের।

হাদুক দারিরি মুকপে দং
মুক্তিবাহিনী ফাইবাইদং
দাংগি পারাঅ হাবইদং
বক্ত পারাঅ রুতুকদং
হাদুক পারাঅ কগই দং।

অবশেষে মুক্তিবাহিনী পুনর্দখল করেছে এলাকা। গায়েন কবি এখানে মুক্তিবাহিনীর সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসার দৃশ্যের সাথে জুমে লাগানো সারিবদ্ধ সীম গাছের তুলনা করেছেন। সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা মুক্তিসেনাদের দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গ্রামবাসী। মুক্তিসেনারা হন্যে হয়ে শত্রু খোঁজা শুরু করেন ত্রিপুরাদের প্রাচীন দাংগি পাড়া, বক্ত পাড়া আর হাদুক পাড়ায়।

মুক্তিযুদ্ধ পার্বত্য লোকমানস ও সমাজ-সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যার সামান্য কিছু নমুনা এই লোক গায়েন কবিদের মুখে মুখে ঘুরে ফেরা অবহেলিত গীতমালা।

ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির রয়েছে নানা নৃত্যগীত ও গীতিকাব্য। লোককাহিনি ভিত্তিক এসব গীতিকাব্য গায়েন কবিদের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে। এসব গায়েন কবিদের পরিবেশনার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রায় সময়েই দেখা যায় সরল পাহাড়িয়া জীবনের মিষ্টিমধুর-কষ্টকরুণ কাহিনি। মানব-মানবীর প্রেম, বিরহ, দুঃখ, বেদনা, রাজাদের রাজ্য বিজয়, সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয় লোক গায়েনদের গানে গানে। চাকমা গায়েন কবিদের মুখে মুখে রচিত গেংখুলি বা আখ্যান পালাগুলোর মধ্যে বারমাসী পালাগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পালাগুলোর মধ্যে তান্যাবীর বারমাসী, কালেশ্বরী বারমাসী, কির্বাবীর বারমাসী, মা-বাব বারমাসী, সান্দবীর বারমাসী অন্যতম। খাগড়াছড়ি'র চাকমা গেংখুলিদের মধ্যে শ্রী ধর্ম্মধন চাকমা পন্ডিত, শ্রী গঙ্গাশূর চাকমা তালুকদার প্রমুখের নাম উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরা গীতিকাব্য বা পালাগুলোর মধ্যে কুচুক হা সিকাম কামানি, পুন্দা তান্নাই, গাঁ তলিঅ থাঁমানি এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধুসংগীত ও বৈষ্ণবসংগীত উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা গায়েন কবিদের মধ্যে শশী কুমার ত্রিপুরা, বিদ্যারতন ত্রিপুরা, কাতালচান ত্রিপুরা, গাবিং কিতিং, বিলাই খনা, জনার্দন ত্রিপুরা, বিভূতি ভূষণ ত্রিপুরা,

www.pathagar.com

সাধক গায়েনদের মধ্যে সাধু খুশী কৃষ্ণ ত্রিপুরা ওরফে বলংরাই সাধু, সাধু বাহু চন্দ্র ত্রিপুরা, সাধু জাবালাক এবং বৈষ্ণব সংগীতজ্ঞদের মধ্যে মেঘনাথ বৈষ্ণব, নানে বৈষ্ণব, গঙ্গাদর্শন বৈষ্ণব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মারমাদের মধ্যে মূলতঃ পৌরানিক কাহিনি ভিত্তিক পালা গান পাংখুং, নানা শ্রেণীর পুঁথি জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। খাগড়াছড়ির কয়েকজন চারণ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

নন্দরানী চাকমা

নন্দরাণী চাকমা (ছিঝিবু) মৃত প্রবীর চন্দ্র চাকমা ও সুরসী চাকমার মেয়ে। তাঁর স্বামীর নাম শান্তি বিজয় চাকমা। নন্দরাণী চাকমা ১৯৫৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন মহালছড়ি উপজেলার মনাটেক গ্রামে। ২২ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট এলাকার শান্তি বিজয় চাকমার সাথে। তাঁদের ৩ ছেলে ও ১ জন মেয়ে । তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেছেন।

শিল্পী নন্দরানী চাকমা

পরিবারের বয়োজেষ্ঠ (দাদা-দাদী) ও মা-বাবার অনুপ্রেরণায় ১৯৬৪ সাল অর্থাৎ ৭/৮ বছর বয়স থেকে সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তিনি বিশেষ করে তাঁর দাদুর অনুপ্রেরণার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর সংস্কৃতি জগতের প্রথম গুরু ছিলেন ওস্তাদ বসন্ত চাকমা। তিনি জ্যোতিষ চন্দ্র চাকমার কাছ থেকেও গানের তালিম নিয়েছেন। ১৭-১৮ বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। জেলার দক্ষিণ অঞ্চল যেমন কেয়াংঘাট, রেংক্ষ্যং, বিলাইছড়ি, কুকিছড়া ইত্যাদি এবং উত্তর অঞ্চল যেমন- দীঘিনালা, বাবুছড়া, বোয়ালখালী বাজার, লোগাং, পুজগাং, মাইস্যাছড়ি এলাকা ইত্যাদি, পশ্চিম অঞ্চল যেমন- গুইমারা, মাটিরাঙ্গা, রামগড় ইত্যাদি অঞ্চলে ছিল তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এই সময় তিনি এমন জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর নৃত্য ও গান পরিবেশনার পর তিনি যেসব জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

নৃত্য বা গান পরিবেশন করতেন সেসব স্থানের বাঁশ, গাছ, খুঁটি বা তাঁর বসার চেয়ার ইত্যাদি নেওয়ার জন্য দর্শকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।

সংস্কৃতিচর্চার জন্য তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন সংঘরত্ন যাত্রাপার্টির কথা। এই পার্টিটির সুনাম ছিল আকাশছোঁয়া। ১৯৭১ সালে খাগড়াছড়ি মহকুমার মহালছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। একসময় পাকবাহিনী মসহালছড়ি দখল করলে তাদের যাত্রাপার্টির যাবতীয় যন্ত্রপাতি তছনছ করে দেওয়া হয়। পার্টির সদস্যরা কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, কেউ প্রাণের ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। ফলে যাত্রাপার্টির কার্যক্রম ভেঙে যায়। তিনি এখনও আক্ষেপ করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ১৯৭১ সালে যদি এ যাত্রাপার্টি ভেঙ্গে না যেত তবে এর পরিধি এতক্ষণে অনেক বিস্তৃতি লাভ করতো এবং সংস্কৃতি জগতে এর বিশাল অবদান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অবদানের জন্য তিনি অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছেন। যেমন- নববর্ষ উৎসব ২০১৩ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি জেলার নাগরিক সমাজের কাছ থেকে সম্মাননা পেয়েছেন। অতিসম্প্রতি আন্ত র্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন কমিটিও তাঁকে সম্মাননা দিয়েছে। তিনি অগণিত যাত্রা পালায় গান ও নৃত্য পরিবেশন করেছেন। যাত্রা পালার গানের কথা মনে করে তিনি অবলীলায় গেয়ে উঠেন: নায়ারে নায়া, নায়ার বাদাম তুল্যা... কোন দূরে যাও চইল্যা.....।

তিনি সংস্কৃতি কর্মকান্ড ছাড়াও বর্তমানে সাধারণ কৃষি কাজ ও জুম চাষ করেন, কোমর তাঁতে বেইন বুনেন এবং বেতের কাজ করেন।

ত্রিপুরা সাধু সংগীতের সাধক শ্রীমৎ বাহুচন্দ্র সাধু

শ্রীমৎ বলংরায় সন্ন্যাসীর শিষ্য শ্রীমৎ বাহুচন্দ্র ত্রিপুরা সাধু। বলংরায় সন্ন্যাসীর প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম। শ্রীমৎ বাহুচন্দ্র সাধুর জন্ম ফটিকছড়ির আনন্দপুর গ্রামে। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার পশ্চিমে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাঁর এই জন্মস্থানটি। আকারের দিক দিয়ে গ্রামটি বেশ বড়ো। প্রায় এক শতাধিক পরিবার রয়েছে এই গ্রামে। গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

www.pathagar.com

১৩৪১ বাংলা সন তথা ১৯৩৫ খ্রিস্টীয় সনের মাঘ মাসের রবিবারে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীমৎ বাহু চন্দ্র সাধু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শ্রী রাখালচন্দ্র ত্রিপুরা ও মাতার নাম শ্রীমতি দেবজানি ত্রিপুরা। শ্রীমৎ বাহু চন্দ্র সাধুর নয় বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান, বারো বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান।

সাধু বাহুচন্দ্ররা মোট পাঁচ ভাইবোন। ভাইদের মধ্যে তিনি সবার ছোট। বারো বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে তিনি শোকের সাগরে পতিত হন। ফলে বহু কষ্টে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর বাল্য বয়সেই তিনি ঐ গ্রামের প্রধান রোয়াজার বাড়ীতে প্রতি মাসে ১ (এক) টাকা মাইনের চাকর হিসেবে কাজে যোগ দেন। রোয়াজার ঘরের গৃহভৃত্য হিসেবে তিনি সারাদিন গরু চড়াতেন আর রাত্রে অবসর সময়ে বাল্যশিক্ষা পড়াশোনা করতেন। মাঝে মাঝে ধর্মীয় গ্রন্থ গীতা মহাভারত পাঠ করে তিনি জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করতেন।

শ্রীমৎ বাহুচন্দ্র সাধু তাঁর নিজের মাতৃভাষা ককবরকে বহু আধ্যাত্মিক গান রচনা ও সুর করেছেন। গানগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদিতে সুযোগ পেলেই তিনি পরিবেশন করেন। তাঁর গুরু শ্রীমৎ বলংরায় সন্ন্যাসী ও পরম গুরু মহারাজ শ্রীমৎ রতনমনি সন্ন্যাসীর বহু জনপ্রিয় গান তিনি সযতনে সংরক্ষণ করেন এবং উৎসবাদিতে পরিবেশন করেন।

শ্রীমৎ বাহু চন্দ্র সাধু বর্তমানে মাটিরাঙাস্থ ওয়াসু এলাকায় আশ্রম স্থাপন করে শিবসাধনায় রত রয়েছেন। অতিসম্প্রতি (জুন ২০১৩) 'প্রাণসুমচামা' নামের তাঁর আধ্যাত্মিক গানের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

চাকমা উবুগীত শিল্পী ও গীতিকার মাধবীলতা চাকমার জীবন বৃত্তান্ত

খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার বোয়লখালী ইউনিয়নস্থ কামাকু ছড়ার একজন নারী উবুগীত বা চাকমা ঐতিহ্যবাহী গানের শিল্পী। আসল নাম মাধবীলতা চাকমা। যদিও জন্ম সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রে জাইল্যাবী চাকমা দেওয়া আছে। বয়স ৭৬ বছর। স্বামী রমণী মোহন চাকমা। ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে সবাই আলাদা সংসারে প্রবেশ করেছে।

জন্ম রাঙামাটি জেলার মাওরুম এলাকায়। জন্মস্থান মাওরুম বর্তমানে কাপ্তাই বাঁধের পানির নিচে বিলীন হয়েছে। পিতার নাম করুনামোহন চাকমা ও মাতার নাম সূর্যমুখী চাকমা। ৮ ভাইবোনের মাধবীলতা চাকমা তৃতীয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে তারা উদ্বাস্তু হয়ে বর্তমানে দিঘীনালা উপজেলায় অবস্থান করছেন। তাঁর এক বড় বোন ছোটবেলায় মারা গেছেন। বড় ভাই থেকে যান মাওরুমে আর তখন থেকেই পরিবারের প্রায় সব কাজ মাধবীর ঘাড়ে চাপে। ঘরের যাবতীয় কাজসহ গরু মহিষ চরানোর কাজও তাঁর করতে হয়েছে। কিশোরী বয়স থেকেই গরু চরাতে চরাতে মাধবী নিজে নিজে বানিয়ে গেংগুলি, উব গীত গাইতেন। কিছু কিছু গান আয়ত্ত করেছেন অন্যের মুখ থেকে শুনে শুনে। বেশির ভাগ গানই তাঁর নিজের রচিত। ৭৬ বছর বয়সেও মাধবী লতার গলা এখনো মধুর। যে কেউ অনুরোধ করলে গেয়ে শুনান তিনি। শুধু লোকগীতি গেংগুলি বা উব গীত গাওয়া নয় হেংগরং বাজাতে পারদর্শী তিনি। নিজেই বাঁশের হেংগরং তৈরি করে বাজান তিনি।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতির সময় নিরাপদ আশ্রয়ে ভারতে শরণার্থী জীবন যাপন করতে হয় মাধবীর পরিবারকে। বিদেশেও তিনি গেংগুলি ও উব গীত চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তৎকালীন খাগড়াছড়ি আসনের সংসদ সদস্য উপেন্দ্র রাল চাকমা কর্তৃক ভারতে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যাওয়ার সময় মাধবী লতার গান আর হেংগরং এর মধুর সুরে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি দামী টিফিন বক্স উপহার দিয়েছিলেন। এই পুরস্কার এখনো মাধবী যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। বাংলাদেশে এসে ২০০৯ সালে স্থানীয় আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে গান গেয়ে আর হেংগরং বাজিয়ে একসেট পিনন-খাদি পুরস্কার লাভ করেছেন মাধবী লতা।

গেংখুলি আর হেংগরং এর পারদর্শিতার কারণে দুয়েকটি পুরস্কার লাভ করলেও ঐতিহ্যবাহী গান আর বাদ্য চর্চা ও সংরক্ষণের জন্য এ পর্যন্ত কারো কোন সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা পান নি। সংসারে দারিদ্রতার কষাঘাতে এখন আর তেমন চর্চা করা হয় না বলে জানান মাধবী। তবে সুযোগ পেলে তিনি এখনো উৎসাহ দেখাবেন বলে আশ্বাস দেন।

৭৬ বছর বয়সী মাধবী লতা চাকমা স্বামীর সংসারে এখনো নিরলস পরিশ্রম করেন। জায়গা জমি তেমন নেই। যা ছিল তাও সেটেলার বাঙালির বেদখলে আছে। তিনি জানান, রেকডকৃত ১০/১২ একর জমি থাকা সত্ত্বেও বেদখলে থাকায় জীবিকার একমাত্র উপায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। কৃষিমজুরী আর সামান্য শরণার্থী কার্ডের চাউল দিয়ে বয়োবৃদ্ধ বৃদ্ধা দু'জনের সংসার চলছে।

গায়েন শিল্পী চান মোহণ ত্রিপুরা (বেরেগি)

২৪১ নং লতিবান মৌজার বৈসুকরাম রোয়াজা পাড়ায় কবি গায়েন চান মোহন ত্রিপুরা(বেরেগি)র জন্ম ১৯৩৯ সালে। তার পিতার নাম বল্লবসা ত্রিপুরা এবং মাতার নাম বাংকি লক্ষি ত্রিপুরা। তিনি ৫ ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয়। তাঁর বাল্য কাল কেটেছে বৈসুকরাম রোয়াজা পাড়া ও বলি পাড়ায়। তিনি তাঁর জ্ঞাতি মামা কিষ্টচরণ ত্রিপুরা নিকট বাল্যশিক্ষা পাঠের মাধ্যমে তিনি অক্ষরজ্ঞান লাভ করেন। বলি পাড়ায় থাকতে থাকতে তিনি মেহের চান ত্রিপুরা কণ্যা তং শ্রি ত্রিপুরার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ব্যক্তি জীবনে বহুবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন কিন্তু কারো সাথে বেশিদিন সংসার করতে পারে নি বিভিন্ন কারণে। হয় স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে অথবা তাঁর স্ত্রীরা তাঁর এ কবি গায়েন জীবনকে মেনে নিতে না পেরে বিচ্ছেদ হয়ে চলে যায়। এভাবে একে একে ছয় জনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি তাঁর ৬ষ্ঠ স্ত্রী কারিগর পাড়ার ফুলবাংমনি ত্রিপুরার কন্যা অশ্বিনীপতি ত্রিপুরার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐ পাড়ায় সংসার করছেন।

যৌবনে বলি পাড়ায় তিনি গায়েন শিল্পি লোক গীতি সম্রাট বিদ্যারতন ত্রিপুরার সাথে অনেক বছর কাটিয়েছেন। তাঁর সাথে থাকতে থাকতে তিনি বিভিন্ন স্থানে সফর সঙ্গী হিসেবে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁর গান মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এক পর্যায়ে পুরো গ্যন তিনি রপ্ত করে ফেলেন। তিনি বর্তমানে কারিগর পাড়ায় একজন নরসুন্দর পেশায় জড়িত হয়ে গ্রামে অবস্থান করছেন।

www.pathagar.com

পুথি পাঠক মংক্য মগ

মংক্য মগ। আনুমানিক বয়স ৭৩ বছর। তিনি একজন ক্যায়ং ত্যাগা বা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণকারী। কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পাশাপাশি মাটিরাঙা বাজারের পাশে নিজের বসভিটার পাশে বাড়ি ভাড়া দিয়ে কিছু আয়-উপার্জন করেন। মংক্য মগের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর সাথে বহু বছর আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শেষ বয়সে এসে তাই এখন প্রথম স্ত্রীর নাম পর্যন্ত তাঁর মনে নেই। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ম্রাসাং মগিনী। বয়স আনুমানিক ৬১ বছর। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তাঁদের দুই ছেলে রয়েছে। ছেলেদের নাম সুদু মারমা ও কংঞো মারমা।

পুথি পাঠক মংক্য মগ (৭৩)

মংক্য মগ আনুমানিক ৩০ বছর বয়স থেকে মারমা ভাষায় পুঁথি চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন সামাজিক/ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি পুঁথি পাঠ করেন।এ পুঁথি সম্পূর্ণ মারমা হরফে লিখা। পুঁথি পাঠ শিক্ষা অর্জনে তাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো গুরু নেই। তবে মারমা হরফ পড়া শিখেছিলেন ছোট খেদা বৌদ্ধবিহারের তৎকালীন বিহার অধ্যক্ষ বারত ভান্তের কাছে। মংক্য মগ বিশেষ করে নিবেংনেসু পুঁথি পাঠ করেন। নিবেংনেসু সরল বাংলা করলে দাঁড়ায় 'নির্বাণ প্রত্যাশী' বা 'মহামুক্তি প্রত্যাশী' পুঁথি। মারমা সমাজের কেউ মৃত্যুবরণ করলে মংক্য মগ হাজার কাজ ফেলে সেখানে ছুটে যান পুঁথি পাঠ করার জন্য। নিজ উদ্যোগেই তিনির নিজের পুঁথি নিয়ে মৃত ব্যক্তির মঙ্গল, শবদেহ দাহ কার্যে উপস্থিত সকলের এবং নিজের পূণ্যের বিশ্বাসে পুঁথি পাঠ করেন। এ পুঁথি মারমা সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে পাঠ করা হয়। এই শ্রেণির পুঁথি পাঠকারী কোন সম্মানীর প্রত্যাশায় পাঠ করেন না। বরং মৃত ব্যক্তির মঙ্গল, শবদেহ দাহকার্যে উপস্থিত সকলের এবং নিজের পুণ্যের বিশ্বাসে পাঠ করে থাকেন। মংক্য মগ আক্ষেপ করে বলেন, শেষ

www.pathagar.com

বয়সে এসে একটিই আক্ষেপ আমার ছেলেদের আমি এই পূণ্যময় বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে যেতে পারলাম না। কারণ এই বিদ্যা শিখার জন্য কাউকে জোর করে শেখানো যায় না। স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এই বিদ্যা শিখতে হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. গুনাধর ত্রিপুরা (হর্দমিনিফা), খাগড়াপুর গ্রাম, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা- এর সাক্ষাতকার
২. www.chtrc.org
৩. www.khagrachari.gov.bd
৪. www.khdcbd.org
৫. www.bgb.gov.bd
৬. ত্রিপুরা, প্রভাংশু; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ইতিহাস, এপ্রিল ২০০৬।
৭. সিংহ, কৈলাস চন্দ্র; শ্রী শ্রী রাজমালা, ১৮৯৭ ।
৮. চাইথোঅং মারমা (বয়স ৫৩), সদস্য, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি-এর সাক্ষাতকার।
৯. ইউ কে জেন, যুগ্ম সচিব (অবঃ), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সাথে আলোচনা।
১০. মং রাজার মুক্তিযুদ্ধ, লেঃ কর্নেল এস আই এম নুরুন্নবী খান; ২০০১।
১১. খাগড়াছড়ির মুক্তিযুদ্ধ, আলহাজ্ব দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী, মুক্তি, মহান বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০০, মহালছড়ি, সম্পাদনায়- অধ্যাপক কংজঅং চৌধুরী লিংকন।
১২. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত গ্রামীণ সাধারণ বন ব্যবস্থাপনা ও কাপ্রু পাড়া সংরক্ষিত বন- সিংইয়ং ম্রো (প্রবন্ধ)।
১৩. মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা দিবসের প্রকাশনা, ১৯৯১, সম্পাদনায়- রণবিক্রম ত্রিপুরা (তাতু), খাগড়াছড়ি, বাংলাদেশ। .
১৪. সান্তআ জার্নাল, বিজয় দিবসের রজত জয়ন্তী সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬ ।
১৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ জনগণনা জরিপ ২০১১।
১৬. দৈনিক সকালের খবর, ৪ এপ্রিল ২০১১।
১৭. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১১ ডিসেম্বর ২০১১।
১৮. দৈনিক সমকাল, ১৬ জানুয়ারি ২০১২।
১৯. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০১২।
২০. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
২১. অশ্রু-সাগরে মিলিত প্রাণ : মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা-জনগোষ্ঠী- মেসবাহ কামাল ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, নভেম্বর ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ।
২২. মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের বীরউত্তম, কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বাংলা একাডেমী, ২০০৮।
২৩. ওয়াকরাই\(রণপা), এক দশক পুর্তি সংখ্যা, সুনেন্দু ত্রিপুরা (সম্পাঃ), ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০২।
২৪. http://baghaichari.rangamati.gov.bd/
২৫. কংজঅং মারমা (বয়স ৫৭), উচ্চমান সহকারী, রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়-এর সাথে সাক্ষাতকার।
২৬. আব্দুল করিম (বয়স ৬৭), দপ্তরি, রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়-এর সাথে সাক্ষাতকার।
২৭. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, বিরাজ মোহন দেওয়ান, ১৯৬৯, রাঙামাটি।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

পাহাড়ি জীবন প্রকৃতির সাথে জীবনের সমন্বয়। এখানে জীবন-জীবিকা চলে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাই এখানকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচারাদিতে প্রকৃতির ছোঁয়া পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তান্ত্রিক পূজাপার্বণ কিংবা সামাজিক লোকাচারে নৃত্যগীত অত্যাবশকীয় উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ থেকে চাষাবাদ ও স্রষ্টার স্তুতিসহ জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপে গীতিবাদ্য অবশ্যকরণীয় হিসেবে বিবেচিত। জীবিকার প্রধানতম উৎস জুমকে ঘিরে পাহাড়িয়া আদিবাসী জীবনে গড়ে উঠেছে এক অনন্য সংস্কৃতি। জুম পাহারা দিতে গিয়ে জুমচাষীদের মুখে মুখে রচিত হয়েছে নানা কাহিনি, গান ও গীতিকবিতা। কখনোবা জুমিয়া যুবক-যুবতির প্রেম বা বিরহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গান আর লোক কাহিনি। জুমিয়া জীবন প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার কারণে এখানে অরণ্যের জীব-জন্তুদের নিয়েও রচিত হয়েছে নানা কাহিনি ও রূপকথা। গানে, কবিতায়, লোককাহিনিতে পশু-পাখির বিচরণ খুবই সাবলীল।

ক. লোকগল্প/ কিস্‌সা/ কাহিনি/ রূপকথা/ উপকথা

ত্রিপুরা লোককাহিনি : চেতুয়াং

কোন এক সময় এক মহাজনের দুই ছেলে মেয়ে ছিল। দুজনের বয়স প্রায় সমসাময়িক। এক সময় তারা যৌবনপ্রাপ্ত হল। ছেলেটি বড় আর মেয়েটি ছোট অপূর্ব সুন্দরী। যেমন ফর্সা তেমনি শারীরিক গঠন। বৈশাখ মাস। জুমে ধান রোপনের কাজ চলে। চাকর বাকর নিয়ে মাহজনের ছেলে মেয়ে দুটি কাজ করত জুমে। জুমে কাজ করতে করতে একদিন খুব বৃষ্টি হল। বাড়িতে ফেরার পালা। পথে একটি ছড়া রয়েছে। ছড়ায় বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে। উরুসম পানি। প্রথমে কে পার হবে তা নিয়ে আলোচনা হল, শেষে বড় ভাই প্রথমে ছড়া পার হল। পরে ছোট বোন পার হল। ছোটবোন পার হওয়ার সময় বড় ভাই পিছন ফিরে তাকাতেই ছোট বোনের ঝিলিক মারা অগোছালো অবস্থা তার দৃষ্টি গোচর হল। বিজলী চমকানোর মত অগোছালো পরিধেয়'র মধ্য দিয়ে বোনের ফর্সা শরীর দেখে বড় ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে মনে মনে ঠিক করল তার বোনকেই বিয়ে করবে।

বাড়িতে গিয়ে ছেলেটি একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। বিষণ্ন মন নিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকে। কারো সাথে কথা বলে না। খাওয়ার সময় খায় না, ঘুমানোর সময় ঘুমায় না। কোন কাজই ঠিকমত করতে পারছে না। একা একা নিশ্চুপ থাকত তখন থেকে।

www.pathagar.com

ছেলের মন খারাপ হওয়ার কারণ কেউই বের করতে পারল না। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। নাতির এ বিষণ্নতা খেয়াল করেছে তার দাদী। একদিন দুপুর বেলা। দাদী উঠানে ধান শুকাচ্ছে। নাতিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে তার। কীসের এত মন খারাপ তার। সে কি চায় ধন, সম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি জিজ্ঞেস করল তার দাদী। কিন্তু কিছুই বলছে না। এক পর্যায়ে সে তার দাদীকে বলল যে তার কথা যদি সে রাখে তাহলে বলবে। দাদী তার শর্ত মেনে নিল। তখন সে তার পূর্বের কাহীনি সব বলল এবং সে তার ছোট বোনকে বিয়ে করতে না পারলে আর কিছু করবে না বলে জানাল। কথাটা শুনে তার দাদী থ হয়ে গেল। কিন্তু দাদী যে কথা দিয়ে ফেলেছে। দাদী এ কথা বাবা মাকে বলে এবং অনেক বুঝিয়ে তার বাবা-মাকে রাজি করায়। বিয়ের জন্য সব প্রস্তুতি চলতে থাকে। উঠানে ধান শুকানো হল। ধান মুরগী খেতে আসলে দাদী মুরগীদের তাড়াত এই বলে "হেই মারগী তোমাদেরও কিন্তু ভাই বোনের বিয়েতে জবাই করা হবে।" দাদীর এই কথা শুনে নাতনী জানতে চায় কোন ভাই বোনের বিয়ে হচ্ছে।

নাতনীর নাছোড়বান্দা প্রশ্নের কারণে দাদী সব বলে দেয়। এতে ছোট বোন খুব মর্মাহত হয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে কীভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এক সময় সে একটি চেতুয়াং (ছাতিম গাছ) গাছের চারার সন্ধান পায়। সে অতি যত্নে চেতুয়াং চারা নিয়ে আসে এবং বাড়ী অনতিদূরে রোপন করে। চারা রোপনের পর চেতুয়াং চারাকে ধূপ দিয়ে পূজা করে প্রার্থনা করতে লাগল–

তর চেতুয়াং তর, লক চেতুয়াং লক
আচুনি সাকনি মালা কুফুল জর
নিনি য়াফাং গ তানফাই ন
তর চেতুয়াং তর, লক চেতুয়াং লক
আচুনি সাকনি পুন্দা কুফুল জর
নিনি য়াফাং গ তানফাই ন
তর চেতুয়াং তর, লক চেতুয়াং লক
আচুনি সাকনি ফারুক কুফুল জর
নিনি য়াফাং গ তানফাই ন
তর চেতুয়াং তর, লক চেতুয়াং লক
আচুনি সাকনি মিসি কুফুল জর
নিনি য়াফাং গ তানফাই ন
তর চেতুয়াং তর, লক চেতুয়াং লক

বাংলা মর্মার্থ

হে ছাতিম গাছ আমার, তুমি তাড়াতাড়ি বড় হও আর লম্বা হও। দাদুর সময়ের শ্বেত শূকরের জোড়া, শ্বেত মহিষের জোড়া, শ্বেত কবুতর জোড়া, শ্বেত পাঁঠার জোড়া তোমার নিকট বলি দেব। তুমি তাড়াতাড়ি বড় হও আর তাড়াতাড়ি লম্বা হও।

www.pathagar.com

এমন আকুতি, প্রার্থনা সাত দিন ধরে করতে করতে দেখা গেল সত্যি চেতুয়াং চারা অনেক বড় ও লম্বা হয়েছে। যে দিন তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে তার আগের দিন মেয়েটি চেতুয়াং গাছের আগায় উঠে অনুরূপ আকুতি জানাতে থাকে আর চেতুয়াং গাছটি অনবরত বৃদ্ধি পেতে থাকল। মেয়েটির ইচ্ছে সে চেতুয়াং গাছে চড়ে স্বর্গে পাড়ি দেবে, তবুও বড় ভাইকে বিয়ে করতে পারবে না।

এমনি করে বিয়ের দিন আসল। এদিকে কনেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে দেখল যে, সে চেতুয়াং গাছের আগায় চড়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। তখন সবাই তাকে অনুরোধ করল যে, তাদের ভুল হয়েছে, যেন সে নেমে আসে। তখন মেয়েটি শর্ত দিল যে, তার দাদুর আমলের সেই শ্বেত শূকর জোড়া বলি দিতে হবে চেতুয়াং গাছের নিচে। যেই কথা সেই কাজ। শ্বেত শূকর জোড়া বলি দেওয়া হল। এদিকে মেয়েটি আবার চেতুয়াং গাছকে প্রার্থনা জানাল, আমি আমার শর্ত মোতাবেক দাদুর আমলের শ্বেত শূকর জোড়া তোমায় বলি দিলাম। এবার আরো বড় ও লম্বা হও। চেতুয়াং লম্বা ও বড় হতে থাকে। পরে সে একে একে শ্বেত পাঁঠা জোড়া, কবুতর জোড়া, মহিষ জোড়া বলি দিতে বাধ্য করে এবং চেতুয়াং গাছ তর তর করে লম্বা ও বড় হতে থাকল। তার সব শর্ত মেনে সব কিছু করা হল কিন্তু সে আর নামে না। শেষে শর্ত দিল তার বড় ভাইকে চেতুয়াং গাছের নিচে বলি দিতে হবে, তবেই সে নামবে। একপর্যায়ে তার বড় ভাইকে বলি দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই গিরগিটি হয়ে ছোট বোনের দিকে উঠতে লাগল। এসময় চেতুয়াং গাছ আকাশ ছুঁয়ে গেল এবং মেয়েটি আকাশে উঠে এক লাথিতে চেতুয়াং গাছের আগা ভেঙ্গে দিল। বড় ভাই আর নাগাল পেল না। পুরো পরিবার শোকের সাগরে ভেসে গেল।

ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, এই ঘটনার পর থেকেই চেতুয়াং গাছের আগা নাই। আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, তা হল সেই ছোট বোনের উরু পর্যন্ত কাপড় তুলে ছড়া পার হওয়ার সময়ের ঝলকানি। আর যে বজ্রপাত হয়, তা হল বড় ভাইয়ের বুকের মধ্যে যন্ত্রনায় বুক ফাটা আওয়াজ। এসময় নাকি গিরগিটি আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে।

ত্রিপুরা লোককাহিনি : খেলাং থু

অনেক দিন আগের কথা। কোন এক জুমিয়া গ্রাম। গ্রামের দুই যুবক যুবতী একে অপরকে খুব ভাল বাসত। তাদের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল যেন দুটি দেহে এক আত্মা। বাঁচলে এক সাথে বাঁচবে আর মরলেও একসাথে। এই ছিল তাদের সত্য বাক্য।

জুম পাহাড়ে জুমের কাজে, ছড়ায় মাছ ধরা, জঙ্গলে তরিতরকারি সংগ্রহ সবকিছু দু'জনে একসাথে করত। জুমের কাজ শেষ। এমন একটি অবসরের দিন প্রেমিক প্রেমিকা দু'জনে যাবে ছড়ায় মাছ ধরতে। তাই একদিন আগে দু'জনের মধ্যে কথা হয়। প্রেমিককে একদিনের মধ্যে একটি লুসি (মাছ ধরার বিশেষ যন্ত্র) বুনতে হবে আর প্রেমিকাকে একদিনের মধ্যে একটি খরক রিসা (মাথায় পরার ওড়না বিশেষ) বুনতে হবে। রিসাটি হতে হবে সিবাংগি (লাল রঙের নকশা করা)।

www.pathagar.com

যেদিন মাছ ধরতে যাবে সেদিন প্রেমিকাকে সিবাংগি রিসা মাথায় পরে যেতে হবে। যেই কথা, সেই কাজ। পরের দিন প্রেমিকা লাল টুকটুকে সিবাংগি রিসা মাথায় পরে আর প্রেমিক নিজের হাতে বোনা লুসি নিয়ে বেরুল মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ছড়ার পানে।

নির্জন ও আলো বিহীন ছড়া। ছড়ার এপার ওপার গভীর জঙ্গলের পাহাড়। তাই ছড়ায় সূর্যের আলো পড়ার কোন সুযোগ নেই। নানা ধরনের পাখপাখালির কলতান ছড়ার চারপাশে। ঝর্ণার বিরামহীন জল প্রপাতের শব্দে প্রেমিকপ্রেমিকা যুগল যেন স্বর্গের কাননে নৃত্যের ছন্দে তালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ অজানা ফুলের সুবাসে উন্মত্ত হল প্রেমিক। কী ফুলের সুবাস এটি, কোথায় এর অবস্থান। এদিক ওদিক তাকায় আর লুসি দিয়ে মাছ ধরতে থাকে। যতই ছড়ার উপরে এগোতে থাকে ফুলের সুবাস ততই তীব্র হতে থাকল। যেতে যেতে দেখা মিলল বিশাল একটা বটগাছ। এই গাছেই লতা ঝুলিয়ে ফুটে আছে খেলাং থু। এত সুবাস এই ফুলের! যেমন সুবাস তেমনি সুন্দর দেখতে। "ঠিক তোমারি মতো" প্রেমিকার উদ্দেশ্যে বলল। মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখে সাধ মিটল না প্রেমিকের। তার ইচ্ছা হল ফুলের একেবারে কাছে গিয়েই দেখতে।

প্রেমিকা বলল, "এই ফুলই হচ্ছে আমার প্রাণ। এই ফুলের সুবাস সাত পাহাড় আর সাত নদী অতিক্রম করতে পারে। আমার প্রাণ এই ফুলকে পাওয়া মাত্রই যেন তুমি গন্ধ না শুঁকো, পাওয়া মাত্রই যেন স্পর্শ না কর এই আমার অনুরোধ, যদি শুঁকো আর স্পর্শ কর তবে তোমার বিপদ হবে। তোমার হাত গাছেই আটকে যাবে আর চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।"

কিন্তু কে রাখে কার কথা। এই মিষ্টি গন্ধ, লোভ আর সইল না প্রেমিকের। গিয়েই গন্ধ শুঁকে ফেলল। আর প্রেমিকা যা যা বলেছিল তাই হল। দৈববাণীতে অভিশাপ দেওয়া হল 'তোমাদের দুজনের আর কোন জনমে দেখা হবে না। প্রেমিকের উদ্দেশ্যে বলল তুমি উল্লুক আর প্রেমিকাকে বলল তুমি ভাল্লুক হয়ে যাবে এখনই।'

তাই, খেলাং ফুল যতই সুগন্ধি হোক তা হাতে পাওয়ামাত্রই গন্ধ না নেওয়ার জন্য একটি গান ত্রিপুরা জনসমাজে প্রচলন হয়ে যায়-

আনি খুমুংনি সাদিগালাই
হাপং থাইসিনি মুতুমঅ
তৈবুং বুংসিনি মুতুমঅ
আনি খুমুংনি সাদিগান
কা ফা মুতুং ন তাসুদি।
কা ফা মুতুং ন সুখালাই
য়াক বাই বফাং বাই সারাপ নাই
মকল বেস্না রাপজাকনাই
আনি খুমুংনি সাদিগান
কা ফা মুতুং ফা তাসুদি দোক আতা।

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

আমার প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা ফুলটি সাত পাহাড়ে গন্ধ ছড়ায়, সাত নদী পর্যন্ত এর গন্ধ পৌঁছায়। গাছে উঠামাত্রই ফুলটি নিয়ে গন্ধ নিও না, হাতটি লেপ্টে যাবে গাছের ডালে, চোখে নেমে আসবে অন্ধকার।

চাকমা লোককাহিনি : জামাই মারনী উপাখ্যান

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক রাজার পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। রাজকন্যার রূপের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য অনেক দূরদেশ থেকে অনেক গুণী রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু রাজা রাজকন্যাকে এতো ভালবাসতেন যে তাকে ছাড়া থাকতে পারতেন না। শেষে রাজা অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের করলেন। তিনি ঠিক করলেন, কোন একটি খুব উঁচু পাহাড় থেকে নদীতে লাফ দিয়ে সাঁতার কেটে যে অপর তীরে যেতে পারবে, রাজকন্যাকে তার সাথেই বিয়ে দিবেন। প্রকৃতপক্ষে কাজটি ছিল খুবই কঠিন। তবুও রাজপুত্ররা রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্য পাহাড় থেকে লাফ দিতে রাজি হল। উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিতে গিয়ে অনেক রাজপুত্র অকালে প্রাণ হারালো।

একদিন একটি সুন্দর রাজপুত্র এসে রাজাকে তার উদ্দেশ্য জানালো। এই সুন্দর রাজপুত্রকে দেখে রাজার বড় মায়া হলো। তাছাড়া রাজকন্যারও এ রাজপুত্রকে খুব পছন্দ হলো। আগের রাজপুত্রদের অবস্থার কথা ভেবে এই রাজপুত্রকে সেই মৃত্যুমুখে পাঠাতে রাজার মন সাই দিল না। এদিকে তিনি নিজেই সেই কঠিন পরীক্ষা ঠিক করেছিলেন রাজপুত্রদের জন্য। তিনি রাজপুত্রকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক বুঝালেন। কিন্তু রাজপুত্র রাজি হলেন না। শেষে রাজা নিরুপায় হয়ে রাজি হলেন। ঠিক হল যে রাজপুত্র পরের দিন পাহাড় থেকে লাফ দিবে। রাতে দুশ্চিন্তায় রাজা অনেক কষ্টে ঘুমালেন। রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন এক বৃদ্ধ মহিলা এসে তাকে বলছেন, "তুমি এত দুশ্চিন্তা করছ কেন?" রাজা তার মনের কথা বৃদ্ধ মহিলাকে খুলে বললেন। বৃদ্ধা একটু হেসে বললেন, "চিন্তা করো না, চারটি বড় বড় বালিশ রাজপুত্রের চারদিকে বেঁধে দিয়ে, পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ার সময় ধরে রাখার জন্য একটি বড় ছাতা দিও। এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। সে সফল হবে।" এ কথা বলে বৃদ্ধ মহিলা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে রাতে তিনি আর ঘুমাতে পারলেন না। সকালে উঠে তিনি রাজকন্যাকে ডেকে স্বপ্নের কথা জানালেন। রাজকন্যা খুশি হয়ে রাজপুত্রকে সব কথা জানিয়ে স্বপ্নের নির্দেশ মত কাজ করার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু রাজপুত্র তাতে প্রথমে রাজি হলো না। শেষে অনেক কষ্টে রাজকন্যা তাকে রাজি করালো।

তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে রাজপুত্রের গায়ের সাথে চারটি বড় বড় বালিশ বেঁধে দেওয়া হলো এবং লাফ দেওয়ার আগে একটি বড় ছাতা দেওয়া হলো। রাজপুত্র নির্ভীকভাবে ঝাঁপ দিলো। সবাই অবাক হয়ে দেখলো রাজপুত্র ধীরে ধীরে নদীতে পড়ে গেলো। নদীতে পড়ার পর রাজপুত্র শরীর থেকে বালিশগুলো খুলে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

বিজয়ী রাজপুত্রকে রাজার কাছে নেওয়া হলো। রাজা খুশি হয়ে তাকে রাজকন্যার সাথে বিয়ে দিলেন ধুমধাম করে এবং তাকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী করলেন। এরপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

চাকমা লোককাহিনি : কেশকুমারী কন্যা

একদা এক রাজার সাতটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দরী। তার সুন্দর মেঘবরণ চুলের জন্য সবাই তাকে 'কেশকুমারী কন্যা' বলে ডাকতো। তার দিকে যে কেউ একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারতো না। কেশকুমারীর বড় সাত ভাইয়ের মধ্যে ছয় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কেবল ছোট রাজপুত্র কি এক কারণে তখনো বিয়ে করেনি। রাজা ও রাণী তার জন্য অনেক পাত্রী দেখলেন। এমনকি দেশ-বিদেশ থেকেও অনেক বড় বড় রাজাদের দরবার থেকে তাঁদের কন্যাদের সাথে ছোট রাজপুত্রের বিয়ের প্রস্তাব এলো। কিন্তু ছোট রাজকুমার কাউকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। মনে এক গভীর দুঃখ নিয়ে পড়ে রইলো। অবশেষে ছোট রাজকুমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের চাপে বললো, সে তার ছোটবোন কেশকুমারীকে বিয়ে করতে চায়। তার কথা শুনে সবাই ছিঃ ছিঃ করলো। এতে ছোট রাজকুমার লজ্জায় আরো বেশি সবার কাছ থেকে দূরে সরে পড়লো। সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিল।

অন্যদিকে কেশকুমারীরও লজ্জায় মরে যাওয়ার মত অবস্থা। তার ভাই কিনা শেষ পর্যন্ত তাকেই বিয়ে করতে চাইল। এদিকে ছোট রাজকুমারকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। রাজা-রাণী, ভাই-ভাবীরা অনেক বোঝানোর পরও তার মুখে একটাই কথা, সে কেশকুমারীকে বিয়ে করবে। কোনো উপায় না দেখে সবাই তখন ছুটলো কেশকুমারীকে রাজি করানোর জন্য। সবাই কেশকুমারীকে বোঝালো তার ভাইকে বিয়ে করার জন্য। কেশকুমারীর মনের অবস্থার কথা কেউ একটিবারের জন্যেও চিন্তা করলো না। বেচারী না পারে রাজি হতে, না পারে ফিরিয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত সে রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে সমুদ্রতীরে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। আর এদিকে ছোট রাজকুমার কেশকুমারীকে না পেয়ে অনাহারে মরার সিদ্ধান্ত নিল। তখন বাড়ির সবাই ছুটলো কেশকুমারী কন্যার খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে তাকে পাওয়া গেল সমুদ্র তীরে। তাকে পাওয়ামাত্র সবাই জোরাজুরি করতে লাগলো তার ভাইকে বিয়ে করার জন্য। কেশকুমারী প্রথমে রাজি না হলেও পরে সবার অনুরোধে রাজি হলো। তাতে সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো এবং তাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। তারপর শুভদিন দেখে ছোট রাজকুমারের সাথে কেশকুমারী কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। এরপর সুখে দুঃখে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

একদিন কেশকুমারী ছোট রাজকুমারকে নিয়ে সাগরে স্নান করতে গেলো। স্নান করতে করতে একসময় ছোট রাজকুমার কেশকুমারীর কাছ থেকে দূরে চলে গেলো। এমন সময় সমুদ্রের একটা দূরের দ্বীপ থেকে একটা মেয়ে তাকে ডেকে তার কাছে যেতে বললো। মেয়েটি বললো, সে তার মাথার উকুন বেছে দিবে, দু'জনে গল্প করে আনন্দে সময় কাটাবে। কেশকুমারী প্রথমে যেতে রাজী হলো না। পরে মেয়েটি অনেক মিনতি করার পর সে একটা নৌকায় চড়ে দূরের দ্বীপে যেতে লাগলো। সে দ্বীপের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে মেয়েটি দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে নৌকা থেকে ফেলে

www.pathagar.com

দিলো। তারপর নৌকাটিতে চড়ে পালিয়ে গেলো। বেচারী কেশকুমারীর তখন সাগরে ডুবে মরার অবস্থা। এমন সময় তার স্বামী তার এ অবস্থা দেখে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে খবর দিল। আর খবর পাওয়া মাত্র তার মা-বাবা, ভাই-ভাবী সবাই সমুদ্র তীরে ছুটে এলো। তখন কেশকুমারী কোন রকমে একটি বড় 'মেলোনি পাতা' আঁকড়ে ধরে ভেসে ছিল। তার অবস্থা দেখে অনেক প্রজা নৌকায় চড়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটলো। তখন তীর থেকে সবাই কেশকুমারীকে বলতে লাগলো পাতাটি ছেড়ে দিয়ে নৌকায় উঠতে। তখন কেশকুমারী সবাইকে ফিরে যেতে বললো। সে বললো তার জীবনের প্রতি কোন মায়া নেই। সে মরতে চায়, সে আর এ জীবনে বাবা-মাকে শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাবীদের জা মানতে পারবে না। এই বলে সে মেলোনি পাতা ছেড়ে সাগরের জলে ডুবে গেল। তা দেখে সবাই আরো বেশি কাঁদতে লাগলো। এরপর রাজার আদেশে অনেক জেলে জলে নেমে কেশকুমারীকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেলো না। তখন সবাই কাঁদতে কাঁদতে প্রাসাদে ফিরে গেলো।

কেশকুমারী পানিতে ডুবে সাগরের নিচে একটা লম্বা লেজওয়ালা শামুক (লেজা শামুক) হয়ে রইল। পরে এক জেলের জালে আটকা পড়লো লেজা শামুকের ছদ্মবেশে কেশকুমারী কন্যা। বুড়ো জেলে শামুকটাকে বাড়িতে নিয়ে রেখে দিলো। পরে সে শামুকটার কথা ভুলে গেলো। বুড়ো প্রতিদিন সাগরে মাছ ধরতে যেতো। এভাবে দিন যেতে লাগলো। কিন্তু প্রতি পূর্ণিমা রাতে বুড়ো যখন ঘুমোয়, কেশকুমারী শামুক থেকে তার নিজের রূপ ধারণ করে বাইরে বেরিয়ে আসতো। তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করে রান্না করে আবার শামুক হয়ে যেতো। বুড়ো জেলে সকালে উঠে অবাক হয়ে যেতো। এভাবে এক পূর্ণিমা রাতে বুড়ো ঘুমের ভান ধরে পড়ে রইল। রাত বাড়ার পর সে দেখল শামুকের খোল থেকে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর সে ঘরের সব কাজ শেষ করে যখন শামুক হতে যাবে বুড়ো জেলে তাকে খপ করে ধরে ফেললো। বললো "মা তুমি কে?" তখন কেশকুমারী বললো, "বাবা আজ থেকে আমি তোমার মেয়ে"। সে তার জীবনের সব কথা বুড়ো জেলেকে খুলে বললো। বুড়ো তখন কেশকুমারীকে তার পালিত কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলো। এরপর বুড়ো জেলে তাকে জিজ্ঞেস করলো কিভাবে সে শামুক থেকে পুরোপুরি মানুষ হতে পারবে। তখন কেশকুমারী বললো-

"কুংগাঝ আঙারা ঘাদি দিলে
লকখন বিজোন বিজি দিলে
জুরো পানিহুম ধালি দিলে
জিয়োন্যা বিজোন বিজি দিলে
শামুগ সলংয়ান পুরি ফেলেলে-
তে মুই মানব কুলত ফিরি এইম"।

বঙ্গানুবাদ

কোম গাছের অঙ্গার জ্বালিয়ে
লক্ষ্মণের পাখা দিয়ে বাতাস করলে

www.pathagar.com

এরপর সেখানে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে
জীয়ন পাখার বাতাস করলে
শামুকের খোলসটি পুড়িয়ে ফেললে
তবে আমি মানব জীবনে ফিরে আসবো।

কেশকুমারীর কথা অনুযায়ী বুড়ো তাই করল। তারপর কেশকুমারী আবার পুরোপুরি মানব জীবনে ফিরে আসল এবং বুড়োর সাথে বসবাস করতে লাগল। তারা সমুদ্রতীরে যেখানে বাস করছিল তাদের সে এলাকাটা ছিল নির্জন। একদিন ছোট রাজপুত্র শিকারে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়লো এবং কেশকুমারীকে দেখে ফেললো। আর কেশকুমারীও তার স্বামীকে চিনতে পেরে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে রইলো।

তারপর রাজকুমার প্রাসাদে গিয়ে কেশকুমারীর কথা বললো। তার কথা কেউ বিশ্বাস করলো না। পরে তার চাপাচাপির কারণে সবাই বুড়ো জেলের বাড়িতে গেল আর কেশকুমারীকে চিনে ফেললো। কিন্তু কেশকুমারী অস্বীকার করলো এবং বললো সে এক সামান্য জেলের মেয়ে। এরপর কি আর করা, সবাই বাড়িতে ফেরার জন্যে মনস্থির করল। কিন্তু ছোট রাজপুত্র নাছোড়বান্দা। জেলের কন্যা হলেও সে তাকে বিয়ে করবে। শেষে রাজা-রাণী নিরুপায় হয়ে বুড়ো জেলেকে অনুরোধ করল তার মেয়ের সাথে ছোট রাজকুমারের বিয়ে দিতে। বুড়ো জেলে আর কি বলবে। তখন বাড়ির ভিতর থেকে কেশকুমারী বললো, রাজা যদি বাড়ির উঠোনে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাকে নিয়ে যায় তাহলে সে রাজবাড়িতে যাবে। একথা শুনে সবাই খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। এরপর নির্দিষ্ট দিনে সবাই ঘোড়ায় আর পাল্কীতে চড়িয়ে কেশকুমারীকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলো। কেশকুমারী উঠানে পৌঁছে পাল্কী থেকে বেরিয়ে এল এবং সবার সন্দেহ দূর করে নিজের পরিচয় দিয়ে দৌড়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল।

চাকমা লোককাহিনি : দুলু কুমারী

একদা একটি ছোট্ট সংসারে স্বামী স্ত্রী আর সোনার টুকরোর মত ছেলে এবং হীরার টুকরোর মত একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল ভারী আদরের। আদর করে তাকে সবাই দুলু কুমারী বলে ডাকতো। সে যখন যা চাইতো তা না দিয়ে করো উপায় থকতো না। তার আবদার রক্ষা করতে গিয়ে একে একে তার বাবা আকাশ থেকে চাঁদ আনতে গিয়ে এবং মা তারা আনতে গিয়ে মারা যায়। একে একে বাবা আর মাকে হারিয়ে ভাই-বোন সবাই মিলে অনেকদিন ধরে কাঁদলো। তারপর দিন গিয়ে দিন, মাসের পর মাস, বছর ঘুরে বছর এলো। দুলু কখন যে ভাইদের আদরে স্নেহে বড় হয়ে উঠলো টেরও পেল না। ততদিনে তার ভাইয়েরা সবাই বিয়ে করে ঘরে বউ এনেছে। তার বৌদিদের মনে ছিল হিংসা। কিন্তু ভাল মানুষের ভান করে তাকে খুব আদর যত্ন করতো, একটুও কাজ করতে দিত না।

এভাবে দিন যেতে লাগলো। তারপর একদিন ভাইয়েরা টাকা আয় করার জন্য সবাই মিলে অনেক দূরে বিদেশে চলে গেল। যাওয়ার সময় তাদের বউদের বলে গেল দুলু কুমারীর যাতে কোন অযত্ন না হয়। তা না হলে কপালে দুঃখ আছে। ভাইয়েরা বিদেশে চলে যাওয়ার পর বৌদিরা তো মহাখুশী। তারা দুলু কুমারীকে দিয়ে ঘরের সব

www.pathagar.com

কাজ করানো শুরু করলো। বেচারী দুলু কুমারীর দুঃখ কষ্টে দিন যেতে লাগলো। একদিন দুলু কুমারী উঠানে কাজ করার সময় একটা বিরাট চিল মুখে একটা হাঙর মাছের শুটকি নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তা দেখে বড় বৌদির খুব লোভ হল। তাই সে চিলটার উদ্দেশ্যে বললো-

"ও চিল হাঙর মাছচান দি যা
আমা দুলু কুমারীরে নে যা"

কথাগুলির অর্থ 'ওরে চিল হাঙ্গর মাছটা দিয়ে যাও, আমাদের দুলু কুমারীকে নিয়ে যাও।' এভাবে পরপর তিনবার বলার পর চিলটা হাঙ্গর মাছের শুটকিটা রেখে দুলু কুমারীকে ঠোঁটে নিয়ে সাঁ করে আকাশে উড়ে চলে গেল। চিলটা উড়তে উড়তে এক সময় একটা 'চিবিত' গাছের উপর বসল। সেখানে চিলটা দুলু কুমারীকে তার বাসার উপর রাখলো। দুলুর তখন ভয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। ওদিকে তার বৌদিরা সবাই মিলে মহা উৎসাহে হাঙ্গর মাছের শুটকিটা রান্নার কাজে নেমে গেল। দুলুর জন্য কেউ একটুও চিন্তা করলো না।

চিলটা দুলু কুমারীকে তার বাসার উপর রেখে আবার খাবার খুঁজতে চলে গেল। বেচারী দুলু তখন প্রাণের ভয়ে আর খিদের জ্বালায় অস্থির। সামনে খাবার কিছু নেই। অবশেষে দুলু খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে চিলের বাসায় যেসব পঁচা মাংস পড়ে ছিল তাই খেতে শুরু করলো। এরপর এভাবেই শুরু হলো তার জীবন। দুলুর শরীর শুকিয়ে গেল। বেচারী সারাদিন চিলের বাসায় কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতো। একদিন তার ভাইয়েরা বাণিজ্য করে বিদেশ থেকে বনের পথ দিয়ে ফেরার সময় হঠাৎ মানুষের কান্নার শব্দ শুনতে পেল। তারা সবাই চারদিকে তাকাতে লাগলো কান্নার শব্দ কোথেকে আসছে তা দেখার জন্য। অবশেষে বুঝতে পারলো উপর থেকে আসছে। তারপর তারা গাছের উপর উঠে চিলের বাসায় দুলু কুমারীকে দেখতে পেল।

সাথে সাথে দুলু তার ভাইদেরকে সব কথা খুলে বললো। দুলুর অবস্থা দেখে তার ভাইদের খুব খারাপ লাগলো এবং তখনই তারা ঠিক করলো তাদের বউদের তারা এর উপযুক্ত শাস্তি দিবে। এজন্য তারা সাতটা লাঠি তৈরি করে নিল। তারপর দুলুকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাড়িতে চলে গেল এবং বাড়িতে পৌঁছানোর সাথে সাথে তাদের বউদের লাঠিগুলো দিয়ে পিটানো শুরু করলো। এতে বউরা তাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলো আর দুলুর অবস্থা দেখে তাদের খুব মায়া হল। তারপর তারা দুলুকে আদর করে বুকে তুলে নিল, স্নান করালো এবং খাওয়াতে বসালো। এতে দুলুর মুখে আবার হাসি ফিরে এল। এরপর তারা সবাই মিলেমিশে সুখে জীবন যাপন করতে লাগলো।

খ. কিংবদন্তি

ত্রিপুরা কিংবদন্তি : মাতাই তুয়ারি বা মাতাই পুখির

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলাস্থ নুনছড়ি মৌজায় অবস্থিত সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ৭০০ ফুট উপরে প্রায় সাড়ে ৫ একর জায়গা জুড়ে বিদ্যমান প্রাকৃতিক হ্রদ

www.pathagar.com

মাতাই তুয়ারি বা মাতাই পুখির, বাংলাভাষি ও পর্যটকদের কাছে হ্রদটি 'দেবতার পুকুর' নামে অধিক পরিচিত। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে থাকা এই পবিত্র জলাশয়টি দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় হাজার ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ছয়শত ফুট। এই প্রাকৃতিক জলাশয়টির গভীরতা নিয়ে রয়েছে নানা লোকশ্রুতি। কথিত আছে, রেবতীরঞ্জন নামের জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক স্থানীয় লোকদের সাহায্যে বাঁশের ভেলায় চড়ে এই হ্রদের মাঝখানের গভীরতা মাপার চেষ্টা করেন। কিন্তু দড়ি তল পর্যন্ত ঠেকাতে পারেন নি। বরং ভেলাসহ ডুবে যায় যায় অবস্থা হওয়াতে একটা ছাগল মানত করে গভীরতা নির্ণয়ের চেষ্টা ত্যাগ করেন। এই প্রাকৃতিক হ্রদকে নিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত রয়েছে নানা লোককাহিনি। সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রকৃতি পূজারি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির বিশ্বাস অলৌকিক কোনো শক্তির প্রভাব রয়েছে বলেই হ্রদটি উঁচু একটি পাহাড়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই হ্রদের জল কখনও শুকোয় না। অনেকের বিশ্বাস, স্বয়ং জল দেবতা স্থানীয় গ্রামবাসীদের পানির চাহিদা মেটানোর জন্য এই হ্রদ সৃষ্টি করেছেন। তাই স্থানীয়দের কাছে এটি আশীর্বাদস্বরূপ।

মাতাই তুয়ারি বা মাতাই পুখির তীর্থক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের ভীড়

হ্রদের চারদিক ঘন বন ও মালভূমি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় এই হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে এর উচ্চতা অনুভব করা যায় না। প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তির সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা তীর্থযাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের সমাগম ঘটে এই হ্রদে। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, এই হ্রদে স্নান করলে এবং নানা মানত করলে মনোবাসনা পূরণ হয় এবং নানা রোগ ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। ত্রিপুরাদের কাছে হ্রদটি একটি তীর্থস্থান।

www.pathagar.com

অনেকের ধারণা, পুরাকালে এই হ্রদটি স্বয়ং দেব- দেবীরা রক্ষণাবেক্ষণ করতো এবং সবসময় পাহারা দিয়ে রাখতো। বিবাহসহ সামাজিক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নের জন্য এই হ্রদের পাড়ে এসে পবিত্র মন নিয়ে প্রার্থনা করলে সোনার বাসন-কোষন পানির উপর ভেসে উঠতো। সামাজিক কাজ সম্পন্ন করে গ্রামবাসীরা আবারও সেই সোনার বাসন- কোষন ফিরিয়ে দিত। কোন এক অসৎ গ্রামবাসীরা শপথ ভঙ্গ করে হিসেব মতে বাসন ফিরিয়ে না দেওয়ার পর থেকে দেবতারা রুষ্ট হয় এবং আর গ্রামবাসীদের বাসন কোষন দেওয়া বন্ধ করে দেয় বলে কথিত রয়েছে।

অন্য এক প্রচলিত বিশ্বাস মতে, পুরাকালে এই পাহাড়ে পাশাপাশি দুইটি ত্রিপুরা লোকালয় ছিল; উদয় কারবারি পাড়া ও ধন্য কারবারি পাড়া। উদয় কারবারি পাড়ার জনৈক বাসিন্দা একসময় এই পাহাড়ে জুমচাষের উদ্যোগ নেন। এই সময় তাকে স্বপ্নাদেশ দেওয়া হয় এই পাহাড়ে জুম চাষ না করার জন্য। কিন্তু জুমিয়া ব্যক্তিটি সেই স্বপ্নাদেশ আমলে না নিয়ে জুম চাষ করেন। স্বপ্নে বারবার তাকে নিষেধ করা হয়। শেষে যখন জুমের ফসল তোলার সময় আসলো, তখন তিনি আবারও স্বপ্নাদ্দিষ্ট হলেন। তখন তাকে নরবলি দিয়ে তবেই জুমের ফসল কাটার জন্য আদেশ দেওয়া হয় এবং নরবলি দিলে জুমের ফসলের পাশাপাশি আরও কিছু ধনলাভ করবেন বলেও স্বপ্নে জানানো হয়। কিন্তু এই শর্ত পূরণ করা জুমিয়া কৃষকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর কিছুদিন পর এক অমাবস্যার রাতে সেখানে এক প্রলয়ংকরী ভূ-কম্পন দেখা দেয়। সকালে উঠে সকলে দেখতে পায়, সেখানে জুমের পরিবর্তে বিরাট এক জলাশয়।

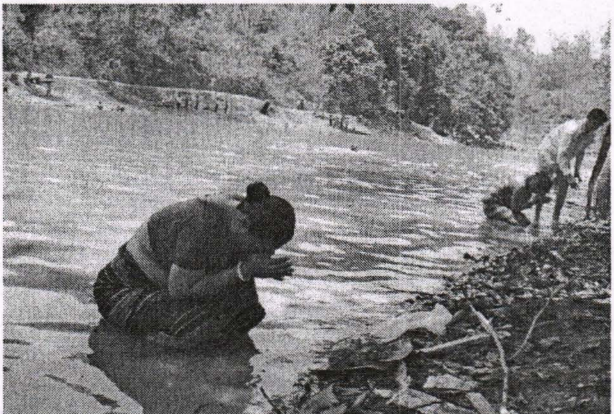

মনোবাসনা পূরণের আশায় মাতাই তুয়ারিতে পূজো করছেন এক ত্রিপুরা নারী

অন্য এক প্রচলিত লোকশ্রুতি ঘিরে রয়েছে ধন্য কারবারির এক ষোড়শী কন্যাকে নিয়ে। জানা যায়, ধন্য কারবারির ষোড়শী কন্যা একদিন কলসী কাঁখে একাকিনী ভরদুপুরে জল তুলতে গিয়ে দেখতে পায় জলাশয়টি পুরো জলশূন্য হয়ে রয়েছে এবং গভীর খাদে জলাশয়টির মাঝ বরাবর দুইটি সিন্দুক রোদে ঝকমক করছে। সে

www.pathagar.com

কৌতুহলবসে পাড়ায় গিয়ে তার মা-বাবাকে বিষয়টি বলে। কিন্তু সকলে এসে দেখতে পায় জলাশয়টি আগের মতোই জলে ভরা। এরপর থেকে কারবারির কন্যা প্রতি রাতে স্বপ্নে দেখতে থাকে, কোন এক সুন্দরী দেবী তাকে তার সাথে যাওয়ার ডাকছেন। বারবার দেবীর আদেশ পেয়ে ষোড়শী কন্যা একদিন সুবাসিত তেল মেখে, বুনো ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে খোঁপা সাজিয়ে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হ্রদের জলে নেমে যায়। পাড়াবাসীরা অবাক হয়ে দেখলো, মুহূর্তে এক পরীর মতো পরমা সুন্দরী নারী এসে তাকে কোলে করে জলাশয়ের মাঝখানে চলে গেল। জল যেন তখন দু'ভাগ হয়ে তাদের রাস্তা করে দিল। অশ্রুসজল চোখে গ্রামবাসী সকলে এই দৃশ্য অবলোকন করলো।

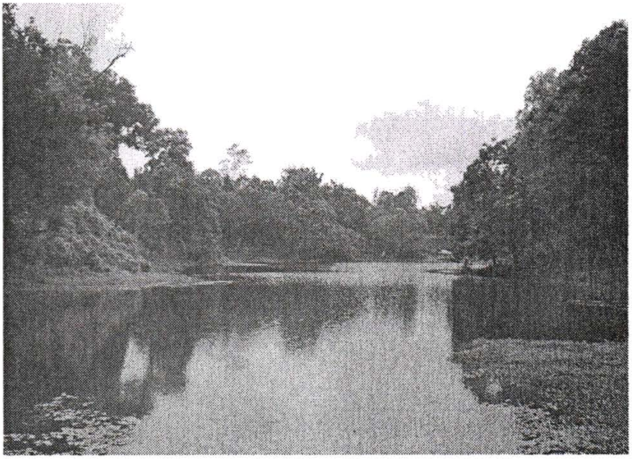

প্রাকৃতিক হ্রদ মাতাই পুখির

এই জলাশয়ে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক একটি ঘটনা লোকমুখে এখনও প্রচলিত। দিনটি ছিল ১৯৭৯ সালের চৈত্রসংক্রান্তির দিন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা বসে। পূণ্যার্থীরা সমবেত হয় মনোবাসনা জানিয়ে নানা পূজো অর্চনা করার জন্যে। সবে পূজো আচার শেষ হয়েছে, অমনি জলাশয়ের মাঝ বরাবর জল সশব্দে নেচে উঠে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক পরমাসুন্দরী জলকন্যা জলের উপর কোমর পর্যন্ত ভেসে উঠে এবং মুহূর্তে আবার জলে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সময় উপস্থিত সকলে এই দৃশ্য অবলোকন করে।

আরো একটি জনশ্রুতি মতে, সেখানে এক বিধবা নারী বাস করতেন। একদিন গ্রামের শেষ প্রান্তের বটগাছের কোটর হতে মস্তবড় এক অজগর সাপ পেয়ে গ্রামবাসী সকলে মহাভোজে মেতে উঠে। মহাভোজকালে তারা দরিদ্র বিধবাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যায়। রাতে দরিদ্র বিধবার স্বপ্নে এক দেবতা এসে তাকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলে। কারণ শেষ রাতে এই গ্রামে একটি অঘটন ঘটবে। দেবতার আদেশ

www.pathagar.com

অনুযায়ী বুড়ি গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ভোর রাতে তিনি বিকট আওয়াজের বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। সকালে গিয়ে দেখেন পুরো গ্রাম একটি সরোবরে পরিণত হয়েছে। সকল গ্রামবাসী নিদ্রামগ্ন অবস্থায় এই সরোবরে মিলিয়ে যায়। হ্রদটিকে দেখলে সত্যিই কোন বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট একটি জলাধারের মতো মনে হয়।

তীর্থক্ষেত্র মাতাই পুখির বা মাতাই তুয়ারির চারিদিকে রয়েছে নানা সাইজের প্রাকৃতিক পাথর

সাম্প্রতিক সময়ের একটি অবিশ্বাস্য কাহিনি এখন বেশ জনপ্রিয়। সম্ভবত ২০১২ সালের বৈসুর সময় রাঙামাটির কিছু ত্রিপুরা পরিবার এই তুয়ারিতে বেড়াতে এসেছিল। তাদের সাথে কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েও ছিল। তাদের মধ্যেকার এক ছেলে মাতাই পুখির ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রচারমূলক সাইনবোর্ডে জলাশয়ে 'মুখ কুলি করে পানি না ফেলা'র অনুরোধ দেখে দুষ্টুমি করে কুলি করে মুখের পানি জলাশয়ে ফেলে দেয় এবং স্নানের সময় প্রস্রাব করে দেয়। রাতে বাড়ি ফিরে ছেলেটির গায়ে প্রচণ্ড জ্বর আসে এবং ফুসকার মতো এক ধরণের এলার্জি দেখা দেয়। ছেলেটির মা বিষয়টি জানতে পেরে মাতাই তুয়ারিতে পূজো দেওয়ার মানত করলে ছেলেটির অসুখ ভালো হয়ে যায়।

মারমা কিংবদন্তি : রিফুং-জাং

(মারমা নৃ-গোষ্ঠীর গ্রামে গেলে দেখা যাবে পথের ধারে, বাঁকে মাচাং/টং ঘরে কলসি ভর্তি পানি রাখা আছে। এ ঘরটির মারমা নাম 'রিফুং-জাং'। এ রিফুং-জাং প্রচলনে মারমা নৃ-গোষ্ঠীর সমাজে একটি লোক কাহিনি প্রচলন আছে। নিম্নে সে লোককাহিনি তুলে ধরা হল।)

বহুবছর আগে পাহাড়ে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করত এক বুড়ি। ছেলেকে কাজের সন্ধানে প্রায় বাইরে থাকতে হত। বুড়ির ঘর ছিল পথের পাশে। পাহাড়ি রাস্তা

www.pathagar.com

পেরিয়ে পরিশ্রান্ত পথিক বুড়ির ঘরে বিশ্রাম ও পানি পান করতো। বুড়ি রোজ পাহাড়ের অনেক নিচ থেকে ঝর্ণার পানি সংগ্রহ করে রাখতো। একদিন বুড়ি ভাবলো এতো কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করে পথিকদের তৃষ্ণা মিটিয়ে আমার তো কোন লাভ হয় না! বরং এই শরীরের উপর ধকল যাচ্ছে। এই ভেবে সে পরের দিন থেকে পথিকদের পানি দেওয়া বন্ধ করে দিল। পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত পথিক পানি না পেয়ে বিফল হয়ে মনোকষ্টে ফিরে যেতে লাগলো।

এদিকে বুড়ির ছেলে অনেক দূর এলাকায় কাজ করে রোজগারের অর্থ নিয়ে ঘরে ফিরছিল। সঙ্গে ছিল তার দুই বন্ধু। হাঁটতে হাঁটতে একসময় তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে এক পাহাড়ি ঝর্ণা পেলো। আনন্দে সে ঝর্ণায় তৃষ্ণা মেটাতে ছুটে গেলো। কিন্তু ঝর্ণায় বিষাক্ত সাপ থাকায় সে ভয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ফিরে এলো। কিছু দূর গিয়ে সে ছড়ার পাশে জমে থাকা পানি দেখলো। পানের জন্য পাশে যেতেই তাকে ভাল্লুক তাড়া করলো। অনেক পথ পেরিয়ে জংগল কেটে খোঁজা-খুঁজির পর পানি না পেয়ে অবশেষে ছেলেটি তৃষ্ণায় মারা গেলো। তার দুই বন্ধু মৃতদেহ সৎকার করে গ্রামে ফিরে এলো। ছেলের রোজগারের অর্থ বুড়ির হাতে দিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর সংবাদে বুড়ি শোকে পাথর হয়ে গেলো। অনুতপ্ত হয়ে ভাবতে লাগল তৃষ্ণার্ত পথিকদের পানি না দেওয়ার অভিশাপেই তার ছেলে পানির তৃষ্ণায় মারা গেছে।

এরপর থেকে বুড়ি তৃষ্ণার্ত পথিকদের জন্য তার ঘরের পাশের রাস্তায় টং ঘর বানিয়ে কলসিভর্তি পানি রেখে দিতো। দূর থেকে আসা ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত পথিকেরা সেখানে বিশ্রাম করতো আর তৃষ্ণা নিবারণ করতো। সেই থেকে মারমা সমাজের গ্রামে গ্রামে পথের ধারে টং ঘর/মাচাং ঘর তৈরি করে কলসি ভর্তি পানি রাখার ব্যবস্থা করে আসছে। যার মারমা নাম 'রিফুং-জাং'।

মারমা নৃ-গোষ্ঠীর বিশ্বাস মতে- তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কোন প্রাণীকে ফিরিয়ে দিলে নিজেকেও পানীয় জলের অভাবে পড়তে হয়।

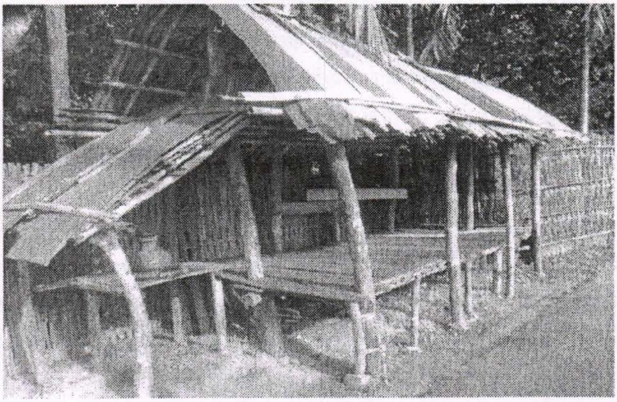

মারমাদের ঐতিহ্যবাহী একটি রিফুং-জাং, যা ধর্মঘর নামে বেশি পরিচিত

www.pathagar.com

গ. লোকছড়া

চাকমা সমাজে প্রচলিত কিছু ছড়া (মিল কদা)

১
কবা জাং কবা জাং
মামু ঘরত্ জাং
মামি দিব কুরা কাবি
চিত্ ঘিলালোই খাং

(কবা জাং কবা জাং মামার বাড়ি যাই
মামী দিবে মুরগি কেটে ঘিলা-কলিজা দিয়ে ভাত খাই)

২
দিগলিবাগত্ চরতন মোচ্
সমারে বেরাদন ননন-ভোচ
ননন্ ভোচর্ ইক্কু লোম্
সবায় ন পেলে থাগুর হোম্

(নদীর তীরে মহিষ চড়ছে
সাথে বেড়াচ্ছে ননদ-বৌদি
ননদ-বৌদির একজনকে বিয়ে করবো
কাউকে না পেলে সন্ন্যাসী হবো)

৩
অলি অলি অলি
বাঁঝর পাদার ঝলি
বেবে সিঝি ঘুম যার
সোনার ধুলনত্ পড়ি

(অলি অলি অলি
বাঁশের পাতার বেড়া
আদরের নাতনী ঘুম যাচ্ছে
সোনার দোলনায় চড়ে)

৪
অজল পাগর্যা নিজো ঝুপ
দিন দিন পরেত্তি কলিযুগ
কলিযুগত সত্য নেই
বুক চিরি দেগেলেঅ পত্য নেই।

(উঁচু গাছগুলো নিচু ঝুপের মতো হয়ে যাচ্ছে
কলিযুগটা যেন দ্রুত তেড়ে আসছে
এই যুগে কোন সত্য নাই
বুক চিরে দেখালেও কেউ বিশ্বাস যায় না)

৫
কালা কালা হক্কেং
চিদিরা চিদিরা গুই
ভুক গরি ঝাপ দিলেও
ন দরাঙ্গে মুই।

(কালো কালো তক্ষক
ডুরাকাটা গুই
সামনে এসে ভয় দেখালেও
ডরাই না মুই/ আমি)

৬
পিদিলি দাবা বৈধক দ্যা
কুন্দি ঘাজিলে সদক্যা
পানি খেইয়া পনত্তুন
নিত্য ন যায় মনত্তুন।

(কি এমন রূপের মাধুরি দিয়ে
বানিয়েছেন বিধাতা স্বয়ং
ম্লান হয়ে যায় যেন
পৃথিবীর সব রূপ রং
স্বচ্ছ পানিতে যেমন
নিজের মুখচ্ছবি দেখা যায়
তেমনি প্রিয়ার রূপের মাধুরি
চিরদিন মনে গেঁথে রয়)

ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত কিছু ছড়া (ককতাং)

১
অ গ কালি য়ংগম্না দালি
সিপ্র অচাই গবিং তানসরাই
(ও মা কালী এ কি দেখালি!
ছোট্ট ব্যাঙের বলি হচ্ছে

www.pathagar.com

কুনো ব্যাঙটা পুরোহিত
সোনা ব্যাঙটা কসাইয়েল সাজে
বুঝি না হিতাহিত)

২
অ তকলাসা তকলাসা
আর ওয়াইসা কিচিগ্রা
আনি তকমা-ন লানিখম্নাই
আর ওয়াইসা কিচিগ্রা
দ তকলা দ---
কক কে-রে ক---
(ওহে মোরগ আরেকবার ডাকো দেখি
আমার মুরগিটাকে বিয়ে করতে চাইলে
আরো একবার ডাকো, কক কে-রে ক)

৩
ও চেরাইসা চেরাইসা
নামা নাফা ব-র থাংখালা?
- বল লানি থাংগ
বল লে?
- হাপিংঅ
হাপিংলে?
- থা কাইজাক
থালে?
- ওয়াক চাগ
ওয়াকলে?
- তৈ কুঅ
তৈলে?
- মায়ুং সুরু-ব
মায়ুংলে?
- হাতুং কাসাগ
হাতুংলে?
- সদৈ কাইজাক
সদৈলে?
- করগৈ পাইখা
আওয়া তক্কে!!!

(ওহে বালক
তোমার মা বাবা কোথায় গেছে?

-পরিত্যক্ত জুমে।
জুম কোথায়?
-যেখানে কচু লাগানো হয়েছে।
কচু কোথায়?
-শুকরে খেয়েছে।
শুকর কোথায়?
-ছড়ার পানিতে স্নান করে।
পানি কোথায়?
-হাতি খেয়ে ফেলেছে।
হাতি কোথায়?
-টিলার উপর উঠছে।
টিলা কোথায়?
-যেখানে হলুদ লাগানো হয়েছে।
হলুদ কোথায়?
-নির্বংশ হয়ে গেছে।
ওহ্ তাই নাকি!!!)

৪
হাবা সাকাংনি মখ্রে কইরেম
চাখালাই খ্রইয়াদে
রাধা বাই কৃষ্ণ প্রেম খস্নাইবা
বক খস্নাই মাসাংনৈয়াদে ?

(জুমে লাগানো টক পাতা
খেলে কি টক হয় না
রাধা-কৃষ্ণও তো প্রেম করেছে
তাদের সম্পর্ককেও কি লোকে অবৈধ বলে না?)

৫
মাইরুং রাতানাই সেরি মাইরুং রাতানাই সেরি
রাধাবাই কৃষ্ণ কলংক অংবা কলংক ন দে কিরি ?
(চাউল মাপতে সেরিতো লাগবেই, তাতে কি আসে যায়
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে যে কলঙ্ক লেগেছে, তাই বলে কি প্রেম থেমে যায়?)

৬
তকথু ন-গ সে তকথু কু'গ
ফাব্রুক ন-গ দে কু
বরক ন-গ সে বরক কা'গ
দংগি ন-গ দে কা ?

www.pathagar.com

(ঘুঘুর ঘরে তো ঘুঘুই ডাকবে
কবুতরের ঘরে কি সে ডাকে
মানুষের সাথেই তো মানুষ সম্পর্ক করবে
অমানুষের সাথে কি করে?)

৭
ফেনক বস্নাইনি পৈয়াসি
নুংলাই আং বাই কক সায়া মানাসি ॥

(বেগুন পাতায় মৌমাছিটা বাসা বেঁধেছে
তাই বলে কি আমার কথা না বলার প্রতিজ্ঞা করতে আছে?)

৮
থু থু আকৈ থু
আমা হাবানি ফাইকাই
হাবা কুকসুমা চানানি
থু থু আকৈ থু
আফা হাতিনি ফাইকাই
হাতি মিথাই চানানি ॥

(ঘুমাও সোনা ঘুমাও
জুম থেকে মা আসলে
জুমের ফড়িং দেবে এনে
ঘুমাও সোনা ঘুমাও
বাজার থেকে বাবা এলে
মিষ্টি কিছু দেবে এনে।)

৯
নাউয়ৈ বিমানি বি দারি
সুকৈ চুংমানি চুং দারি
আনি মায়ৈ লাই বিখারি ॥
(নাউয়ৈ পাখিগুলো সমানতালে ওড়ে
ঘিলা খেলার সময়ও সমানতালে তা সাজাতে হয়
আমার মা যে ভিখিরি তার দিন কি আর সবসময় সমান যায়)

১০
ওয়ানা ওয়ামিলি বেমতক
চুংলাই সাকা রৗংয়ানি রৗংথতক
রাই-গ রৗংয়ানি রৗংথতক ॥

www.pathagar.com

(বাঁশে যেমন চুলকুনি থাকে
দেখলেই চুলকোয় গা
চেহারাতে সৌন্দর্য নাই বলে কি
বলতে হবে রাক্ষস-ডাইনীর ছা?)

১১
মাই কুতুং কুতুং কককে
বফাং দুরকোং তককে
চিনি জাতিরক সকপাইয়া হিমবম্নাই
সকপাইখা লুপে লুপে ॥

(গরম ভাত মাখতে ভালো
তক্ষক মানায় গাছের কোঠরে
বহুদিন দেখি না আত্মীয়-স্বজন
আজ যেন আসছে দলে দলে)

১২
বাংলা গাইরিং বাংলা গাইরিং
চিনি কামিনি সিকলা রকলাই
হেমকাই য়ারিং বারিং ॥

(জুমের ঘরটি টিড়িং বিড়িং
আমাদের মেয়েদের দল
যেন হাঁটছে টিড়িং বিড়িং)

১৩
অরাই দালক চারীকয়া
আ'ন কিরিয়ই ফাইরকয়া ॥
(তিতা পাতা কেউ খায় না
আমার ডরে কেউ কাছ ঘেঁষে না)

১৪
হাকরৈ বামথু ক্রৈ হাকরৈ বামথু ক্রৈ
চিনি কামিনি সিকলারকনি খিলাম বুমথু ক্রৈ ॥

(পানির ঘটির তলা কানা
আমাদের পিছনটি দেখতে মানা)

www.pathagar.com

১৫
তৈ নি সকুমু কালক বাই কিতিং
জাবারা বিসিং বিসিং
নুংবাই আংবাইলাই খা বিসিং বিসিং
নাতারকবাইরাই কিচিং ॥

(বন্ধুর ছোট বোনকে পছন্দ করে এ কথা বলা হয়-
লম্বা বা গোল জাতের যে কোন শামুকই
থাকে লতা-গুল্মের ফাঁকে ফাঁকে
উপরে তোমা দাদাদের সাথে বন্ধুত্ব
ভালোবাসি তোমায় ভিতরে ভিতরে)

১৬
তৈ গুরুং গুরুং তুয়ারি মাইরাং
তকফাইলিয়ালে আরাং
লখি হুক পায়ই ন'গ থাংকানা
খানালিয়ালে খরাং ॥

(ঝুর ঝুর আওয়াজের ঝর্ণায়
লম্বা মাছটি আর এসে খেলা করছে না
তাহলে আমার প্রিয়ার জুমের কাজ শেষে
বাড়ি ফিরে গেছে, তার কণ্ঠ যে আর শুনছি না!)

১৭
ওয়াসুং বিসিং নি সিন্দ্রাই
বুয়া আত্রাই বাত্রাই
আং সুফখন্নাই স্রাই ॥
(শিশুদের কোনো পিপড়া বা এমন ছোট-খাটো পোকা কামড়ালে এভাবে ভুলানো হয়-
চুঙার ভেতরের যতো বড়ো বিষধর
পোকা-মাকড় আসুক দাঁত কিড়বিড়িয়ে
আমি যখন ফু দেবো সব যাবে পালিয়ে)

১৮
কাউয়া কাউয়া মকল হাময়া তিলাং মকল গাম রফাই
থ থ থ
(শিশুদের চোখে কোনো ছোট-খাটো চোট লাগলে এভাবে ভুলানো হয়-
ও কাকরে কাক খারাপ চোখগুলো নিয়ে যা, ভালো চোখ খুঁজে দিয়ে যা)

www.pathagar.com

১৯
ই'ম মাইচু, ই'ম মইচু,
ই'ম তৈ তিলক, ই'ম দা, ই'ম হলং
চেকের চেকের চেকের
থৈ থাক গ্রৈ গ্রাক
আনি মাইচু লে?
তকখা তিলাংজাক
অ তকখা আনি মাইচু র র র র....... ॥

শিশুদের হাসানোর জন্য কাতুকুতু দেওয়া হয় এভাবে-
এটা ভাতের মোচা
এটা তরকারির মোচা (করে শিশুর আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে পাতায় মোচা বাঁধার মতো করা হয়)
এটা পানি ভরা লাউ
এটা দা, এটা দা শান দেওয়ার পাথর (হাতের পাতার পিঠে লাউ, দা আর পাথর রাখার মতো কায়দা করা হয়)
দাটা শান দিচ্ছি শান দিচ্ছি (হাতের উপর শান দেওয়ার মতো করা হয়)
এখন জুম করার জন্য জঙ্গল কাটছি (হাতের উপর জঙ্গল কাটার মতো করা হয়)
অ্যাঁ আমার ভাতের মোচা কই?!
তারপর ভাতের মোচা খোঁজার ভান করে হাতের উপর কাতুকুতু দিতে দিতে বগলের দিকে কাতুকুতু দেওয়া হয়-
আমার ভাতের মোচা কই
ভাতের মোচাই কই
ওরে আমার ভাতের মোচা দিয়ে যা.. দিয়ে যা.. --------

মারমা ঘুম পাড়ানি ছড়াগান

১
ও-ও-ও ইমো
ইলেমা য়াং-য়াং-ই য়াং-য়াং
সাহ্লাহ লওযি খ্যককং ফুওয়ি
সঃ মিঃ হ্লা সওয়ি খ্যককং ফুওয়ি
ম্রি হ্লা সওয়ি খ্যককং ফুওয়ি
খ্যকফুওয়ে ইমি য়েং রুইওয়ামা ফ্যহ্স্যিমে
ইলে য়াং- য়াং য়েং রুইওয়ামা ই-য়াং- য়াং

www.pathagar.com

ঘুমাচ্ছ তুমি দোল দোল দোল
সুন্দর আদুরে ছেলেটি
সুন্দর আদুরে মেয়েটি
নাতী/নাতনী সুন্দর আদুরে
আদরের মানুষ ঘুমাবে
দোলনায় দেবো দুলিয়ে
ঘুমানো মানুষ দোলনায় দোলে

মারমা ঘুম পাড়ানি গান
২
দ:দ: (মেয়ে) বাবা (ছেলে) মি: মি: (নাতনী) মং মং (নাতী)
উইতে পাখা হরিব সুইমে মওমে মওতোই তিন্নওয়িং
দ:দ:/বাবা/মি:মি:/মংমং উইতে ই-য়াং য়াং-য়াং
য়াং-য়াং-য়াং-য়াং-য়াং

কান্না করোনা দোলনা দুলিয়ে দিচ্ছি
দোল দোল দোল দোল দোল

তথ্যনির্দেশ

১. প্রীতিমা চাকমা (বয়স ৫৩), চাকুরিজীবি ও সংস্কৃতিকর্মী, মিলনপুর, খাগড়াছড়ি
২. স্বর্ণ রাণী চাকমা (বয়স ৫৫), গৃহিণী, মিলনপুর, খাগড়াছড়ি
৩. দীপন চাকমা (বয়স ৩৭), চাকুরীজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী, মিলনপুর খাগড়াছড়ি
৪. প্রভাংশু ত্রিপুরা, গবেষক ও লেখক, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি
৫. সুরজিত নারায়ন ত্রিপুরা, গবেষক ও লেখক, সন্নুইস গেইট এলাকা, খাগড়াছড়ি
৬. দূর্গাচরণ ত্রিপুরা, পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি
৭. তথ্য দাতাঃ ম্রাসাং মারমা (বয়স ৪৮), গর্জন টিলা পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি। হজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (বয়স ৬২), অচাই, বিনয় কার্বারী পাড়া, খাগড়াছড়ি
৮. তথ্যদাতাঃ ছ মোহন ত্রিপুরা (বয়স ৮৬), জোরমরম, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিল্পের প্রতিফলন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রতীয়মান। সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে শিল্পের ছাপ লক্ষ করা যায়। জন্ম, বিবাহ, শেষকৃত্যানুষ্ঠানসহ আমোদ-প্রমোদে শিল্পের ছাপ পাওয়া যায়। বাঁশ, বেত, গাছ, সুতা, পাখির পালক, নখ, জীব-জন্তুর শিং, হাড় ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসী জীবনে শিল্পের প্রতিফলন ঘটেছে।

কারুশিল্প

পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠিগুলোর বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বড় উপাদান বাঁশ। সাংসারিক ও সামাজিক কাজে বাঁশের বিকল্প নেই তাদের। সাংসারিক প্রায় সব উপকরণই বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি করা। অগণিত উপকরণের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি গার্হস্থ্য জিনিস পত্রাদির বিবরণ দেওয়া হলো। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির লোকেরা প্রায় অনেকেই বাঁশ ও বেতের কাজে পারদর্শী। কারণ তাদের মধ্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের চেয়ে সাংসারিক প্রয়োজনটাই বেশি।

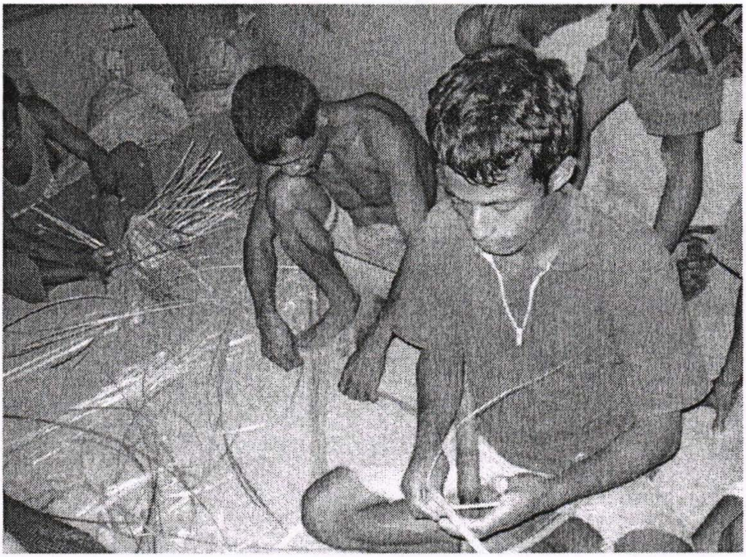

www.pathagar.com

কাবাং (হাল্লোং): জুম থেকে ধান বহন করার প্রধান যে জিনিস তা হচ্ছে ত্রিপুরা ভাষায় কাবাং, চাকমা ভাষায় কাল্লোং বা হাল্লোং। আবার সেই ধান স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষনের জন্যও কাবাং ব্যবহার করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে বর পক্ষ বিবাহ সামগ্রী (গহনা, বৌয়ের জন্য কাপড়চোপড়, প্রসাধনীসামগ্রী, পিঠা ইত্যাদি) কনে পক্ষের বাড়ীতে নিয়ে যায় কাবাং এর মাধ্যমে। জুমের সকল প্রকার উৎপাদিত পণ্যই কাবাং দিয়ে বহন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন পূজা পার্বণের উপাচারও কিন্তু কাবাং দিয়ে বহন করা হয়। কাবাং বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে সাইজের পরিমাপও ভিন্ন হয়ে থাকে। আর কাবাং তৈরি হয় বাঁশের বেত দিয়ে। তবে বর্তমানে প্লাস্টিকের একধরনের বেত দিয়েও এসব কিছু নিজিস তৈরি করাতে দেখা গেছে। কাবাং বুননে এক শৈল্পিক নকশা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই শৈল্পিক কারুকার্য কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও বহন করে। একজন কাবাং বুননশিল্পি তার আভিজাত্যের পরিচয় দেয় তাঁর বুনন কারুকাজের মধ্য দিয়ে। এ কাবাংকে ত্রিপুরাদের ভিন্ন গোত্রের মানুষ আবার ভিন্ন ভিন্ন নামেও উল্লেখ করে থাকে, যেমন নখাই।

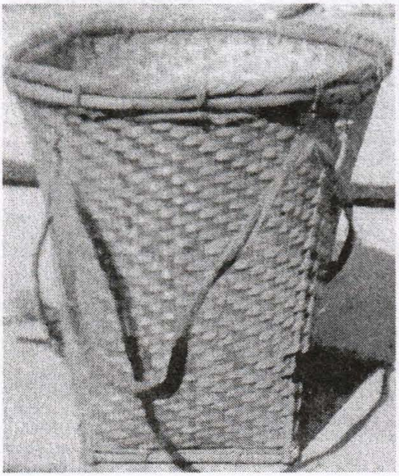

কাবাং / হাল্লোং

কাবাং বা কাল্লোং পিঠে ত্রিপুরা রমনী

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আদিবাসী পাহাড়ি জীবনে বাঁশের তৈরি ব্যবহৃত কিছু গৃহস্থালি সামগ্রী নিচে উপস্থাপন করা হলো-

খাংগ্রা/ হারাং

এটিও একপ্রকার কাবাং এর মত, তবে এর বুনন একটু ব্যতিক্রম আছে- যেমন কাবাং এর ক্ষেত্রে অবশ্যই খুব ঘন করে বুনন করতে হয় কিন্তু খাংগ্রা এর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। খাংগ্রার বুনন হয় ফাঁকা ফাঁকা। সচরাচর লাকড়ি বা তরিতরকারি খোঁজা ও

www.pathagar.com

বহনের জন্য খাংগ্রা ব্যবহার করা হয়। খাংগ্রা অনেক হাল্কা হয়। খাংগ্রাকেও ত্রিপুরাদের ভিন্ন গোত্রের মানুষ ভিন্ন নামে উল্লেখ করে যেমন তেসেং। অন্যদিকে চাকমা ভাষায় এটিকে 'হারাং' বলে।

বাইলেং/ কুলো

ত্রিপুরা ভাষায় বাইলেং এবং চাকমা ভাষায় কুলো বলা হয় বস্তুটিকে। চাকমা ও ত্রিপুরাদের ব্যবহৃত কুলা গোলাকৃতির হয়ে থাকে। এটি মজবুত বুননে একধরনের কারুকার্যময় শিল্প। ধান ও চাউল ঝাড়ার কাজ ছাড়াও গৃহস্থালি নানা কাজে এই কুলো ব্যবহৃত হয়।

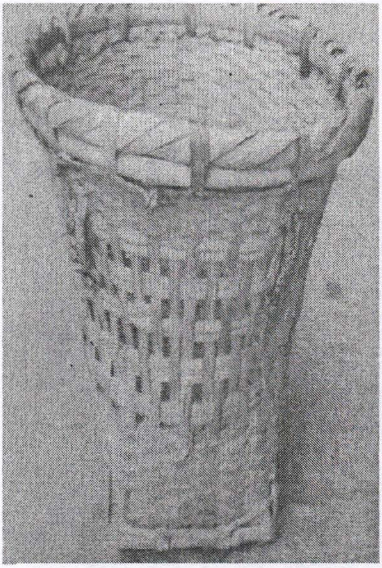
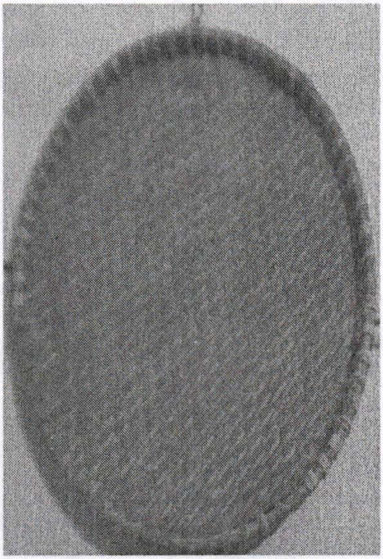

খাংগ্রা/হারাং বাইলেং/কুলো

তন/ আড়ি

আড়ি বা তন একটি পরিমাপক ঝুড়ি। বেতের বা কাঠের উভয় উপাদানে আড়ি তৈরি হয়। ত্রিপুরারা এটিকে তন বলে, চাকমারা আড়ি বলে। এটি মূলত ১৬ সের ওজন মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওজনের এই পরিমাণ অনেক সময় এলাকাভেদে আলাদা হয়। অনেক এলাকায় ১৪ সেরে এক আড়ি বা এক তনও ধরা হয়।

লাই/ লেই

বেতের তৈরি ঝুড়ি বিশেষ। ধান বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এটিকে ত্রিপুরা ভাষায় 'লাই' এবং চাকমা ভাষায় 'লেই' বলা হয়।

www.pathagar.com

তাখৌ/ হুরো হাজা

বেতের তৈরি বাচ্চাসহ মুরগী রাখার পিরামিড আকৃতির ঝুড়ি বিশেষ। ত্রিপুরাদের ভাষা ককবরকে এটিকে 'তাখৌ' বলা হয় আর চাকমা ভাষায় 'হুরো হাজা' বলা হয়।

বাংবু/ দুব

ছোট ছোট নালায় মাছ ধরার জন্য বেতের তৈরি এই ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে উভয়মুখী স্রোতের মাছ ধরা যায়। ত্রিপুরা ভাষায় এটিকে 'বাংবু' বলে এবং চাকমা ভাষায় 'দুব' বলে।

লুসি/ লুই

ত্রিভুজাকৃতির বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি মাছ ধরার যন্ত্রবিশেষ। চাকমা ভাষায় এটিকে 'লুই' বলা হয় এবং ত্রিপুরা ভাষায় 'লুসি'।

দুক/ জালি দুব

বেতের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ। এর মাধ্যমে কাঁকড়া ও কুইচ্যা মাছ ধরা হয়। এটিকে ত্রিপুরা ভাষায় 'দুক' বলে আর চাকমা ভাষায় বলা হয় 'জালি দুব'।

চখি/ চরগা

তুলা থেকে সুতা তৈরির জন্য কাঠের তৈরি যন্ত্র বিশেষ। এটি মূলত তুলার বীজ ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে যান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে এর চল অনেক কমে গেছে। এটিকে ত্রিপুরা ভাষায় 'চখি' বলা হয় আর চাকমা ভাষায় 'চরগা' বলা হয়।

পখাই/ পাক্কোন

বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি ত্রিভুজাকৃতির এক ধরনের ছাঁকনী বিশেষ। সাধারণত ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী চাখৈ বা ক্ষারি তরকারি রান্নার জন্য ছাই ছাঁকার কাজে ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যবাহী মদ চুয়ানির কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরারা এটিকে 'পখাই' বলে আর চাকমা 'পাক্কোন' বলে।

চখা/ চরগি

তুলা থেকে সুতা তৈরির জন্য কাঠের তৈরি যন্ত্র বিশেষ। এর মাধ্যমে তুলা থেকে সুতা কাটা হয়। বর্তমানে এর প্রচলন একেবারে নেই বললে চলে। এটিকে ত্রিপুরারা 'চখা' বলে আর চাকমারা 'চরগি' বলে।

গন্দি/ গোন্দি

কাঠের তৈরি গরু মহিষের ঘন্টি বিশেষ। ত্রিপুরারা এটিকে 'গন্দি' বলে আর চাকমারা 'গোন্দি' বলে। এই ঘন্টি বাঁশ দিয়েও বানানো হয়।

www.pathagar.com

চেমাই

এটিও বেতের তৈরি একপ্রকার ছোট কাবাং। এটি সাধারণত কম জিনিস বহন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে ত্রিপুরা কিশোরীরা জুমে বা পাহাড়ে কাজে গেলে চেমাই নিয়ে যায় এবং ছোটখাটো শাক সব্জি নিয়ে আসে।

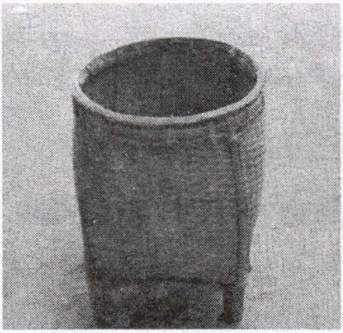

তন/আড়ি লাই/লেই

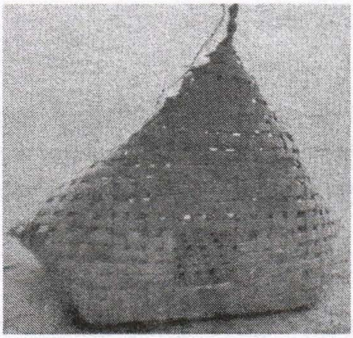
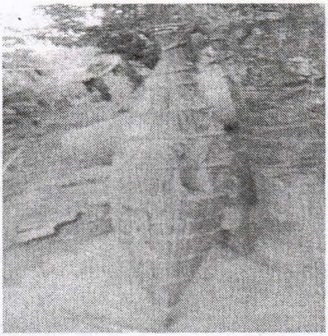

তাখৌ/হুরো হাজা বাংবু/দুব

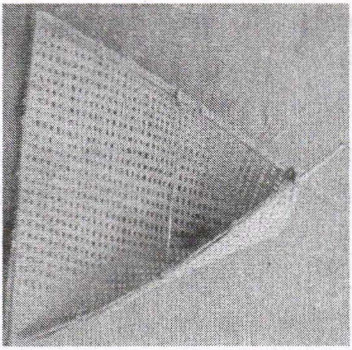
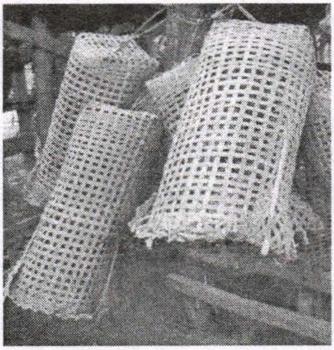

লুসি/লুই দুক/জালি দুব

www.pathagar.com

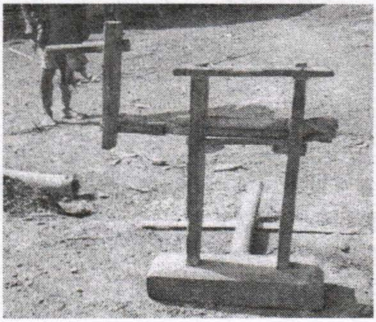

চখি/চরগা

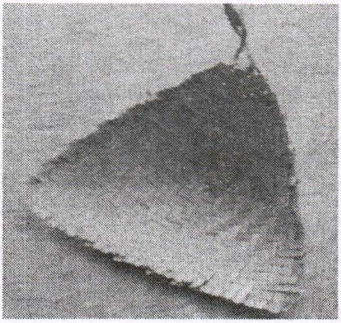

পখাই/পাক্কোন

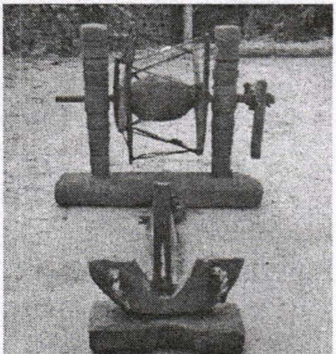

চখা/চরগি

গন্দি/গোন্দি

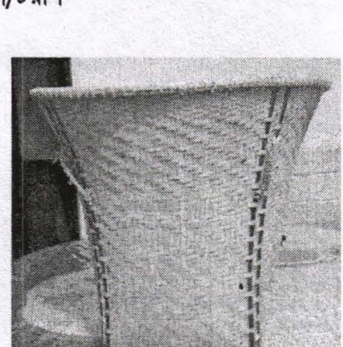

চেমাই

www.pathagar.com

বুমথু

বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি এটি বস্তু। মাটির কলসি বা ঘটি জাতীয় জিনিসের ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মাইচাম/ মেজাং

বেতের তৈরি এক ধরনের ঝুড়ি বিশেষ। বয়োজ্যেষ্ঠরা সাধারণত মাইচামের উপরে থালা রেখে ভাত খেয়ে থাকে। এটি বিভিন্ন নানা সামাজিক পার্বণ ও ক্রিয়ায়ও ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরারা এটিকে 'মাইচাম' বলে আর চাকমারা 'মেজাং' বলে।

য়াম/ তলুই

বেতের তৈরি পাতি বিশেষ, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় এটিকে তলুই বলে। ধান ও অন্যান্য শস্যদানা শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বিছিয়ে ঘুমানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়। ত্রিপুরারা এটিকে 'য়াম' বলে, চাকমারা 'তলুই' বলে।

কাইসিলিং/ হুরুম

বাঁশ ও বেত দ্বারা তৈরি ছোট জুড়ি বিশেষ। ত্রিপুরা ভাষায় এটিকে কাইসিলিং বলে আর চাকমা ভাষায় বলে হুরুম। এটি আকারে খুবই ছোট। জুমে ধান লাগানোর সময় ধানের বীজ বহনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কোমরের সাথে বেঁধে এতে ধান রাখা হয় এবং এর থেকে মুঠিতে ধান নিয়ে জুমে বপন করা হয়।

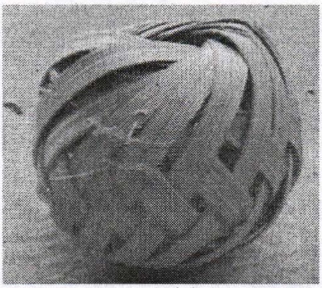

বুমথু

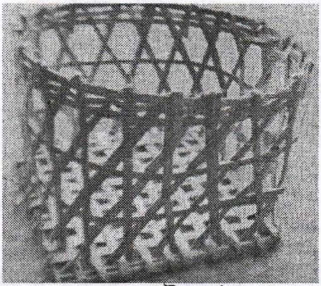

মাইচাম/ মেজাং

য়াম/ তলুই

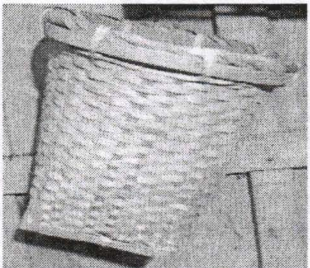

কাইসিলিং/হুরুম

www.pathagar.com

মুং/ বারেং

এটি বড় আকৃতির কাবাং বিশেষ। ত্রিপুরারা এটিকে মুং বলে, চাকমারা বলে বারেং। এটি কাবাং বা হাল্লোং-এর মতো হলেও আকারে অনেক বড়। হাল্লোং দিয়ে বহন করে শস্য বা বীজ এই বারেঙে বা মুঙে রাখা হয়। এতে ৮০ থেকে ১২০ আড়ি পর্যন্ত ধান সংরক্ষণ করা যায়। আদি উপায়ে ধান মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও এই মুং বা বারেং ব্যবহার করা হয়।

দাংগাই/ পিয়োং

শূকরের খাবার দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত গাছের তৈরি ছোট আকারের ডিংগা বিশেষ। ত্রিপুরারা এটিকে 'দাংগাই' বলে আর চাকমারা বলে 'পিয়োং'।

মুং/ বারেং

দাংগাই/ পিয়োং

হক্কেরেং/ দ-ল

হাল্লোং এর চেয়ে এর মুখের আকার বড়ো। চাকমারা এটিকে হক্কেরেং বলে, ত্রিপুরার বলে 'দ-ল'। তিল, তুলা, হলুদ, আদা ইত্যাদি শস্য সংগ্রহের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

চাই

এটি বেতের তৈরি পাটির মত এক প্রকার জিনিস। জুমের ধান মারাই করার সময় চাই ব্যবহৃত হয় 'মুং' বা 'বারেং'-এর সাথে।

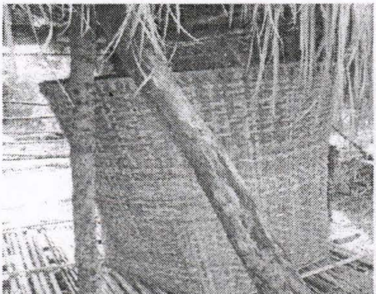

হাক্কেরেং/ দ-ল

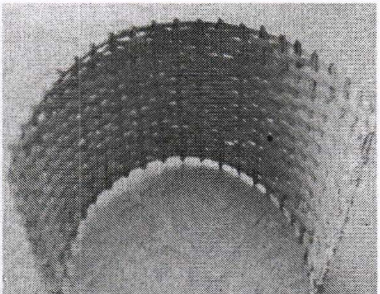

চাই

www.pathagar.com

ফুলবারেঙ/ খুক্রুক

হাল্লোং আকারের একটি ঝুড়ি বিশেষ হলেও এটি কারুকার্যখচিত একটি বিশেষ ঝুড়ি। চাকমারা এটিকে 'ফুলবারেঙ' বলে, ত্রিপুরারা বলে 'খুক্রুক'। পুরনো দিনে এই বিশেষ ঝুড়িতে পরিবারের নারীদের সবচেয়ে দামী অলংকার ও কাপড়চোপর রাখা হতো। তাই কথায় বলা হয়, এই ঝুড়িটি যতো পুরনো হবে, ততোই তার দাম বাড়ে। কারণ, দিন গড়িয়ে যাওয়ার সাথে স্বর্ণ- রৌপ্য অলংকারের বহরও বাড়তে থাকে। অন্যান্য সকল ঝুড়ির সাথে এর পার্থক্য হলো এতে বিশেষ কায়দায় তৈরি একটি ঢাকনা থাকে।

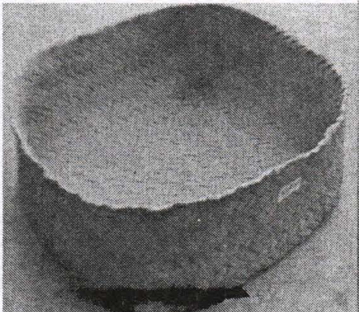

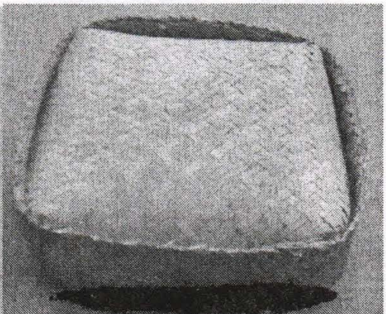

www.pathagar.com

ওয়াখাতুং

শূকরের খাবার দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি একটি পাত্র বিশেষ। এর তলানিটা এমনভাবে তৌরী করা হয়, যাতে পানি ধারণ করে রাখতে পারে।

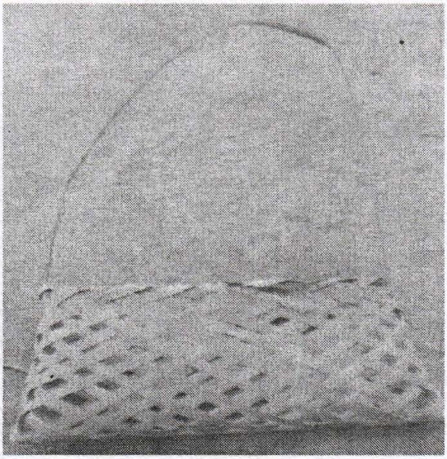

চপ্রাঃ বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি ঝুড়ি বিশেষ। নানা ছোটখাটো গৃহস্থালী প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি রাখার পাশাপাশি পাখি শিকারীদের মাটির গুলি নেওয়ার ব্যাগ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

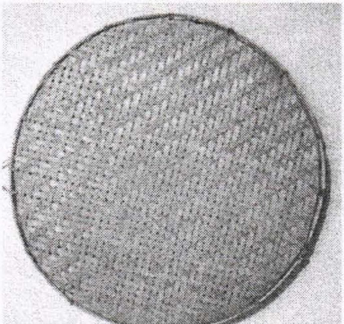

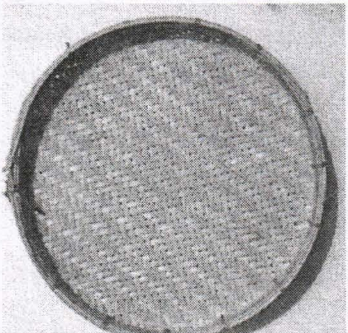

চালনিঃ চাউল জাতীয় দানা পরিষ্কার করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি চালুনি বিশেষ।

www.pathagar.com

সুতা দিয়ে তৈরি শিল্প ও ব্যবহার্য সামগ্রী

কিসিপ/বিজোন: বাঁশের বেত ও কাপড়ের সমন্বয়ে তৈরি হাত পাখা। এতে সুন্দর সুন্দর ফুলের নক্‌শা করা হয়। অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকারা এই ধরনের হাতপাখায় নানা ফুল ও নকশা তুলে তাদের প্রেমের বার্তা প্রিয়জনকে পাঠায়। ত্রিপুরারা এই পাখাকে 'কিসিপ' বলে আর চাকমারা 'বিজোন' বলে।

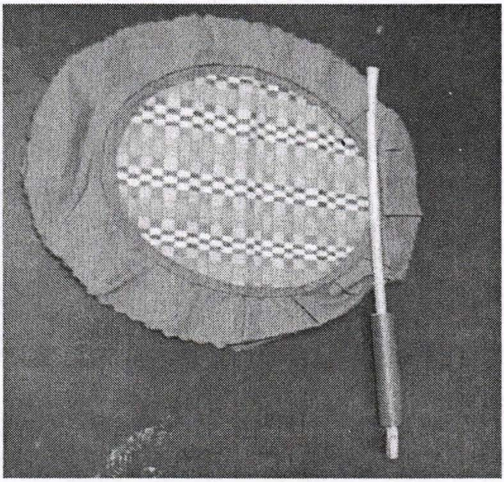

তথ্যনির্দেশ

১. শশীভূষণ ত্রিপুরা (বয়স ৫০), জোরমরম হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়ি
২. চাকতে ত্রিপুরা (বয়স ৩৮), জোরমরম হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়ি
৩. বিদ্যুৎ জ্যোতি চাকমা (বয়স ৪১), সংস্কৃতিকর্মী ও চাকমা ভাষা বিশেষজ্ঞ, মধুপুর, খাগড়াছড়ি
৪. প্রবীর ভুষন দেওয়ান (বয়স ৫৫), বোয়ালখালি, দীঘিনালা
৫. রিপন চাকমা (বয়স ৩৬), উন্নয়নকর্মী, খাগড়াছড়ি
৬. সুযশ চাকমা (বয়স ৩৫), উন্নয়ন কর্মী, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ক. লোকপোশাক

কোমর তাঁতে কাপড় বুনন

পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন জুম চাষ সমৃদ্ধ ও লাভজনক ছিল তখন নারী-পুরুষ উভয়ই নিজস্ব উৎপাদিত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। কালের পরিক্রমায় জুমচাষ কমে আসায় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উৎপাদন না হওয়ায় সর্বোপরি দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি ও বর্হিবিশ্বের সংস্কৃতির প্রভাবে আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে ভাটা পড়ে যায়।

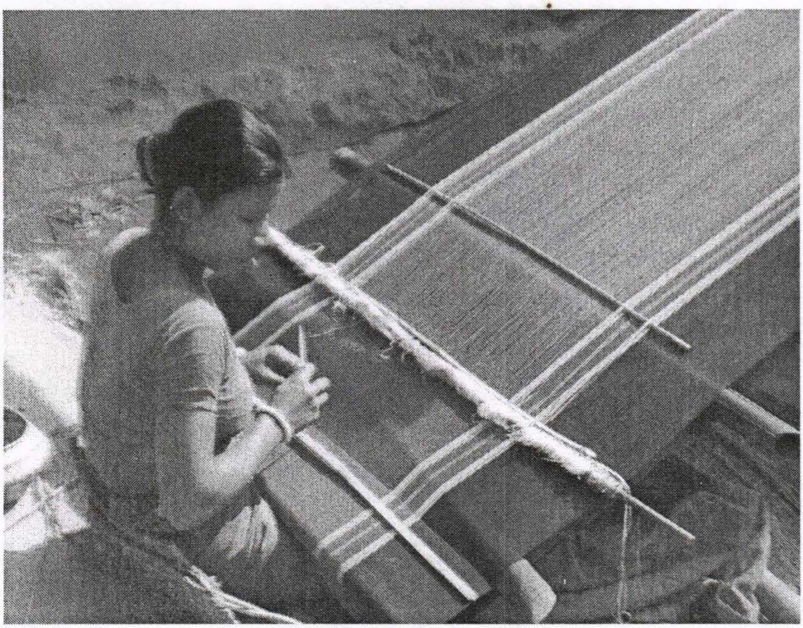

পুরুষের পোশাকে অধিকাংশ অন্য সংস্কৃতি প্রভাব ফেললেও নারীর পোশাকে এখনো পুরোপুরি প্রভাব ফেলতে পারে নি। শহরকেন্দ্রিক আদিবাসী নারীরা প্রায় সময় সেলোয়ার কামিজ, শাড়ী ব্যবহার করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে এখনো পুরোপুরি নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহার করছে আদিবাসী নারীরা।

www.pathagar.com

রোদে শুকোতে দেওয়া রঙিন সুতো

আদিবাসী নারীদের মূলত তিন প্রকার পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন- দেহের নিম্নাংশের জন্য রিনাই বা পিনোন, উর্ধ্বাংশের জন্য রিসা বা হাদি এবং কুবাই বা ব্লাউজ। রিসা বা হাদি কয়েক ধরনের দেখা যায়- বক্ষ বন্ধনি জাতীয়, ওড়না জাতীয় আর শিরস্ত্রাণ জাতীয়।

ত্রিপুরাদের পোশাক

ত্রিপুরা নারীদের রিসায় কমপক্ষে ৩০-৪০ ধরনের বুমুল (ফুল বা নক্‌শা) ব্যবহার করা হয়। এ নক্‌শাও আবার সুতার সংখ্যা অনুযায়ী ১০-১২ টি ভাগে বিভক্ত। যেমন- ১৬ টি সুতা বিশিষ্ট নক্‌শা বা ফুলকে ১৬ না, ৩ টি সুতা বিশিষ্ট নক্‌শাকে নাথাম বলা হয়।

নিজস্ব পোশাকে ত্রিপুরা যুবক-যুবতী

www.pathagar.com

এরূপ নক্‌শা দেখা যায়- ১৬ সুতা বিশিষ্ট, ৭ সুতা বিশিষ্ট, ১০ সুতা বিশিষ্ট, ৪ সুতা বিশিষ্ট, ২ সুতা বিশিষ্ট, ৫ সুতা বিশিষ্ট, ১২ সুতা বিশিষ্ট, ১৮ সুতা বিশিষ্ট ইত্যাদি। নক্‌শা গাইডে পাওয়া উদ্ধারকৃত কয়েকটি নক্‌শার নাম নিম্নে দেওয়া হল:

১.থাইপ্ল ববার (চালতা ফুল), এটি ১৬ সুতা বিশিষ্ট।
২. মচর ববার (মরিচ ফুল)
৩. ফেনক ববার (বেগুন ফুল)
৪. রাইচৌক রাই (বেতের পাতা)
৫. রাংচাক সুর (স্বর্ণের সারি)
৬. তকসা মকল (পক্ষি চক্ষু)
৭. রাইসু (বেতের নক্‌শা)
৮. সাকমু খিতুং (শামুক লেজ)
৯. খাংগ্রাই (কাঁকড়া)
১০. তক্‌খুম তৈ (হাঁস ডিম)
১১. আমিং য়াপাই (বিড়ালের পদচিহ্ন)
১২. খুনতাই বা (খুনতাই ফুল)
১৩. খারিসি সিবাংগি
১৪. চিনি সিবাংগি/ ত্রিপুরা সিবাংগি
১৫. নাথাম (তিন সুতা)
১৬. য়োংসা (পতঙ্গ)
১৭. রাজ মুকুট (রাজার মুকুট)
১৮. য়েতাম চৌ (আংটি চূড়া)
১৯. বাতি বৈঠাক (খুপির পা)
২০. খিরা বুমু (খরার নক্‌শা)
২১. বফাং বস্নাই (গাছের পাতা)
২২. বাতা ববার (কাঁশ ফুল)
২৩. মাইতাংসা (ধানের শীষ)
২৪. তকখুম য়াপাই (হাঁসের পা)
২৫. বৈঁং / বেং নক (মাকড়শা জাল)
২৬. খুলফাং (তুলা গাছ)
২৭. হানদুকগিরি (তারা/ নক্ষত্র)
২৮. তক্‌থুলু (ঘুঘু)
২৯. ওয়াউমু
৩০. মরা (মোড়া)
৩১. দেনদক য়োংসা
৩২. দৌক (কাঁকড়া ধরার ফাঁদ)
৩৩. আয়না দৌক গ্লাং (আয়নার রশি)

www.pathagar.com

চাকমাদের পোশাক

চাকমা নারীরা নিজস্ব বয়ন পদ্ধতিতে কাপড় বুনেন। পুরুষরা আগে মালকোচা দিয়ে ধুতি পরতেন, গায়ে নিজস্ব বয়নে তৈরি সিলুম (শার্ট) ব্যবহার করতেন এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। পুরুষরা হাতে তৈরি গামছাও পরতেন। এখন কালের বিবর্তনে পুরুষদের পোশাকে এসেছে বহু পরিবর্তন। চাকমা পুরুষরা এখন প্যান্ট-শার্ট, ধুতি, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান করেন।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে চাকমা তরুণী

চাকমা নারীদের পোশাকে রয়েছে অপরূপ বৈচিত্র্য। চাকমা নারীদের পরিধানগুলোর বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

১. **পিনন:** চাকমা নারীরা কোমর হতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত কোমর তাঁতে তৈরি পিনন পরিধান করেন।
২. **কবই:** চাকমা নারীদের ব্লাউজও হাতে কাটা সুতা দিয়ে তৈরি হতো।
৩. **খাদি:** চাকমা নারীরা বক্ষবন্ধনি হিসেবে বুকে খাদি ব্যবহার করেন।
৪. **খবং:** চাকমা নারীরা মাথায় বাঁধার জন্য এক ধরনের কাপড় ব্যবহার করেন, যা খবং নামে পরিচিত।
৫. **ফারত দড়ি:** কর্মজীবি চাকমা নারীরা কোমরবন্ধনি হিসেবে ফারত দড়ি ব্যবহার করেন।

মারমাদের পোশাক

মারমারা নিজস্ব পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করেন। তবে তাদের পোশাকপরিচ্ছদে বার্মীজ প্রভাব লক্ষণীয়। মারমাদের পোশাকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির পরিচিতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

www.pathagar.com

লংগী: মারমা পুরুষদের ব্যবহৃত পোশাককে লংগী বলে। মারমা পুরুষরা নিজস্ব পদ্ধতিতে শার্টকে ভিতরে গুঁজে লংগী পরিধান করেন।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মারমা তরুণ-তরুণী

খবুইং: মারমা নারীদের ব্যবহৃত পরিধেয়কে খবুইং বলে। নানা কারুকার্য খসিত মারমা নারীদের এই বিশেষ পোশাক খুবই বর্ণিল। মারমা নারীরা নিজস্ব রুচি অনুসারে তাঁদের খবুইং বেছে নেন।

রাংজি বা আংগী: মারমাদের ব্যবহৃত শার্টকে রাংজি বা আংগী বলা হয়। মারমা পুরুষরা সাধারণত লংগীর ভিতরে গুঁজে নিয়ে শার্ট পরিধান করেন।

গভং বা খংবং: মারমা নারীদের মাথার পাগড়ি জাতীয় কাপড় বা শিরস্ত্রাণকে গভং বা খংবং বলা হয়।

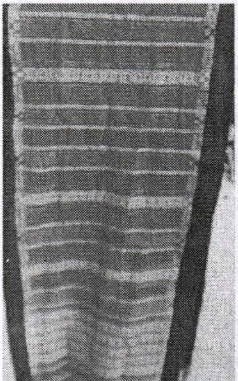

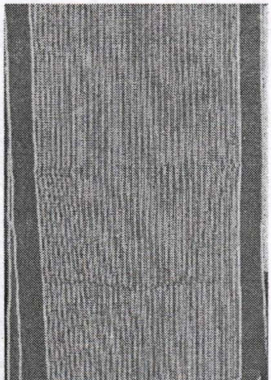

www.pathagar.com

রিসা/ হাদি: কাপড়ের তৈরি ওড়না বিশেষ, যাতে ত্রিশ প্রকারের অধিক নক্‌শা ব্যবহার করা হয়। ত্রিপুরারা এটিকে 'রিসা' বলে আর চাকমারা 'হাদি' বলে। নারীদের বক্ষবন্ধনী, শিরস্ত্রাণ, ওড়না ইত্যাদি হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা হয়। পূজা-পার্বন, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহৃত হয়।

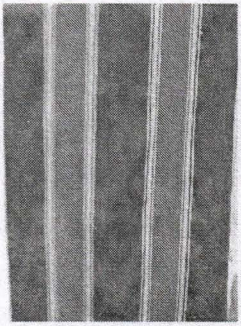

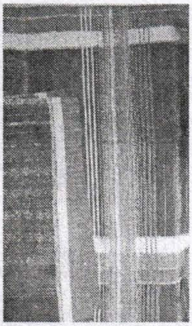

রিনাই/ পিনোন: রিনাই বুনা হয় নানা ধরনের নক্‌শায়। একেকজন একেক ধরনের নক্‌শা ও ফুল দিয়ে রিনাই বুনে থাকে। চাকমা ভাষায় এটিকে 'পিনোন' বলা হয়।

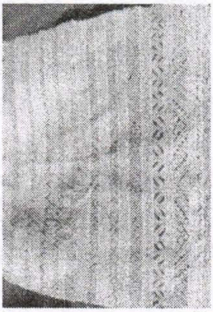

আতাং/ আলাম: এটি একটি নক্‌শা গাইড। নারীদের বুননকাজে এটি অভিধানের মতো কাজ করে। এই কাপড়ে সংরক্ষিত নকশার নির্দেশনা অনুসরণ করে রিনাই (পিনোন), রিসা (হাদি) ইত্যাদির নকশা বুনন করা হয়। এটিকে ত্রিপুরারা 'আতাং' বলে আর চাকমারা 'আলাম' বলে।

কুতুক রি: হাতে তৈরি পুরুষদের ব্যবহৃত মাফলার।

www.pathagar.com

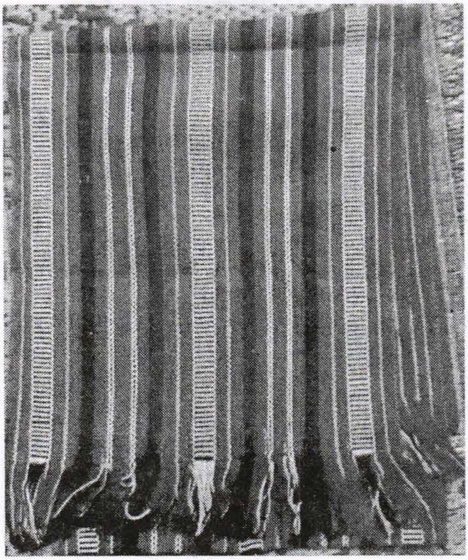

রিত্রাক/ বোরগি: রঙিন সূতোয় তৈরি চাদর। চাকমারা 'বোরগি' বলে আর ত্রিপুরারা বলে 'রিত্রাক', গোত্রভেদে 'বিকি'।

বিরক রি বরক: হাতে তৈরি নারীদের জামা।

www.pathagar.com

চারক রি বরক: হাতে তৈরি পুরুষদের কটি বা জামা।

বিরক মারসা: হাতে তৈরি নারীদের ব্যবহৃত ব্যাগ

খ. অলংকার

আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের অলংকার ব্যবহার বিষয়ে রয়েছে নানা লোকশ্রুতি। কথিত আছে, কোনো এক সময় কুকিরা ত্রিপুরা গ্রামগুলোতে হানা দিয়ে মানুষ হত্যা করতো। এই হত্যাকান্ডে ত্রিপুরা নারীরা বেঁচে যেত তাদের পরিহিত অলংকারের কারণে। গলায় এতই অলংকার থাকতো যে, দা দিয়ে কুপিয়ে কোনো রকম ঘা করতে পারতো না।

www.pathagar.com

অলংকার ব্যবহারে পাহাড়ি নারীরা সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে শহুরে সমাজে আগেকার দিনের অলংকার ব্যবহার হ্রাস পেলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে এখনো অলংকার দেখা মেলে। এখন আধুনিক নানা অলংকার ও বাহারি ইমিটেশনের ভিড়ে পাহাড়ি নারীদের ঐতিহ্যবাহী অলংকারগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে।

ত্রিপুরা নারীরা যে সমস্ত অলংকার বা গহনা ব্যবহার করে বা করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অলংকার বা গহনা হলো- তয়া (কানের দুল), নাফু/ জলফু (নাক ফুল), তাল বাতাং (চন্দ্র হার), ওয়াখুম (কানের দুল), রামতাং (রৌপ্যমুদ্রার হার), নাচাইং, লক্ (মালা), কালসি, বাংগ্রি বাই, বালা, মায়ুং বুয়ানি বাংগ্রি (হাতির দাঁতের চুড়ি), রুফাইনি চানদৌক (রুপার টাগি), বাইয়ু, ত্র/ তর/ ট্র, নুপুর, তাল (চন্দ্র), সাংগে (চুলের কাঁটা), য়েতাম, মারকুনি লক (মারকু দানার মালা) ইত্যাদি।

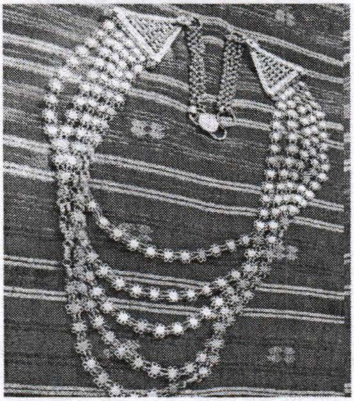

আদিবাসী নারীদের ব্যবহৃত অলংকার চন্দ্রহার

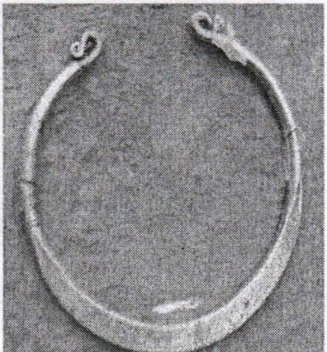

আঁচিলি/ আজুলি: রূপার তৈরি গলায় পরিধানের অলংকার। ত্রিপুরারা এটিকে 'আঁচিলি' বলে আর চাকমারা 'আজুলি' বলে।

www.pathagar.com

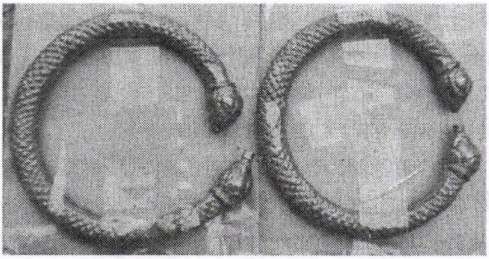

বেংকি/ থেঙ হারুঃ রূপার তৈরি পায়ে পরিধানের অলংকার। ত্রিপুরারা এটিকে 'বেংকি' বলে আর চাকমারা 'থেঙ হারু' বলে।

তালবাতাং বা চন্দ্রহার ও কানের দুল পরিহিত ত্রিপুরা নারী

রাংবাতাং বা টেঙাছড়া (রৌপ্যমুদ্রার মালা), কানের দুল ও মাথায় রিসা পরিহিত ত্রিপুরা নারী

চাকমা নারীরা বাহারি নানা অলংকার ব্যবহার করেন। অলংকার চাকমা নারীদের সম্পদের অংশ। চাকমা অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে গেলে এখনও নানা অলংকার চোখে পড়ে। চাকমা নারীদের ব্যবহৃত কিছু অলংকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কজফুল,

www.pathagar.com

কানফুল, নাকফুল, ঝুমুলি বা ঝম্বলি, তাজ্জুর, রাজ্জুর, বাগু, বালা, চুড়ি, নুপুর, টেঙাছড়া, পিজিছড়া, হারু, সোনানগ, চন্দ্রহার, কুচী, কঙ্কণ, রসিকবালা, আংটি, চরণমল ইত্যাদি।

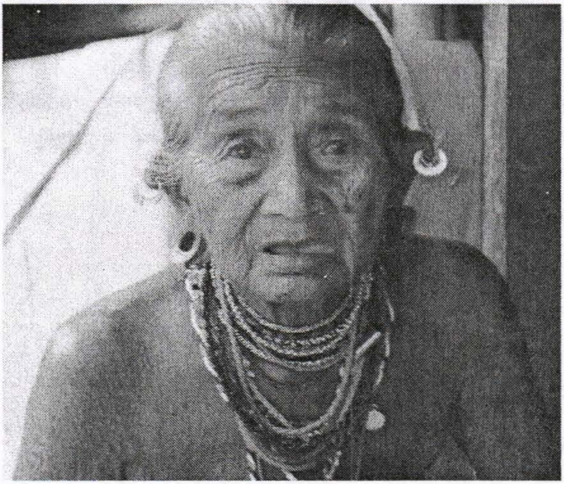

ঐতিহ্যবাহী অলংকার পরিহিত ত্রিপুরা নারী

পাহাড়ি আদিবাসীদের মধ্যে মারমা নারীরা প্রচুর পরিমাণের অলংকার মজুদ করলেও ব্যবহার করেন খুবই কম। মারমা নারীদের বহুল ব্যবহৃত অলংকারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ছাইং বোয়ং (চুলের দুল), ছাইং, গেইঃ, নখং বোয়ং (নাকের ফুল), নাবোয়ং (কানের দোল), হ্রুই নবোয়ং (সোনার দোল), মুইং নবোয়ং (রূপার দোল), হ্রুই গ্রো (গলার সোনার হার), মুইং গ্রো (রূপার ঐ), নাফ কঃ (বালা), কখ্যাং (পায়ের খাড়ু), অজাসি (একধরনের সোনার হার বিশেষ), পদিঃ (পুঁতির মালা), খমংসি (রূপার বিশেষ ধরনের কানের দুল) ইত্যাদি।

তথ্যনির্দেশ

১. বিদ্যুৎ জ্যোতি চাকমা (বয়স ৪১), সংস্কৃতিকর্মী ও চাকমা ভাষা বিশেষজ্ঞ, মধুপুর, খাগড়াছড়ি

২. লোক জ্যোতি চাকমা (বয়স ৪২), সংস্কৃতিকর্মী ও চাকমা ভাষা বিশেষজ্ঞ, মহাজনপাড়া, খাগড়াছড়ি

৩. চাকতে ত্রিপুরা (বয়স ৩৮), জোরমরম হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়ি

৪. স্যুইচিং অং মারমা (বয়স ৪৩), কালাডেবা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

৫. মানুপ্রু চৌধুরী (বয়স ৪৩), কালাডেবা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি
৬. রিপন চাকমা (বয়স ৩৬), উন্নয়নকর্মী, খাগড়াছড়ি
৭. সুযশ চাকমা (বয়স ৩৫), উন্নয়ন কর্মী, খাগড়াছড়ি
৮. মনপ্রিয়া ত্রিপুরা (বয়স ৪৭), হাদুকপাড়া, খাগড়াছড়ি
৯. আরেমা মারমা (বয়স ২৯), রামগড়, খাগড়াছড়ি
১০. কৃত্তিকা ত্রিপুরা (বয়স ৪০), অপর্না চৌধুরী পাড়া, খাগড়াছড়ি
১১. স্যুইচিং অং মারমা (বয়স ৪৩), কালাডেবা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি
১২. মানুপ্রু চৌধুরী (বয়স ৪৩), কালাডেবা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি
১৩. রিপন চাকমা (বয়স ৩৬), উন্নয়নকর্মী, খাগড়াছড়ি
১৪. সুযশ চাকমা (বয়স ৩৫), উন্নয়ন কর্মী, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকসংগীত ও গাথা

বলংরায় সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক গান

সাধক খুশী কৃষ্ণ ত্রিপুরা ওরফে বলংরায় সন্ন্যাসী বাংলাদেশের ককবরক ভাষাভাষি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির মধ্যে নিজ ভাষায় লেখালেখি চর্চার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। আধ্যাত্ম্যজীবনের আহবান জানিয়ে বাংলা ও ত্রিপুরা ভাষায় জাগরণীমূলক যোগ সংগীত, গ্রন্থ, সুর ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সাধন-মার্গের চরম সীমায় উপনিত হয়ে স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়েছিলেন।

খাগড়াছড়ি বাজার হতে ৪ (চার) মাইল পশ্চিমে মাটিরাঙা উপজেলাধীন গোমতি ইউনিয়নের কাপতলা নামে একটি ছোট্ট পাহাড়ি পাড়ায় ১৮৮৪ খ্রিস্টীয় সন তথা ১২৯৪ ত্রিপুরা সন বা ১২৯১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশি তিথিতে বলংরায় সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল খুশীকৃষ্ণ ত্রিপুরা। তিনি খুশীকৃষ্ণ ভক্ত নামে আত্মীয় পরিজনের কাছে বেশি পরিচিত ছিলেন। মদ, মাংসসহ আমিষ জাতীয় আহারে তাঁর অনিহা দেখে আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে এই নামে ডাকতেন। এছাড়া ছোটকাল থেকেই তিনি বহু শাস্ত্র ও গ্রন্থ পাঠ করতেন এবং সজ্জনদের সাথে গুরুগম্ভীর আলোচনায় লিপ্ত হতেন। মাঝে মাঝে তিনি বৈদ্যগিরি করেও পরোপকার করতেন। তিনি মহাপুরুষ রত্নমনি সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর দীক্ষা নিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আশায় গভীর জঙ্গলে একেশ্বর সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে কখনও অল্প আহার করে, নিরামিষ খেয়ে অথবা কোন কোন সময় অনাহার, অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যার কথা দিন দিন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জঙ্গলকে ত্রিপুরাদের ভাষা ককবরকে 'বলং' বলা হয়। গভীর জঙ্গলে তাঁর কঠোর সাধনা দেখে তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে শ্রীমৎ স্বামী বলংরায় পরমহংসদেব নামে অভিহিত করে, যা সংক্ষেপে বলংরায় সাধু নামে প্রচলিত। ত্রিপুরা রাজাদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা রিয়াং বিদ্রোহ চলাকালে এই বিদ্রোহের প্রধান রত্নমনি সন্ন্যাসীর দুইজন প্রধান শিষ্য বা সেনাপতির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। সাধু

www.pathagar.com

মহারাজ রত্নমণি সন্ন্যাসী ও তাঁর অনুসারিদের এই বিদ্রোহের কারণ ছিল ধর্মপালনে হিন্দু বাঙালি তথা ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব করা, ধর্মের নামে প্রতারণা বন্ধ করা, বাঙালী হিন্দু ব্রাহ্মণদের দৌরাত্ম্য প্রশমন করা এবং রিয়াং সমাজপতিদের স্বৈরাচারিতা ও অত্যাচার বন্ধ করা। বহু রিয়াং প্রজা সাধারণ তাঁদের এই বিদ্রোহে স্বতস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিল। তাই, এই বিদ্রোহটি রিয়াং বিদ্রোহ নামেও সর্বাধিক পরিচিত ছিল। বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে তাঁর গুরু রতনমনি সন্ন্যাসী রামগড়ে ত্রিপুরারাজ রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার সময় বলংরায় সন্ন্যাসী ঘটনাস্থল হতে কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর গুরু গ্রেপ্তার হন। বলংরায় সন্ন্যাসী বহু আধ্যাত্মিক গান তাঁর নিজ মাতৃভাষা ও বাংলায় রচনা করে নিজ কণ্ঠেই প্রচার করতেন। তাঁর লেখা রামায়ণ কীর্তনের অংশবিশেষ নিচে উপস্থাপন করা হল-

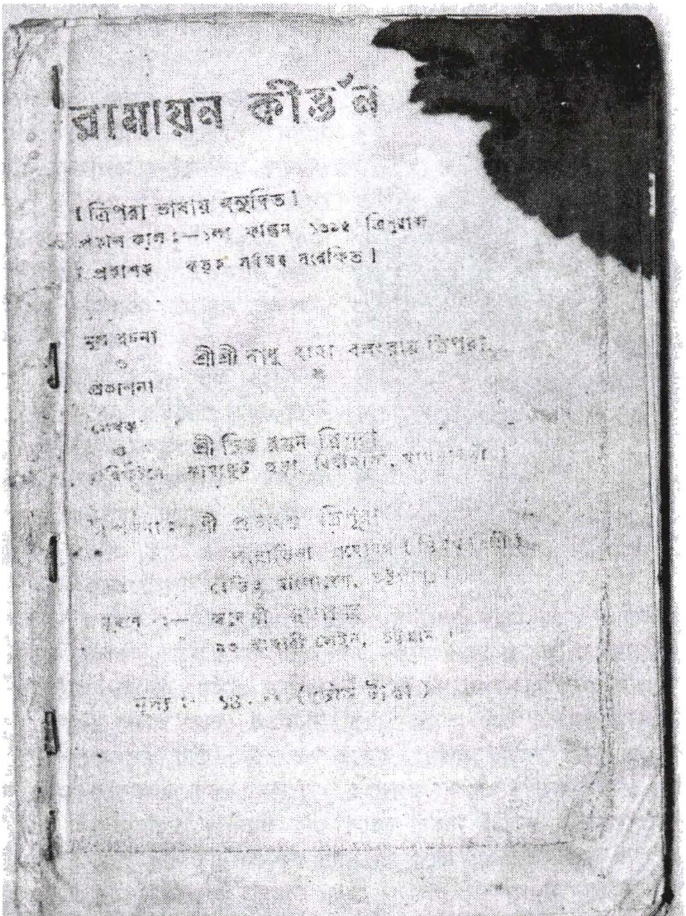

www.pathagar.com

ওঁ মা
রামায়ণ কীর্ত্তণ

ওঁ হরি ওঁ সত্য সনাতন যুশে নুং হরি
সত্য রূপী নারায়ণ।
সত্য যুগ দাইয় বিরিফাং বালায়অ
জীবনি প্রাণ লাগই নুং মুথুগই তন।
পুনঃ আর সৃষ্টি খাইনি, চেতেরমান নুং থুমানি
দেবাহুতি বাছানুং কপিল নারায়ণ।
বিনি পাই খাইত্রেতা যুগঅ, অযুধ্যা জর্ন্ম লাগ'
এক অংগনি চারি অংশ লীলানি কারন।
দশরথ বাছা অংগই, ফানি বাখা নুং পালগই
চৌদ্দ বৎসর বনবাস বুথালনি রাবণ।
দ্বপর যুগ কৃষ্ণ লীলা, বৃন্দাবন গোপি খেলা
কংস ধ্বংস নুং খালাই' লীলানী কারণ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দায়' রথ সারথি নুংসে খাইয়
কুরুকুলব ধ্বংস অংগ অধর্ম্ম কারণ
কলিযুগে নুংসে হরি,শ্রীচৈতন্য গৌর হরি
সন্যাস মন্ত্র সাগই নুং কান কৌপিস
পূর্নব্রহ্ম নুংসে আপনজীব মাত্রনি বমা বফা
সৃষ্টি প্রলয় নি দায় লীলা নি কারণ।
আংলাই তামা থিজামানি, দয়া ধর্ম্ম ব্রত নিনি
চায়া ককন নুং চারথায় নুংসে প্রাণনি ধন
গোসাঁই বলং দয়া অংখা সাকনি ককনিসুই দি হিনকা
আং চিত্ত ব সুইয়ই নায়খা প্রভাংশু তাননি মখা পুতি রামায়ণ
আংলাই তামা ছিজাকনায়, ছিয়াককন নুংছিরথায়
সুইয়ই নায়দং রামায়ণ পালা কীত্তন ॥

ওঁ মা
রামায়ণ কীর্ত্তণ

ওঁ হরি ওঁ সত্য সনাতন তুমি হরি
সত্যরূপী নারায়ণ।
সত্য যুগে বট তলে
জীবের প্রাণ নিয়ে তুমি রাখো ঘুম পাড়িয়ে।
পুনরায় সৃষ্টির জন্য, তুমি জেগে উঠো
দেবাহুতির সন্তান তুমি কপিল নারায়ণ
এরপরে ত্রেতা যুগে অযুধ্যায় জন্ম নিয়ে
এক অংগের চার অংশ লীলার কারণ।
দশরথের পুত্র হয়ে, পিতার শর্ত পূরণ করে
চৌদ্দ বছর বনবাসে ছিলে রাবণ বধে।
দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ লীলা, বৃন্দাবন গোপি খেলা
কংস ধ্বংস কর তুমি লীলার কারণ।
কুরু ক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি সারথি হলে
কুরুকুল ধ্বংস হয় অধর্ম্ম কারণ
কলিযুগে তুমি প্রভু শ্রীচৈতন্য গৌর হরি
সন্ন্যাস মন্ত্র শুনাও তুমি কপিন পরে
পূর্নব্রহ্ম তুমি আপন, জীবের মাতা-পিতা
তোমার লীলায় হয় সৃষ্টি আর প্রলয়
আমি কিছুই জানিনা, সবই তোমার দয়া
তুমি প্রভু আমার ভুল করিও ক্ষমা।
গুরু বলং কৃপা করে, ককবরকে রামায়ণ লিখতে
আমি চিত্ত চেষ্টা করলাম, প্রভাংশু শুদ্ধ করলেন
আমি অবুঝ লিখলাম, তুমি জ্ঞানী বলে দিও
ককবরকে লিখছি আমি রামায়ণ পালা কীর্ত্তন ॥

বন্দনা

পইলাগ খুলুম আং সৃষ্টি খাইনাই সান
থুইনাই থাংনাই আচাইরনায় তাকনায় ই হান
বিনি পাইখায় আং খুনুম আমা আপান
বওকসে হান ফুনুকনায়লে যত বরকন
বরক অংগই জন্ম অংখায় গুরু সিনিতায়
সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা হিনায় বন খুলুমকা
ব্রহ্মা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ভাগই রখা।

বন্দনা

প্রথমে বন্দনা করি সৃস্টি কর্তাকে
যিনি জন্ম মৃত্যু জীবন দেন এ ধরাকে
এর পর বন্দনা করি মা বাবাকে
তাঁরাই মোদের দেখায় এ পৃথিবীকে
মানুষ হয়ে জন্ম নিলে গুরুকে চিনতে হয়
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে প্রণাম জানাই
ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সৃষ্টি করেছেন

www.pathagar.com

বর্ণ করই যত বরক বকন খুলুমকা
বর্ণ দায় ...... বৈষ্ণব আখলই ফাইকা
মুনি ঋষি সাধু বৈষ্ণব বওকন খুলুমকা
রামায়ণ রচনা খাইনায় বাল্মীকি হিনকা
বাল্মীকিন আং খুলুম রচনা খাইকা
পদাবলী পালা কীত্তন বসে খায়রনায়
বিনি পাইখাই আং খুলুম অযোধ্যা হান
দশরথ কৌশল্যা কৈকেয়ি সুমিত্রান
রাংচাক পুরী লঙ্কা হান বন খুলুমকা
মন্দাধরী রাজ্য লক্ষী বন খুলুমকা
বিনি পাইখাই আং খুলুম যত মাখারা
তাখুক বুখুক বমা বাছা যত অকারা
পূর্ব আতা আং খুলুম পূব সাল কানায়
পশ্চিম আতা আং খুলুম জগনাথ হনায়
উত্তর দায় আং খুলুম হাপং সুমেরুন
দক্ষিণ দায় আং খুলুম দক্ষিণ সাগরন
গুরু গোসাইং বলং রায় আন সুইদি হিনকা
গুরু ককবায় আং চিত্তর সুইয়ই নাইজাখা
পরেনায় রক নক শুদ্ধ খালাইথায়
চায়া ককন নক চারগই আন মাপ রথায়

বর্ণহীন সব লোককে প্রণাম জানাই।
বর্ণেতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ
মুনি ঋষি সাধু বৈষ্ণব সকলকে জানাই প্রণাম।
রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি-কে
আমি তার রচনার জন্য প্রণাম জানাই।
পদাবলী পালা কীর্ত্তন তারই সৃষ্টি।
আমি অযুধ্যাকে প্রণাম করি
দশরথ কৌশল্যা কৈকেয়ি সুমিত্রাকে
আমি স্বর্ণপুরি লংকাকে প্রণাম করি
মন্দাধরী রাজ্যলক্ষীকে প্রণাম করি
আমি সকল বানরদের প্রণাম করি
ভাই ভ্রাতা বয়োজ্যেষ্ঠ সবাইকে প্রণাম।
পূর্ব দিকে প্রণাম করি সূর্যোদয়কে
পশ্চিমে প্রণাম করি সূর্যাস্তকে
উত্তরে আমি সুমেরুকে প্রণাম করি
দক্ষিণে আমি মহাসাগরকে প্রণাম করি
গুরুজি বলংরায় আমায় আজ্ঞা দিল
গুরু বাক্যে চিত্ত আমি লিখছি
তোমরা যারা পড়ছেন শুদ্ধ করে নিবেন
ভুল শুদ্ধ করে মোরে ক্ষমা করবেন।

রাচামুং

পরম ব্রহ্ম রাম মুং হরে রাম রাম
দুঃখ দশা দুর খালায়নায় জয় সীতা রাম
জানকীনি চালাব বিনি বুমুং রাম
দশরথ বাছাব অমুল্য গ রাম
স্বয়ং লক্ষ্মী ......রনায় আমা সীতারাম
ব্রহ্ম বধ পাপ হরেনায় আসল রাম নাম
রাম নামন লাবাইদি থাংনি গোলুক ধাম
নামসে জীবন মুক্তি রনায় হনলায় মোক্ষধাম
গুরু গোসাঁই বলং রায় ভাগই রখা নাম
সাগতংগ রামনাম বসে আসল কাম
চিত্ত সুইকা প্রভাংশু তানকা তাংগই নাইদিকাম
তাংনি রুইং খাই মুক্তি মাননায় বনহীন নাম

গান

পরম ব্রহ্ম রাম নাম হরে রাম রাম
দুখ দশা হরণকারী জয় সীতা রাম
জানকীর স্বামী রাম তার নাম
দশরথ পুত্র সে অমূল্য রাম
তিনি লক্ষ্মী অন্ন দাতা মা সীতা রাম
ব্রহ্ম বধ পাপ হরণকারী তার নাম রাম
গোলক ধামে যাবার জন্য জপ রাম নাম
জীবন মুক্তি দাতা মোক্ষধামের গতি হল নাম
গুরু বলংরায় জানিয়েছে নামের মহিমা
সাথে রয়েছে রাম নাম এটি আসল কাম
চিত্ত লিখছি, প্রভাংশু শুদ্ধ করছেন দেখ গো সবাই
মুক্তি ত্রাতা মোরে বলে কর রাম নাম

www.pathagar.com

দাইংসিনি বন্দনা

দাইং কাইসিনি রামায়ণনি কক সাথায় অংখা
নায়নি রুংখাই দাইংসিনি সাগনুং থায় হিনকা
সিনি স্বর্গ সিনি পাতাল সাগসে তংগ
সুতল বিতল তলাতল রসাতল হিনগ
সিনি দায়নি সালসিনি যত সাক নায়
থুইনায় থাংনায় আচাইরনায় রাজা চারনায়
প্রথম দায় আদি কা- রাম জন্ম অংখা
শিবনি ধনু সাবাইয়ই সীতা ন লাখা।
বিশ্বমিত্র উদুং দায় মিথিলা থাংকা
লামা দায় তারকা'ন বুথালই সিকা
অযুধ্যা কা- দায়' বলংগ থাংকা
ফানি বাক্য চিরুই বৎসর বন' পালকখা
অরণ্য কা- দায়' সীতা খকজাকখা
সন্যাস অংগই রাবন রাজা খগই তিলাংখা
সীতান' রুতুকনানি বাগই কিসকিন্ডা থাংকা
বালী সুগ্রীব কইজ্যা অংগই বালী ককজাকখা
বিশকিয়া কা- দায়' সুগ্রীব কিচিং খাকা
সীতা উদ্ধার খায়নি হিনয় যত য়াচাকখা
গরজা গরজা মাখারা যত থুমজাকখা
সুন্দরা কা- দায়' সাগর থেলায়কা
সাগর থেগই মাখারারক লঙ্কাগ' থাংকা
লঙ্কা কা- দায়' রাবণ ককজাগই থুইকা
লক্ষ কাইসা বাছা বিনি সোওয়া লক্ষ বুসুক
যত থুই গই থাংগই পায়খা আর মিসি মুসুক
উত্তরা কা-দায়' বনবাসনি ফাইকা
সীতা খকজাক মানি ককন' দুর্নাম সালাইকা
স্বয়ং পরম ব্রহ্মরাম রূপগই
সৃষ্টি খাইনায় বসে অংগই তংখা পালগই
প্রজারকনি দুর্নামন' রামব' খানাকা
স্বয়ং লক্ষী জানকীন' বলংগ হলকা
অযুধ্যানি ভাগ্যলক্ষী বনবাস' অংখায়
কাবই তংখা বমা বাসা আর' সুক থায়

সপ্ত বন্দনা

সাত পর্বের রামায়ণ কথা করি বিবরণ
জানতে হবে সাত পর্বের কথা নিজের কাছে রয়েছে
স্বর্গ আর নরক নিজের কাছে আছে
সুতল বিতল তলাতল রসাতল নামে
আমাদের কাছে সাতদিনের মাধ্যমে
জীবন মৃত্যু জন্ম রাজা করে যে
প্রথমে আদি কা-রামের জন্ম হল
শিবের ধনু ভঙ্গ করে সীতাকে নিল
বিশ্বমিত্র সাথে তার মিথিলায় গেল
পথে তার'কাকে বধ করল।
অযুধ্যা কাণ্ডে বনবাস গেল
পিতার বাক্য রক্ষার জন্য বনবাসে গেল
অরণ্য কাণ্ডে সীতার হরণ হল
সন্যাস রূপে রাবণ রাজা চুরি করিল
সীতার খোঁজে রাম কিসকিন্ধ্যা গেল
বালী সুগ্রীব দ্বন্দ লেগে বালী শেল বিদ্ধ হল
বিশকিয়া কাণ্ডে সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করল
সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাজি হল
সব বানর একত্র হল
সুন্দরা কাণ্ডে সাগরে বাঁধ দিল
সাগরে বাঁধ দিয়ে বানরেরা লঙ্কায় গেল
লঙ্কা কাণ্ডে রাবণ শেলদিয়ে বধ হল
লক্ষ সন্তান সোয়া লক্ষ নাতি নাতিনী
গৃহস্তের সব গরু ছাগল মহিষ
উত্তরা কাণ্ডে বনবাস থেকে ফিরল
সীতার হরণ নিয়ে দুর্নাম রতাইল
স্বয়ং পরম ব্রহ্মা যে রাম রূপে আছে
সৃস্টি কারী হয়ে সে নিজেই ভুলেছে
প্রজাদের দুর্নাম যে রাম শুনেছে
ঘরের লক্ষী জানকীকে বনবাসে দিল
অযুধ্যার ভাগ্যলক্ষী বনবাসী হবে
পাড়াবাসী আত্মীয় স্বজন ক্রন্দন করে

www.pathagar.com

বলং দায় বাল্মীকিনি আশ্রম হিননায়
সীতা সতী অবলংগ' আশ্র লাগই থায়
পূর্ব্বে দায় বাল্মীকি সুইজাক রামায়ণ
রাম জর্ন্ম অংনি বাগই অবতার কারন।
বন বাসগ' লব কুশ জর্ন্ম অংফাইনায়
অস্ত্র বিদ্যা বাল্মীকি ফুরুংগই রনায়
অশ্বমেধ যজ্ঞ খায়নি রামযে অংখালায়
ফা-বায় বাছা যুদ্ধ রগই রামন' বুংখালনায়
ফাবাই বাছা পরিচয় যখন অংগন'
বন বাসনি সীতা নব' নগ তিলাংন
তিলাং লাফুং সীতালাই নগব তংয়ানায়
পৃতিবীন' জাগা বিগই পাতাল থাংনায়
রাম সীতা লক্ষণ হিনায় সব ভাবেনায়
ভাবে নানা রুংখালাইসে বাসাকগ নুংনায়
গুরু গোসাঁই বলংরায় কত্তক টিকা সাজাক
নকব যত্ত বুঝিয়ই নায় চিত্তব সুইজাক
বুঝিয়া খাই ইঁসুক ককন' সুংদি গুরুন'
সুংনি রুংখাই গুরুন'সে আসল কক মান'
জয়রাম হিনসিদি রামনাম লাসিদি
সত্যনিসে রামনাম, জীবন হলনাই মোক্ষধাম
রামানাম ন' লাখালায়, দুঃখ দশা দূর অংনায় ॥

বনের ভিতর বাল্মীকির আশ্রমে
সীতা সতী সে বনে আশ্রয় নিবে
পূর্বে বাল্মীকি রামায়ণে লিখেছিল
অবতার কারণ হেতু রাম জন্মিল
বনবাসে লব কুশের জন্ম হবে
বাল্মীকি তাদের অস্ত্রবিদ্যা দিবে
রাম যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে
পিতা পুত্র যুদ্ধ হলে পিতা যে হারবে
পিতা পুত্রের পরিচয় যখনি হবে
বনবাস থেকে সীতাকে গৃহে ফিরাইবে
সীতা কিন্তু ফিরে গেলে রবে না ঘরে
ধরা ছেড়ে পাতাল রাজ্যে স্থান নিবে
রাম সীতা লক্ষণ সব যে ভাবনা করিবে
স্বীয় গাত্রে দেখিবে যে জানিবে
শ্রী গুরু বলংরায় এ কথা বলেছে
ভেবে দেখ তোমরা সবে চিত্ত-ও বলেছে
ভালভাবে জানতে হলে যেও গো গুরু সনে
মনোযোগে পাবে উত্তর শ্রী গুরুর পানে
জয় রাম বল সবে
সত্য হল রাম নাম, জীবনের মোক্ষধাম
রাম নাম নিলে সবে দুখ দশা দূর হবে।

বলংগ থাংমানি রাচামুং
পদাবলী সুর

ফানি বাক্য পালক নানি, সত্য ধর্ম্ম রক্ষা খায়নি
রামসীতা লক্ষণ বায় বলংগ থাংথায়
রাম সীতা বসে অংনায়, পুরুষ প্রকৃতি হিনায়
বাখা দায়' লক্ষণবীর বৈরাগ্য অংথায়
বাখান'যে ঠিক খায়মানায়, সন্যাস কামন' বসে তাংনায়
বাখা আসল বিবেক বুদ্ধি বৈরাগ্য অংখায়
চিত্ত নুংব বাকাকাদি, গুরু মুংন' সত্য খায়দি
সত্যনিসে মুক্তি মানথায় বর রুকুতথায়
ফানি বাক্যব পালখা, রাম ব বফাং বুকুর কানখা
বখরকগ' জন্তা খাকা কমুন্ডল বাই লাঠা তুইখা
থুয়ই থাতই অংলাংখা, বমাবাছা কাপলাংখা

বনবাস যাত্রার সংগীত
পদাবলী সুর

পিতৃ বাক্য পালন, সত্য ধর্ম ধারণ
রাম সীতা লক্ষণ বনে যাবে
রাম সীতা সে হবে, পুরুষ প্রকৃতি হবে
মনের মাঝে বীর লক্ষণ বৈরাগ্য হবে
মনকে যে স্থির রাখবে, সন্যাস কর্ম সে করবে
মন যে হল বিবেক বুদ্ধি বৈরাগ্য
চিত্ত তুমি মনে রেখো, গুরু নাম জপ করো
সত্য থেকে মিলবে মুক্তি, আর কোথা যাও
পিতৃ সত্য বুকে নিল, রাম রং কাপড় নিল
মাথায় জন্তা হাতে লাঠি সাথে কমুন্ডল
শ্মশান যাত্রি বেশ নিল, সবাই ক্রন্দন করল

www.pathagar.com

সন্যাসবেশ রাচামুং
পদাবলী সুর

রাজা মানমুং বন সিগই, কিগই চানায় বেসন' লাগই
পরম ব্রহ্মা রামচন্দ্র বলংগ' থাংকা।
লক্ষণ সীতা যাখুই সুনায়, বাখানায়বাই হুগাই রনায়
রামনি য়াপায় পুজিয়ই তংখা।
রাবন মুসুই অংদি অংদি হিনকা, রাংচাক মুসুই অংগই ফাইকা
মারিচকব অংগই নুংজাকখা।
রাংচাক মুসুইন' ব নুংখা, রামন' সীতা রমদি হিনকা
বিরক হিনই রামচন্দ্র আখরই থাংকা।
রমনি নায়ই রমমানয়া গই, শব্দভেদী বান ককগাই
মারিচকন' বুথালই ছিকা।
রাংচাক মুসুইপ্রাণ থাংফুগ' লক্ষণ হিয়ই রিংয়ই পুংগ
বন খানাগই সীতা লক্ষণ-ন' রউখা।
লক্ষণ যখন আখলা লাংখা, সীতা কলাই সাইচুং অংখা
সাইচুং নুংগই রাবণ রাজা খগই তিলাংখা।
স্বয়ং সীতা দুঃখ মানতই, প্রকৃতিন' দুঃখ রতই
তমই চিত্ত দুঃখ মাননি নুংলাই সেলেখা।
সীতা খগই তিলাংখা, লঙ্কা দায়' রগইখা
লঙ্কাপুরী করেগ পাংখাইন বফাং বলংগ
তমই নু বা কিরিন, খুরিগ'সে বামন'
প্রকৃতি যে সীতা ন, দশ ইন্দ্রিয় রাবন
ইন্দ্রিয় নমেচেনদি, মুলধারান' সুমচাদি
গোসাঁই হিনায় বলংরায়, সাগই রখা রাই বাই
বরক বন' পাইতকয়া, থুমানিসে বাচায়া।

কওক- রাংচাক মুসুইন' মারচিক প্রাণ থাংফুগ' ভাই লক্ষণ হিনই রিংয়ই পুংখায় সীতা লক্ষণ নায়ইদি হিনয় রউখা।

রাচামুং

খানাদি খানাদি লক্ষণ নাতা ন'ন' রিখন না
বিসিতামনি তারুং বিসিংয় নাতা মুসুই ককনি
খানা ভাই লক্ষণ ভাই লক্ষণ হিনয় নাতা

সন্ন্যাসবেশ রাচামুং
পদাবলী সুর

রাজার বেশ ফেলে, গরীব বেশ নিয়ে
পরম ব্রহ্মা রামচন্দ্র বনবাসে গেল
লক্ষণ সীতা পদ ধুয়ে, সব কিছু পরিষ্কার করে
রামের পদ পাদে পূজা করিল
রাবণ হরিণ রূপ দিল, সোনার হরিণ হয়ে এল
মারিচক হরিণ হইল
সোনার হরিণ দেখে, সীতা রামকে যেতে বলে
স্ত্রীর কথায় রাম বাহির হল
ধরতে গিয়ে না পারলে, শব্দভেদী বান নিক্ষেপে
মারিচক কে মেরে ফেলে দিল
সোনার হরিণ মরার কালে, ভাই লক্ষণ শব্দ করে
ইহা শুনে সীতা লক্ষণকে বলে
যখন লক্ষণ বাহির হল, সীতা একা হয়ে গেল
একা পেয়ে রাবণ রাজা হরণ করিল
সীতা যেমন দুখ পেল, প্রকৃতিতে দেখা গেল
চিত্ত আমি তেমনি মনোদুখ পেলাম।
সীতা হরণ করে, লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে
লঙ্কাপুরী পাশে, পাংখাইন বনে
তাকে কেন করবো ভয়, কোলে তোলে নিব তাই
প্রকৃতি যে সীতা গো, রাবণ দশ ইন্দ্রিয় লো
ইন্দ্রিয়কে করবো জয়, মূলধারায় থাকবো হায়
শ্রী গুরু বলংরায়, সব কিছু দিয়েছে রায়
মানুষ তাকে না বোঝে, ঘুমে আছে এখনো।

টীকা- সোনার হরিণ মরার সময় ভাই লক্ষণ বলে ডাকার শব্দ শুনে সীতা লক্ষণকে ভাইয়ের খবর নেওয়ার জন্য পাঠাল।

সংগীত

শোন শোন লক্ষণ, তোর ভাই করেছেন স্মরণ
তিন বছরের বনে একা, তোমার ভাই করবে শিকার

www.pathagar.com

নন রিংখন খা----- ঐ
রিংখন মানি খানা গৈ তমই তংন নুং
আচগই মুংসা সুকসে অংখা নাব' আইসে
নন রিংখন না
বন' বাসগ ফাইজামানি, চুং বুখুকথাম অযুধ্যানি
নাতা থুইকায় চুং বুকুনুই তামা খাইয়ই তংসিনা
নাতা যখন বলংগ ফাইকায় রাজ্য লাখা ভরত লাই
ভরত রাজা লাতই নুংব আন লানি মুচুক না..... ঐ
গোসাঁই বলং সাগই রতই ইন্দ্রিয়ন ছিদি ককগাই
গুরু ককন চিত্ত সাতই তমই খাইলাং নক মানা।

শুন ডাকছে ভাই লক্ষন বলে
ডাকসে তোমাকে
ভাইয়ের ডাক শুনেও তুমি
বসে আছ তুমি, দেখ কোন অঘটন হল কিনা
ডাকসে তোমাকে।
বন বাসে এসেছিলাম, অযুধ্যা রাজ্য থেকে
ভাইয়ের কিছু হলে মোরা যাব চলে কোথা
তোমার ভাই চলে এলে, ভরত এখন রাজা হলে
ভারত যেমন রাজ্য নিল, তুমিও মোরে যদি চাও
শ্রী গুরু বলংরায় বলছে শোন, ইন্দ্রিয়কে কর জয়
গুরু বাক্য আমি চিত্ত কেমনে তাকে করি হেলা ভাই

কওক- দশরথ রাজা কৈকেয়ী কুমন্ত্রনা বাই রামন' চৌদ্দ বছর বলংগ হলনি হিনয় বাক্য রজাক। পিতৃ বাক্য পালন খায়নানি হিনয় রামচন্দ্র বলংগ থাংকা আখাই লঙ্কানি রাবন রাজা বাই সীতান হরেজাকখা। পুরুষ যে রাম প্রকৃতি সীতা দশ ইন্দ্রিয় রাবন বাই হরে জাকগই বিবেক বুদ্ধি আত্মাতত্ব লক্ষণ আখাই মাখারা সৈন্য ইন্দ্রিয়নি কর্ত্তারক বাই রাবন র্ধস খাইয়ই পুনরায় অযুধ্যাগ রাজা অংফাইকা।

টীকা- কৈকেয়ী কুমন্ত্রনায় দশরথ চৌদ্দ বছরের জন্য রামকে বনবাসে পাঠানোর শপথ দিয়েছিলেন। পিতৃ বাক্য রক্ষার্থে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণকে নিয়ে বনবাসে গেলেন। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতাকে হরণ করা হয়। পুরুষ রাম প্রকৃতি সীতাকে দশ ইন্দ্রিয় রাবণ হরণ করে। বিবেক বুদ্ধি লক্ষণ বানর সৈন্য দ্বারা রাবণ বদ করে সীতাকে উদ্ধার করে পুনরায় অযুধ্যায় ফিরে আসে।

রাচামুং

ফানি বাক্য পালগাই রাম, ফিলই ফাইকা অযুধ্যা ধাম
রাজা অংগই সিংহাসন কাখা।
রামন' রাজা কাই রখা ধন্য ধন্য প্রজা হিনকা
জয় হিনয় প্রজা খাতুংখা
রামন' রাজা কাই রতই, প্রকৃতিক উদ্ধার খায়ই
তত্ত্বমতে চিত্ত সুইতই নকব খানাকা

সংগীত

পিতৃবাক্য রক্ষা করে রাম, ফিরে এলেন অযুধ্যা ধাম
রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেন
রাজা করে রামকে প্রজা সবাই ধন্য ধন্য করে
জয় রাম বলে প্রজা আনন্দিত হল
রামকে রাজা যেমন করে, প্রকৃতিকে উদ্ধার হরে
তত্ত্বমতে আমি চিত্ত বলি শুন সকলি

ঝুমুর

জয়রাম জয়রাম সিদ্ধি খাইদি যতকাম
রাম নামন লাবাইদি সম যাতনা তামানদি
কওক- রাম বনবাস থাংফুগ ভরত রাজা অংগই তংজাক। যখন রাম চিব্রই বৎসর বফানি বাক্য পালন খাইয়ই অযুধ্যাগ

ঝুমুর

জয় রাম জয় রাম সিদ্ধি কর সকল কাম
রাম নাম নিও সবে, মনের আনন্দে

টীকা- রাম বনবাসে থাকার সময় ভরত রাজা ছিলেন। চৌদ্দ বছর পর ফিরে এলে

www.pathagar.com

ফিলই ফাই কালাই ভরত বাতা রামন' রাজা বকখা। দলে দলে প্রজারক রাজা কাতাল রামনি য়াপাইন' খুলামনি ফাইকা রাম রাজা অংমানি যতপ্রজা চাজাকখা। মাতর বাকমিয়া বাখা চায়া প্রজারক সালাইবা স্বয়ং নারায়ন রাম ন হিনবা রাবন যে সীতান খগই তিলাংজাক নিশ্চই সতীভঙ্গ অংখানা বন তামা খায়ই রাম তনলাং হিনই প্রজারক সালাইয়ই থাংকা।

তাকে আবার রাজ্যের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। প্রজারা রামকে প্রণাম করে গ্রহণ করে। কিছু প্রজার রামের কৎসা করে যে, সীতা রাবণের হেফাজতে থাকার সময় সতীভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু রাম সীতাকে ছাড়ছে না কেন।

রাচামুং

রাম ন নায়নি হিনয় প্রজা কুথুমই থাংকা
বুরুই খগজাকলাংখা হিনয় কক ছেরের সাকা
প্রজারকনি ভাবন নায়ই রামব' বুঝিখা
স্বয়ং লক্ষী সীতা নব ছাড়িথায় অংখা
বলং সাকা চিত্ত সুইকা যত খানাকা
স্বয়ং লক্ষী সীতানিসে দুঃখ ফাইলাংকা।

সঙ্গীত

রামকে দরশনে প্রজা সব এর দলে দলে
স্ত্রী হরণ হয়েছে বলে কানা ঘোষা করে
রাম বুঝে গেল প্রজাদের ভাব দেখে
স্বয়ং লক্ষী সীতাকে যে ছেড়ে যেতে হবে
আমি চিত্ত লিখেছি যাহা গুরু বলে গেছে
দেখছে সবাই লক্ষ্মী সীতার দুখ বেড়েছে

ঝুমুর

দুম্মু খন রিংখনকা, যত ককন সারাইকা
সীতান লাই ছাড়িথায়, তামাখায়ই তংমানথায়
নুংলাই লেগই নায়াসিদি, তামা হিনলায় খানাদি
চায়াহিনকায় সাপাইদি, কলঙ্কন দুর খাইদি

ঝুমুর

দুম্মুখনকে ডেকে, সব কথা বলে
সীতাকে যে ছাড়তে হবে, কী যে করি বল সবে
তুমি দেখ ঘুরে, লোকেরা কি বলে
সব কিছু বল মোরে, প্রজা মোর যাহা বলে

কওক- প্রজারক রামন দুর্নাম সালাই কায় রাম দুম্মু খ ন রিংখনই সাবা প্রজা আনি বাগই তামা সালাই নক পতি বেড়েয়ই খানাদি।

টীকা- প্রজার দুর্নাম শুনে রাম দুম্মুকে ডেকে বললেন, রাজ্য ঘুরে তুমি প্রজাদের মতামত সংগ্রহ করে আমাকে সব কিছু জানিয়ে দিও।

রাচামুং

রামনি কক বাই দুম্মুখ বেড়েয়ই নায়খা
প্রজারকনি দুর্নাম নফককাইয়ই সাপাইখা
মাচায়ালাই প্রজা তংয়া সুখিযে তংগ
বুড়ুই খগজাক লাংখা হিনই বন সালাইগ
দশ মাসে লঙ্কাদায় মাসীতা তংখা
কোন বিচার খাইয়া বাদে নগ তবখা

সঙ্গীত

রামের কথা পেয়ে দুম্মুখ ঘুরে ঘুরে
প্রজা কথা করে বিবরণ
খানা পিনা সবই আছে অভাব কিছু নাই
স্ত্রী হরণ হল বলে দুখ করে যায়
দশ মাস লঙ্কা বাসে মা সীতা ছিল
একটা বিহিত এর তরে হবে কি বল?

www.pathagar.com

ঝুমুর

রাবনখগই তিরাংজাক সতী ধর্ম্ম বা পাইজাক
তামা নানি তবলাং সব সাগই পাইতক লাং

কওক- দুর্ম্মুখ প্রজারকনি কক খানানি থাকালাই রাম ব তৈ কুনানি হিনই পুখিরি উত্তর আতানি তৈরুকুংগ ধবাজকমা কায়নুই রি সুলাইয়। বাসাই রি সুমানি নুংগই বুখুই হিনবা প্রভু আন রদি। আং রি সুন। অ ককন খানাগই ধবা জালা হিনবা আং রাম তৈয়া বুগুই খগজাকগই তাংগই চানায়। আন ছিবিগই নুং নামা নাফানি নক তামানি থাং আন নুং তা বানেদি।

ঝুমুর

রাবন হরণ করেছে, সতীধর্ম হরেছে
কে বা আর করে বিশ্বাস তাকে

টীকা- দুম্মুর্খ প্রজার মন্তব্য শুনতে গেলে রামও স্নানের উদ্দেশ্যে পুকুরঘাটে চলে যান। এসময় ধোপা ও ধোপানী ঘাটে কাপড় ধৌত করার ফাঁকে সীতা হরণের কথা প্রসঙ্গে ধোপা বলে উঠে যে আমি রাম নই যে রাবণকর্তৃক স্ত্রী হরণ হয়েও আবার সীতার সাথে সংসার করি।

ঝুমুর

কনদি কনদি আনতা গুদাদি
আন নুং গুদুখাই, নিনি যাগ পাপ অংনায়
নন কাগই ছিচিনায় নুংব চালা মুচুকনায়

কওক- ধবাজালা হিনবা মিয়া সারুই দাইয় আন সাইচুং কালাংগই নাফা সুহনি নকগ তমই থাংলাং আন সিবিয়ই নাফানি নকগ তমই থুলাং আইথানি নন আং হিন বিসি চালামুচুকনায় আং রামতই বুড়ুই খকজাকগই তাংগই চানায় য়া।

ঝুমুর

এসো না এসো না কাছে আমার
আমায় ছুঁয়ে পাপীর ভাগী হইয়ো না
তোমার সাথে আমি আর সংসার করবো না

টীকা- ধোপার স্ত্রী কাল রাতে তাকে না জানিয়ে বাপের বাড়ীতে রাত কাটালে স্ত্রীকে বৎসনা করেন। তিনি বলেন, আমি রামের মতো নই যে আমার স্ত্রী কারো দ্বারা অপহৃত হবে বা আমাকে ছাড়া রাত কাটাবে।

ঝুমুর

বিরক যদি নায়থক হিনকায় চালা ছিনি থায়
চালা নিসে য়াপাই দাইয় তীর্ত্ত খালায়থায়
কুকিলালায় বাসাক কুসুম খরাং খানাতক
চালান সে যে ছিনিনায় বিরকব নায়থক
বিরক অংগই আকল যদি অংমান খালাই গাম
রাংখক পয়সা বলাই চুনাই অংনায় ধনবান

ঝুমুর

নারী যদি সুন্দরী হয় স্বামীর ভক্তি রাখতে হয়
স্বামী ভক্তি করে তাকে তীর্থ ভাবতে হয়
কুকিল কিন্তু কাল হলেও কণ্ঠ তার মধুর
তেমনী সে সুন্দরী, যে স্বামী-ভক্তি করে যে প্রচুর
নারী তুমি ভাল চরিত্র করো গো তোমার
ধন-সম্পদ সব হবে, হবে সম্মান আর

www.pathagar.com

ঝুমুর
আকল চায় বিরকন নুখুং চায় অংন
খাপা হরনু মুয়াব, আইচুক কারা ছিয়াব
খলাদায় সুতুইনায় তমই দাকতুই বাচানায়
মাইতুক রমই সুতুইন মাথালই সে থুগন

কওক- মুনি ঋষি পর্য্যন্ত বিরক বাই ভুলায় জাগই তপভঙ্গ অংগ। আইথানি চরিত্রবান বিরক দরকার তাংগই চানানি খায়।

রাচামুং
বিরকনি যে চালা গুরু বন ছিনিথায়
চালানযে ছিনিয়ানায় নরগ থাংনায়
গুরু ককন চিত্ত সুইতই আন মাপর থায়

ঝুমুর
নন নকগ তিলাংয়া নুংবাই তাংগই চালিয়া
নন কাগই ছিচিনায়, সুরানিব রসিনায়
নাফা নকগ থাংছিদি আনি গয়না কালাংদি
রিনায় রিসা রফাইদি ওয়াখুম তৈয়া সকগদি

কওক- ধোবা কাইনুই ওয়ালাই মানি খানাগই রাম চন্দ্র বখ্রগ মগ্র ককজাকতই অংখা তৈকুমানি ফাইয়ই সিংহাসন আচগই মকগই তংখা অসময় দুর্ম্মখ সকপাইখা।

রাচামুং
রামনি ককবাই মুর্ম্মুখ বেড়েয়ই নায়খা
প্রজারকলাই সুখিসে ফাইয়ই সাপাইখা

ঝুমুর
যতপ্রজা সুখিসে সুখি খায়ই তংজাকসে
মাচায়ালাই বক অংয়া নিনি দুর্নাম সালাইয়া

কওক- রাম হিনবা দুর্ম্মুখ নুং কক মিছা তা ছাদি আং নিজে ধবাজকমা কাইনুই ওয়ালাইমানি খানাজাক, আন ভাগ্য লক্ষী ছাড়িনি অংখা।

ঝুমুর
নারী যদি দুশ্চরিত্র হয় সংসার হবে নিম্ন
স্বামী সংসার, শ্বশুর ভাসুর ছেড়ে চোখ তার ভিন্ন
আঙ্গিনা তার থাকে ময়লা, ভোরে জাগে না
পরিবারের কোনো কাজ সে ভাল করে না

টীকা- এখানে নারীদের সৎচরিত্র হতে না পারলে সংসার ব্যাঘাত ঘটে, সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

সঙ্গীত
নারী জাতির গুরু হল তাহার স্বামী
স্বামীভক্তি না করলে হবে নরকবাসী
আমি চিত্ত গুরুর কথা সবারে জানাই।

ঝুমুর
তোমায় আমি নেবো না, ঘরে আমি তোলবো না
সংসারেতে রাখবো না,
বাপের বাড়ী চলে যাও
গয়না কাপড় রেখে যাও

টীকা- ধোপা ধোপানীর ঝগড়া শুনে রাম হতভম্ব হয়ে গেল। সে স্নান ছেড়ে এসে সিংহাসনে বসে ভাবছে এসময় দুর্ম্মুখ ঘরে এসে পৌঁছল

সঙ্গীত
রামের আদেশ পেয়ে দুর্ম্মুখ রাজ্য ঘুরে দেখে
সকল প্রজা ভাল আছে সুখে রয়েছে

ঝুমুর
সব প্রজা সুখে আছে, ভাল আছে সবই
দুঃখ জড়া অভাব বলে তাদের কিছু নাই

টীকা- রাম দুর্ম্মুখের কথা শুনে বলে তুমি সব মিথ্যা বানিয়ে বলেছ। আমি নিজেই ধোপা ধোপানীর কথা শুনেছি।

www.pathagar.com

রাচামুং

দশমাসে লঙ্কা দায় সীতা তংগইখা
কোন বিচার খাইয়াবাদে বন আং তখা
বন তগ হিনই আন দুর্নাম খালাইকা
সীতা নসে আং ছাড়িথায় বাখাগ কাখা

গান

দশ মাস লঙ্কারাজ্যে ছিল মোর সীতা
কোন বিচার না করে তাকে এনেছি
তার কারণে রাজ্যবাসী বদনাম করে মোরে
তাই ভাবছি এবার আমি ছাড়তে হবে তাকে

ঝুমুর

বাসাক অংগ খাসান, আনি সীতা সতীন
তামা খাইয়ই ছাড়িন, পাপনি ভাগি অংগন
চাঠা বুড়ই অংমানি, বিদি ব্রহ্ম সুইমানি
মিথিলানি তমানি, স্বয়ং লক্ষী হিনমানি

ঝুমুর

সীতাকে ছাড়তে হবে মনে লাগে ব্যাথা
কেমনে ছাড়ব আমি আমার লক্ষী সীতা
স্বামী স্ত্রী হয়েছি, ব্রহ্ম সাক্ষী রেখেছি
তারে আমি মিথিলা থেকে লক্ষ্মীজ্ঞানে এনেছি

কওক- রাম চন্দ্র সিংহাসন আচগই ভাবেখা কিন্তু বিধিনি অপূর্ব্ব খণ্ডায় মানয়া।

টীকা- রাম সিংহাসনে বসে ভাবছে যে আর বুঝি বিধির খণ্ডন হবে না

রাচামুং

বাখা দায় রাম চন্দ্র ভাবেয় নায়খা
বাইতিং বিধি ইঁ ধর্মনি সুয়ই রলাংখা
বিধি ব্রহ্ম সুইমানি যে মিসা অংয়া কং
সীতা সতী দুঃখ মানি কপাল তংফং
দশরথ বাহাজক বুমুং হেমলতা
দুঃখ রনায় হেমলতা সুইজাক বিধাতা

গান

রামচন্দ্র একা বসে ভাবছে মনে মনে
হায়রে বিধি তুমি মোরে কি করলে
ব্রহ্মবিধি লিখেছে মিথ্যে যে তা নয়
সীতা সতি তাইতো দুখ পায়
দশরথের কন্যা তার নাম হেমলতা
দুঃখ কেন দিল তারে ওহে বিধাতা

ঝুমুর

বলংগসে রগইনায় তপোবন মাতংনায়
লব কুশ আচায়নায় বাল্মিকীব হিলাজাকনায়

ঝুমুর

তারে তপোবনে বনবাসে দিবো
লব কুশ জন্ম হবে বাল্মিকীর হেফাজতে

কওক- দশরথ রাজানি দাসী দুর্ম্মুখ হিনয় বুমুং তংনায় বাখা কাবা সীতা যখন রাজানি বুখুই রাণী অংগন আইফুগ আনি কক কোন মূল্য তংগালাক সীতা ন যে কোন মতে রাম বাই সাকাক থায় কার আরাই হিনয় বাখা কাগই দশরথ রাজানি বাহাজক হেমলতান সাগই রবা নবচই সীতা নখা তালবানি অকনাং কিসিপদায় রাবননি মূর্তি সুইয়ই ফুনুকদি হিনয় নুং হিনদি নন দুঃখ রমানি আং বন লাঠিরনানি রাবন মূর্তি সুইয়ই ফুনুক খাই অকিসিপন নুং সীতা মুকতুরুই থাংকালাই বাখাগ বগই ফাইদি।

টীকা- রাজা দশরথের দাসী দুর্ম্মুখ রাজার কন্যা হেমলতাকে কুবুদ্ধি দিয়ে সীতাকে ফাঁদে ফেলে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। সীতাকে হাত পাখায় রাবণের মূর্তি এঁকে দেখাতে বলবে। সীতা হাত পাখায় রাবণের মূর্তি আঁকবে। পরে সীতা ঘুমালে রাবনের ছবি সংবলিত হাত পাখাটি সীতার বুকের উপর রেখে দেওয়ার ফন্দি করলো।

www.pathagar.com

রাচামুং
কিসিপ লাগই হেমলতা আখলই থাংকা
বাখা চায় দুর্মুখ নাইসিংয়ই তংখা
আবই নুংযে অকারা বাচইয়া মাকারা
বাচাদি বাচয়ই তমই নুং থুকা

গান
পাখা নিয়ে হেমলতা বের হয়ে গেল
কু বুদ্ধি নিয়ে দুর্মুখ অপেক্ষায় থাকল
ওগো দিদি তুমি মোর মায়ের মতন
জেগে ওঠো কেন তুমি এত ঘুমালে

ঝুমুর
নুংলাই সাক পায়ান, সাল তমই যুগন
বাচাদি বাচইয়ই, তাখুক কারা বুখুইয়ই

ঝুমুর
তুমি গর্ভবতি এখন, বেলা হয়েছে দেখ
জেঠো বৌদি গো, ওগো বড় দিদি গো

কওক- হেমলতা সীতা ন রিংসন খাই সীতা থুমানি বাচাখা। তামা নানি ফাইলাং হিনয় সুংখা

টীকা- হেমলতার ডাকে সীতা জেগে ওঠল। কেন এলে জানতে চাইলেন

রাচামুং
তামানানি ফাইলাং ববই নুং সাদি আন
অযুধ্যানি খবর সাদি গাম কুরুং ন
নকন কাগই আংলাই তংখা বনবাস দায়
মুংসা ককন ছিজালিয়া সুইজাক কপাল
কাপতই কাপতই সীতা সতী ককন সালাইকা
হেমলতা ফাইমানি ন সাগই বুজক খা

গান
কেন তুমি এলে দিদি বল তো দেখি
অযুধ্যার খবর কেমন সবই ভাল তো
আমি যে বাড়ী ছেড়ে আজ বনবাসে
কোন কিছু জানিনা আজ কপালের দুষে
কেঁদে কেঁদে এসব কথা সীতা জানতে চায়
কেন এল হেমলতা বুঝাইল তায়

ঝুমুর
যত ককন সালাইকা, কিসিপনযে য়াগাইখা
রাবন মূর্তি ফুনুকদি, বন লাঠি রসিদি

ঝুমুর
সব কথা হল যে, হাত পাখাটি দিল
রাবণমূর্তি আঁকা ছিল, তাই সীতা কে দিল

কওক- হেমলতা সীতা ন হিনবা আবই নুং আনি আমা বাই বাকসা রাবন নন খগই তিলাংগই অনেক দুঃখ রখা বিনি মূর্তি ন আন রদি। বন আং ওয়াইসা লাঠি রনানি।

টীকা- হেমলতা সীতাকে বলে যে রাবণ তোমাকে হরণ করে কষ্ট দিয়েছে। তাই রাবণ মূর্তি সংবলিত হাত পাখাটি আমায় দাও। আমি ঐ মূর্তিতে লাথি মেরে প্রতিশোধ নেবো।

রাচামুং
দুষ্ট রাবন নন খগই লঙ্কা তিলাংখা
পাংখাইন বফাং বলং দায় নন তনয়খা
দুষ্ট রাবন প্রতি মূর্তি কিসিপ-ব সুইদি
ওয়াই লাঠি রনায় নাইয়ই নুং তংদি

গান
রাবণ তোমায় হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেল
পাংখাইন বনে নিয়ে তোমায় রেখে দিল
দুষ্ট রাবণের মূর্তি হাত পাখায় আঁকো
ঐ ছবিতে লাথি দিব তাকিয়ে দেখো

www.pathagar.com

ঝুমুর
বন লাঠি আং রনায়, বুখুলুক সে সাবাইনায়
বাহামজক ন ব রমনায়, য়াপাই বাই সে জারক নায়

কওক- সীতা হেমলতা ন হিনবা নুং তামা ককন সালাং রাবননি বুমুং খানাকাইসে আনি বাসাক সাকচেরেমা কাগ দশ মাসে লঙ্কা পুরীগ তংখা আং কোন দিন রাবন মাখাং তিসাগই নায়জাকয়া এবং আন রমই তিলাং ফুগ-ব আং বন মাখাং তিসাগই নায়জাকয়া।

ঝুমুর
তার বুকের উপর পা দিয়ে পাঁজর ভাঙ্গাবো
দুঃচরিত্র রাবণকে, পায়ে পিছে মারতে হবে

টীকা- হেমলতাকে সীতা বলে যে, রাবণের নাম শুনলেই রেগে আমার গা গরম হয়ে যায়। সে যখন আমাকে হরণ করে নিয়ে যায় তখন আমি তার মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাইনি আর যখন দশ মাস ধরে লঙ্কায় রেখেছিল তখনও আমি তার দিকে তাকাইনি।

বিবেক রাচামুং
স্বয়ং লক্ষী সীতা সতী, সত্য ককন মতি অংদি
কক মিসা বাই ভুলাই জাগই সত্য ককন তা পালকদি।
বাখা চায়া বরক হিনয়, চিবুক সুকতই কুলায় সুকলায়
বলায় নন সুগই সিনায় নুংসে বন নায়ই তংদি।
বাসুক দুঃখ নুংলাই মানখা, আর দুঃখ নিনি ফাইকা
দুঃখ দশা মুর অংনায়তই প্রভু নসে রিং সিদি।
তত্ত্ব মতে নায়ই নাইথায় প্রকৃতি ন দুঃখ রথায়
প্রকৃতি ন দুঃখ রগই আত্মা উদ্ধার খায়সিদি
গোঁসাই বলং সাকা কিয়া বরক বন পাইতক লিয়া
গুরু ককন চিত্ত সুইকা বুঝিয়ই নাইদি।

সীতা পালক জাকনায় যে ককমুংন, বন তমই নং তিসান
হাদ্য খায় হেমলতা নন
দশ মাসে কাগই থাংকা, লঙ্কা দায় আংব তংখা
বাইতিং জাইতি ছিনিয়া রাবন
দশ ইন্দ্রিয় রাবন হিন, সীতান প্রকৃতি হিন
প্রকৃতিন দুঃখ মানতই চিত্ত সুইজাক ন

বিবেকের গান
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা সতী, সত্য কথা বলে মতি
মিথ্যা কথায় মুগ্ধ হয়ে সত্যকে ভুলনা
দুষ্ট মানুষ হয়ে কভু, সর্প মত দংশন করবে
সে তোমাকে করবে ক্ষতি, তুমি কিন্তু সচেতন থেকো
কত দুঃখ পেয়েছো তুমি, আর কতযে হবে
দুঃখ দশা পার পাওয়ার প্রভু পানে প্রার্থনা করো
তত্ত্ব মতে দেখলে প্রকৃতিকে দুঃখ দিয়ে
প্রকৃতিকে ভর করে আত্মা করতে হবে
শ্রী গুরু বলংরায় বলে, যদিও মানুষ বোঝেনা
গুরু বাক্য আমি চিত্ত সবাইকে জানাই

যে কথা সীতা আজ ভুলিবার চায়, কেন তুমি সেটা বল
হেমলতা এমন কথা
সুদীর্ঘ দশ মাসে, যে লঙ্কায় আমি ছিলাম
দেখিনাই কেমন সে রাবণ
দশ ইন্দ্রিয় রাবণ বলে, সীতাকে প্রকৃতি বলে
প্রকৃতি যে দুখে আছে, চিত্ত জেনেছে

ঝুমুর
রাইতিং জাইতি রাবন, বন তমই ছিনি ন
মাখাং তিসাগই আং নায়া, বাইতিং মূর্তি ছিনিয়া

ঝুমুর
কেমন দেখতে রাবণ, আমি দেখি নি
তার পানে তাকাইনি, কেমনে তার মূর্তি আঁকি

www.pathagar.com

কওক- হেমলতা হিনবা নন বাখানায় রমই লঙ্কাগ তিলাংফুগ বন আইফুগ নুং কিসাফুং নুংয়া বদই।

টীকা- হেমলতা সীতাকে জিজ্ঞেস করে তোমায় যখন রাবণ হরণ করে নিয়ে যায়, তখন তুমি কি তার চেহারা একটুও দেখতে পাওনি?

রাচামুং

বাখা দায় মগ্ন ককতই খাইলাংখা আন
দুঃখ দশা আং মানমানি সুংরাং ককমুং ন
নুংব সুংখা সাতাই অংখা দুঃখনি ককন
সুইয়ই রন কিসিপ দায় রাবন মুক্তি ন

গান

বুকের মধ্যে বজ্রপাত লাগল আমার
আমার কষ্টের কথা ভাবতে হবে আবার
আজ তুমি বারে বারে কেন জিগাইলি
হাত পাখা দাও আমি এঁকে দেখাচ্ছি

ঝুমুর

আংব সান খানাদি, মতি খাইয়ই নুং লাদি
রাবণ রাজা মূর্তি-ন, কিসিপ দায় সুইয়-ন

ঝুমুর

বলছি আমি শোন, মনোযোগ দাও
রাবণের মূর্তি আজি হাত পাখাতে

কওক- সীতা সাবা পরংজালা লক্ষণ ইন্দ্রজিৎ-ন নিকুন্তলা যজ্ঞ খাইফু-গ কগই বুখালই সিকা। ইন্দ্রজিৎ থুইকালাই রাবণ পুত্র শোকে দায় আন তানই সিনানি হিনই ফাইকালায় তৈদায় বিনি মূর্তি কিয়াসা নুংমানি বন নন কিসিপ দায় সুইয়ই ফুনুক-ন।

টীকা- সীতা জানায় যে, নিকুন্তলা যজ্ঞের সময় লক্ষণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করে। ইন্দ্রজিৎ এর মৃত্যুসংবাদে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে কেটে ফেলার জন্য দা নিয়ে চলে এলে আমি তার চেহারার প্রতিবিম্ব পানিতে দেখতে পেয়েছিলাম। ঐ চেহারা আমি তোমাকে এঁকে দেখাবো

রাচামুং

খর্গ য়াক লাগই, আন তাননি হিনই
রাবন আখলই ফাইকা
কিরিসিং চা মূর্তি, রাবননি আকৃতি
নুংগই আং কিরি খা
কিসিপ সুইয়-ন, নন ফুনুক-ন
নুংখায় নুং কিরিনাই অংখা
আরাই হিনই সাকা, কিসিপ-গ সুইলাংখা
বিরক-ব কিরিয়ই খালকা
বিরক কিরিয়ই, খালই থাংবাইগই
সীতা-ব মুকতুরুই থাংকা
বাইতিং বিধাতা, সুইয়ই রলাংখা
সীতানি দুঃখ-ব ফাইকা
মাখাং রি-ফুংগই, মুকতুরুই থাংগই
চেতের মানয়াগই তংখা

গান

খড়গ হাতে নিয়ে, আমায় বধ করবে বলে
রাবণ এসেছে চলে
কী ভয়ানক মূর্তি, রাবণের আকৃতি
ভীষণ ভয় পাই আমি
হাত পাখায় আঁকছি, চেয়ে'দেখ তুমি
তুমিও পাবে ভয় তা দেখে
এই কথা বলে, হাত পাখায় এঁকে
তা দেখে পালায় সকলে
মেয়েরা পালাল, সকলে ভয় পেল
সীতা ঘুমিয়ে পড়ে
হায় বিধাতা, কি লিখলে তা
সীতার দুঃখের কারণ
কাপড়ে মুখ ডেকে, সীতা ঘুমে পড়ে
গভীর ঘুম হলো তার

www.pathagar.com

কিসিপ-ব সুইজাক-ন, রাবননি মূর্তি-ন
বাখাগ বকসনয় থাংকা
বাখা কুটিলতা, নানক হেমলতা
থাংগই বাতা-ন সাকা
দায়ই নায়ই দি, বাচই-ন সুমচাদি
বাচই লাই থুগইসে তংখা

হাত পাখায় আঁকা, রাবণমূর্তিটা
বুকে রেখে দিল তারা
কুটিল হৃদয়ে, হেমলতা গিয়ে
ভাইকে গিয়ে বলে এল
দাদাগো তুমি, জাগিয়ে তোলো
বৌদি যে গভীর ঘুমে

ঝুমুর

বিরক সাক পায়া-ন, তমই সাল থুগ-ন
বাইতিং জাইতি থুজাক-ন, নুং-ব থাংকায় নুংগ-ন
বিরক সাল' থুকায়ন, বামানয়া অংগন

কওক- হেমলতা দুর্ম্মুখনি দুষ্ট বুদ্ধিন খানাগই সীতা-ন দুঃখ রনানি বাগই কুচক্রান্ত খাইয়ই কিসিপ-গ সুইজাক রাবন মূর্তি-ন সীতানি বাখাগ বকগই কালাংগই রামন সাগই খা হেমলতা নি ককবাই রাম সীতা-ন নায়নি ফাইকা।

ঝুমুর

গর্ভবতী নারী, এত কি ঘুমাতে পারে
কী যে ঘুম তার, তুমি দেখ গিয়ে
দিনে বেলায় ঘুমে যে, কষ্ট পাবে প্রসবে

টীকা- দুম্মুর্খে কু-বুদ্ধিতে হেমলতা সীতার বুকে রাবণের মূর্তিযুক্ত হাত পাখা রেখে তার ভাই রামকে ডেকে এনে সীতাকে ঘুম থেকে জাগার জন্য অনুরোধ করে।

রাচামুং

সীতানি কক হেমলতা রাম-ন সাগইকা
সীতা তামা খাইয়ই তং রাম নায়নি ফাইকা
রাম চন্দ্র ফাইয়ই নংখা সীতালাই থুজাকা
রাবন মূর্তি কিসিপদায় বাখাগ বকজাক
সীতা সীতা হিনয় রাম রিংয়ই সুমচাখা
চেতের মানয় সীতাব বাচাগই ফাইকা

গান

সীতার ঘুমের কথা রামকে বলে হেমলতা
রাম এল জানতে তবে কেমন আছে সীতা
রাম দেখে সীতা তার আছে ঘুমিয়ে
রাবণমূর্তি হাত পাখাটি বুকের মাঝে নিয়ে
সীতা সীতা বলে রাম জাগাল এবার
তার ডাকে ঘুম থেকে সীতা জেগে উঠে

ঝুমুর

তামা নিনি আকলব, তামা বাখা বকজাক-ব
শত্রুনি যে মূর্তি-ন, তমই বাখা নুং বক-ন
আসুক অংন সিয়া-ন, তমই যুদ্ধ আংখায়-ন
তামা নিনি আকলজা, রাবন নদই হামজাকজা

কওক- রাম সীতা-ন বাখাগ রাবন মূর্তিন বকজাক নুঙখালায় পূর্ব্বনি কক্ন ওয়ানসুগই কাপখা।

ঝুমুর

কী ব্যাপার বলো, বুকে কারে রাখো
শত্রু মূর্তিটাকে, কেন রাখ বুকে
এমন যে হলো তুমি, কেন যুদ্ধে যাবো আমি
তোমাকে আজ চিনলাম, রাবণ প্রেমে দেখলাম

টীকা- সীতার বুকে রাবণের মূর্তিযুক্ত হাত পাখা দেখে রাম কষ্ট পায়

www.pathagar.com

রাচামুং
ফানি বাক্য পালকনানি, বন বসগ থাংজামানি
উদুংদায় নন লাজাগই
আসুক অংন আং সিকালাই, তমই যুদ্ধ আং-
রলাইথায়
মাখরানা উদুংগ লাগই
ফয়ং লক্ষণ যুদ্ধ রখা, শক্তি শেল ব কালাইখা
নন উদ্ধার খায় নানি বাগই

গান
পিতৃবাক্য রক্ষায়, বনবাসে চলে যায়
সাথে নিয়ে গেছি তোরে
তুমি যে হবে এমন, কেন করব যুদ্ধ
বানর সৈন্য সাথে নিয়ে
অনুজ লক্ষ্মণ আজ যুদ্ধে শক্তিশেল বিঁধে
এসেছি তোমায় উদ্ধারে

ঝুমুর
নিনি ইচ্ছা অংসিদি, বর থাংনায় থাংসিদি
নন তন মান গালাকখা, বরক দুর্নাম খাইলাংকা

ঝুমুর
তোমার যেথা ইচ্ছা চলে যেও সেথা
তোমায় আর রাখবো না, বদনাম শুনবো না

কওক- রাম চন্দ্র আরাই হিনয় সীতান হিনকালাই সীতা রামনি য়াপাই রমই কাপখা।

টীকা- রাম সীতাকে এ কথা বললে সীতা রামের পায়ে পড়ে ক্রন্দন করতে থাকে

রাচামুং
সীতা রামন নুংগই, থুয়ামনি বাচাগই
য়াপাই রমজাগই কাপখা
খানাদি যে নাথ, ইঁ ককনি অর্থ
নাহানক চক্রান্ত খাইকা
রাবননি মূর্তিন, কিসিপব সুইজাকন
আনি বাখাগ বকখা
মুকতুরুই থাংজাকন, তামা খাই সিচিন
বাইফুগ বাখাগ বকখা

সঙ্গীত
রামকে দেখে সীতাদেবী, উঠিলেন বিছানা ছাড়ি
কাঁদেন শ্রীচরণ ধরি
শোন হে প্রভুনাথ, এই কথার মর্মার্থ
চক্রান্ত করে তোমার বোন
জ্বালাইয়াছে আমার মন
রাবনমূর্তি অঙ্কিত পাখা
আমার বুকে দিয়াছে তুলি
ঘুমাইয়া ছিলাম যখন আমি

ঝুমুর
আংলাই সামিং তাংমান, নিনি য়াপাই রমন
সর্ব্ব শালি আং চাথং, নরগ ফুং থাং সিথং
রাবন নলাই হামজাকয়া, বিনি মাখাং আং
নাইয়া

ঝুমুর
তোমার চরণ ধরি, হলফ করে বলতে পারি
সর্বনাশ হোক আমার, হইব আমি নরকবাসী
রাবণে নেই কোন মন, না করি তার মুখ
দরশন

কওক- সীতা রামনি য়াপাই রমই কাপমানি নুং খালাই ব কাপখা

টীকা: রামের চরণযুগল ধরে বিলাপ করে ক্রন্দন করতে দেখে তিনিও কাঁদতে লাগলেন।

রাচামুং
তাখুক কারা বাচই হিনয়, মাবাই বাকসা
আং অংজাকগই .
নিনি উদুং দায় আং বনবাস থাংগ
রাক্ষস রকবাই যুদ্ধ রখা, শক্তিশেল আং কালাইখা

গান
বড় ভাই বৌদি হয়ে, মাতৃসম মনে করে
তোমা সাথে বনবাসে আমি চলে আসি
রাক্ষস সাথে যুদ্ধ করে, শক্তি শেলে বিদ্ধ হয়ে
আমি যুদ্ধ করেছি তোমা উদ্ধারে

www.pathagar.com

নন উদ্ধার খাইনানি বাগই
তামা হিনই নক ওয়ালাইলাং, আংফুং তমই থুইয়া অংলাং
বর থাংতায় নুং আন সিগই
বলং বফাং পশু পক্ষী, নকব যত অংদি সাক্ষী
সীতা নকনি আখল কালায় আংব থুই না তই
খানা বাইদি মাতায়রক, বরন রদি আন নক
সীতা থাংকায় আংব থুইনা তই

তোরা কেন কর ঝগড়া করছ, মরে যাব তবে আমি
যেওনা গো বৌদি আমায় ফেলে
বনের সকল পশু পাখি, তোরা থেকো হয়ে সাক্ষী
সীতা চলে গেলে আমিও যাব মরে
দেব দেবী শোন সবে, দিও বর আমায় তবে
সীতা গেলে আমি যেন মরি

ঝুমুর
আমা সীতা সতীন, তমই বলং রগইন
ভাগ্য লক্ষী বচিনি, মিথিলানি তমানি

ঝুমুর
সতী মা সীতাকে, দিব কেন বনবাসে
ভাগ্যলক্ষী সে মোদের, মিথিলা থেকে এনেছে

কওক- রাম সুমন্ত সারথীন রথ সাজায়ই সীতাব বন বাসগ রগইদি হিনয় রিংখনকা

টীকা- রথ সাজিয়ে দিয়ে সারথী সুমন্তকে ডেকে রাম সীতাকে বনবাসে দিয়ে আসার জন্য বললেন

রাচামুং
সুমন্ত সুমন্ত হিনই রাম রিংখন কা
রিংখন মানি খানাগই সুমন্ত ফাইকা

গান
সুমন্ত সুমন্ত বলে রাম তারে ডাকে
রামের ডাকে সারথী সুমন্ত চলে আসে

ঝুমুর
তামানানি রিংখন জা, তামা সামুং নুং থলজা
ব জাগাগ থাংজাক নায়, তামা সামুং তাংজাকনায়

ঝুমুর
কেন ডাকলে মোরে, কোথা হবে যেতে
কী কাজ বল গো, কি কাজ আমি করবো

রাচামুং
রথ তদি রথ তদি হিনই রাম সাগই রখা
মকল মুকফ্রেসা দাইয় রধন সাজকখা
সুমন্ত সারথি লক্ষণ রথদায় কাখা
সীতা তংনায় নক সাকাংগ তিলাংগই থাংকা

গান
রথ আনো রথ আনো বলে উঠে রাম
পলকের মধ্যে রথ সাজিয়ে রাখল
সারথি সুমন্ত সাথে উঠেছে লক্ষণ
সীতার ঘরের পাশে নিয়ে গেল রথ

ঝুমুর
সীতা বকন কওক সুংখা, রথন তানি তবখা
তামা নানি রথ তব, নকন সব হুকুম র

ঝুমুর
সীতা জিজ্ঞাসিল তবে, কেন তোরা রথ এনেছে
রথ কেন এনেছে, কে কাকে বলেছে

কওক- সীতা লক্ষণ কক সুংকালাই লক্ষণ সীতা ন, কাপবই সাকা দাদানি হুকুমই আং নন তিলাং নানি রথ তবগ

টীকা- সীতার প্রশ্নের জবাবে লক্ষণ কেঁদে কেঁদে বলে যে, দাদার কথায় আমি তোমাকে নিয়ে যেতে রথ এনেছি।

রাচামুং
দাদানি হুকুমই, আং ফাইয় রথ তগই
মুনি পাড়াগ থাংনি
নুংলাই সাজাক ফুং, দাদা খানা ফুং
মুনি য়াক কুমুন চানি
মুনি মাই সুংখাই, বন নুং চাথায়
নন নগারাই খাইনি।
আই থানি আং ফাইয়, রথন তবগ
পুরকনি বাঞ্চান নিনি

গান
দাদার হুকুমে, এসেছি রথ নিয়ে
ঋষি আখড়ায় নিতে
দাদা জানিয়েছে, তুমি তাকে বলেছো
ঋষি আখড়ায় যাবে
ঋষির করা রান্না, তুমি খাবে সেথা
অতিথি হিসেবে।
তাই আমি এসেছি, রথটাকে এনেছি
মনের বাঞ্ছা পুরাতে।

ঝুমুর
রিনায় সিরা কানসিদি, দাকতুই রথ গ কাসিদি
মুনি পাড়া থাংনানি, তপোবন তংনানি

ঝুমুর
ভাল করে গুছিয়ে নাও, রথে গিয়ে উঠো
মুণি পাড়ায় চলে যাবো তপোবনের মাঝে

কওক- লক্ষণ সীতান আই হিনই সাকালাই সীতা বাসাই রামনি বাক্য পালগনি বাগই গয়না গাঁঠি কানয় বাচাখা

টীকা- সীতাকে লক্ষণ এ কথা বললে স্বামীর কথা রক্ষা করার জন্য গয়না ও নতুন কাপড় চোপড় পরে উঠলেন

রাচামুং
রাংচাক গয়না সীতা কানয়, রথ সাকাগ কসাগাই
আস্তে আস্তে রথ চলেখা
বিরক যত ফাইয়ই কাপখা, সীতা নব খুলুম লাইখা
তপোবন রথন তিলাংখা

গান
সোনার গয়না পড়ে সীতা উঠল গিয়ে রথে
রথ এবার চলতে শুরু করেছে
পাড়ার সকল ছেলে মেয়ে সীতার শোকে কেঁদে উঠে
তপোবনে গেল সীতা চলে

ঝুমুর
থুইয়ই থাংতই অংলাংখা, যত বিরক কাবইখা
বর আর নুংসিন, মা সীতা সতী-ন
সীতা দুঃখ মানথায়-ন, বিধাতাব সুইজাকন

ঝুমুর
সকল মানুষ কেঁদেছে, মরার মত লেগেছে
কবে আবার দেখা পাবো সীতার সনে
বিধাতার লেখায় যে সীতা দুখ পেয়েছে

কওক- বাখা দুঃখ লাগই লক্ষণ যত মাতাইরকন দুহায় রগই সাকা সীতা যখন বলংগ থংকায় আং লক্ষণ ব থুইনাতই। রথ সাকাগ সীতান তিলাংগই থাংকালায় কদুর থাংতই থাংতই সীতা লক্ষণন সাবা আনি য়াগারা মকল ফ-র য়াকসি খুসুইন বা-ল নিশ্চয় অযুধ্যাগ কোন অমঙ্গল ঘটেখানা।

টীকা- লক্ষণ মনে কষ্ট পেয়ে বলেন ইশ্বরের দোহায় সীতা বনাবাসে যাওয়ার পর যেন আমার মৃত্যু হয়। রথে করে কিছু দূর গেলে সীতা লক্ষণ কে বলে- আমার চোখের মণি কেন যেন কাঁপছে। মনে হয় অযুধ্যায় কিছু অমঙ্গল ঘটেছে।

www.pathagar.com

বলংরায় সন্ন্যাসীর লেখা বাংলা আধ্যাত্মিক সংগীত: ধর্ম্মের ভক্তিতত্ত

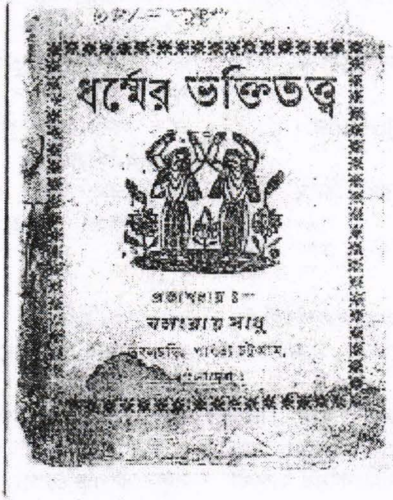

॥ ওঁ নমঃ ॥

১

হরি নাম সত্য, গুরু নাম সত্য,
সত্যদেব নিরঞ্জন।
গুরু বাক্য সদায় সত্য, সত্যমেব পরম পদ ॥
মাতা গুরু, পিতা গুরু, গুরু শ্রেষ্ঠ ভাই।
তাহার থেকে অধিক গুরু ভজিলে সে পায় ॥
শ্রীগুরুর পরম পদ বন্দনা করিব।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দনা করিব ॥
আদ্ধ্যশক্তি মহামায়া বন্দনা করিব।
ব্রহ্মাময়ী সনাতন বন্দনা করিব ॥
মহামায়া ভগবতী বন্দনা করিব।
মায়াজালে বন্ধ হইল গুরু বিষ্ণু না চিনিল।
এই কুল আর ঐ কুল বৃথা জনম হইল।
বন্দনা করিব ॥

২

ভক্তগণ করি নমস্কার,
অপরাধ ক্ষমা কর বলি বারবার ॥
দয়া করে ভক্তগণ ক্ষমিবে আমাকে,
অনাথের নাথ তুমি পদ ছায়া দিবে ॥

www.pathagar.com

জগত মাতা জগত পিতা শুন ভক্তগণ,
ইহকাল পরকাল দাও শ্রীচরণ ॥
স্ত্রী পুত্র, ধনে জনে মনে নাহি হয়,
শ্রীগুরু পরম পদ দাও হে আমায় ॥
শ্রীগুরু কৃপা হলে ত্রিভুবন জয়ী করে,
ভবের বন্ধন পার হইয়া যাই ॥
কর্ম্ম অন্বেষণ কর, ষোল আনা কর্ম্ম কর,
মায়া জাল হতে পাইবে নিস্তার ॥

৩
অসার সংসার মাঝে আশা ছিল মনে।
সঙ্গ দোষে ভঙ্গ হলো বাঁচিব কেমনে ॥
অসৎ পথ পরিত্যাগ কর বলি বারবার।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া দেখ যাবে না মনের আঁধার ॥
যে প্রকারে চেষ্টা কর শান্তি হইবার।
গুরু বস্তু ডুবে গেলে পাবে নারে আর ॥
গয়া গঙ্গা, কাশী প্রয়াগ মহা তীর্থ ছিল।
অচেতনে মানব দেহ ধলিয়া পড়িল ॥
এ কারণে ভক্তগণ বলিয়াছে তাতে।
বিশ্বাস ভক্তি আত্মার মধ্যে দেখ সত্য বটে ॥
শ্রীগুরুর রাতুল চরণ মনে হয় না যার।
সেই কারণে জন্ম মৃত্যু হয় বারবার ॥
চিন্তা করে সবে দেখ গুরু কিবা ধন।
না জানিলে গুরুর কারণ হইবে পতন ॥
এক চিত্ত এক মন কর বারবার।
দুর্লভ মানব তুমি হইবে একবার ॥
গুরুর বাক্য সত্য মতে পালন করিতে পারে।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল দংশিতে না পারে ॥
কুল রক্ষা জাতি রক্ষা কি মতে হইবে।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হলে তাহা পাবে ॥

৪
মাতাপিতা না চিনিলি, দেবাদেবী না মানিলি।
পাষন্ড মানব যত হবে সর্ব্বনাশ ॥
আঁধার ঘরে মানিক হবে,
জ্ঞানে বাতি জ্বালো না।
অন্ধকার রবে না।

www.pathagar.com

ভবের বন্ধন পাইব নিস্তার।
হরিনাম কর সার।
নাম শুনে ভাই মুক্ত হবো।
বন্দনা করিব ॥
মায়া মোহকাল যথাদি, ঘুরিতেছে নিতিনিতি।
কৃষিকিন্তু হইবে একবার, হরিনাম কর সার ॥
মাতৃ গর্ভে যত ছিল, অবিরত নাম করিল।
ভুলিয়াছে মায়ের আঁধার, গুরু ভজন কর না ॥
গুরু কৃপা হলে পরে, মুক্ষ পদ পাবে তাতে।
এই ভব সাগরে পাইবে নিস্তার,
হরি নাম কর সার।
জন্ম জন্ম পাইব, অন্ধকার ঘুচাব।
বন্দনা করিব ॥
নামামৃত কর বারংবার, হরিনাম কর সার ॥

৫
সাধু সংঘ কর ভাই দেখ এই বার।
সাধু গুরুর চরণ পাইবে একবার ॥
দেখ অধম বলংরায় জানাই তোমায়।
দেহের বায়ু যাবার সময় কি হইবে উপায় ॥
আত্মা রাম পরম আত্মা ছাড়িয়া যাইব।
সে সময়ে মানব দেহ মাটিতে মিশাইব ॥
অকুল সমুদ্র মাঝে ডুবিয়া যাইব।
দুর্লভ মানব দেহে জন্ম আর না হইব।
গুরুর চরণ করা সার
যাইবে মনেরই আন্ধার।
মায়ামোহ হইবে পতন
পড়িয়াছে মায়া জালে।
ঘুরিতেছে অন্ধকারে
কি মতে হইবে ভবপার।
সত্যবাদী হলে পরে
অনায়াসে পাবে তারে।
এই ত্রিভুবনে করিব বিজয়
রাতুল চরণ পাইব ॥
শ্রীচরণে তোমায় বন্দনা করিব।
ঘোর অন্ধকার কলিযুগ
অচিন আসিবে রোগ।
আপনি আপনা মায়া ছাড়িয়া যাইবে
হরিনাম কর সার ॥

www.pathagar.com

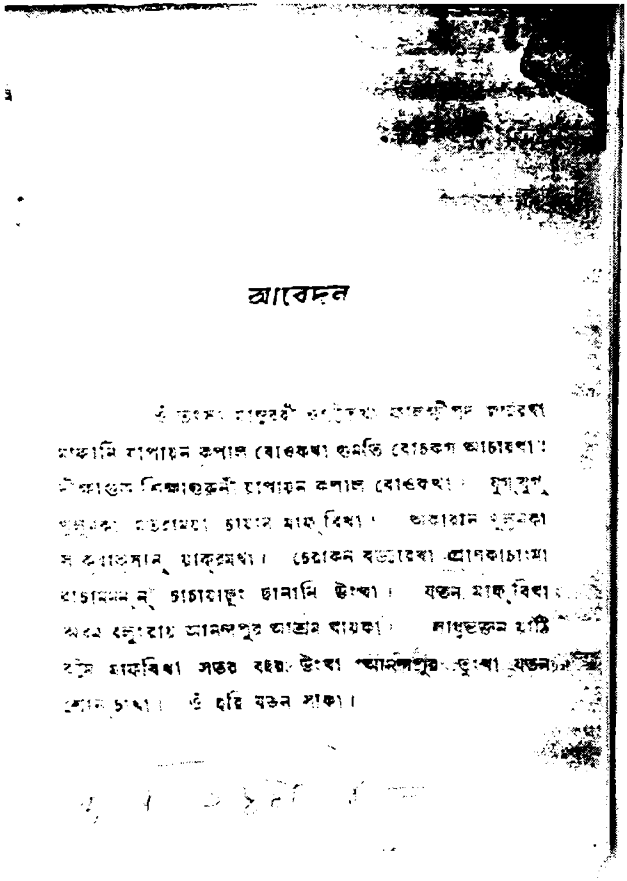
আবেদন

এই বই কভারসহ পাওয়া যায়নি। তাই নমুনা হিসেবে ভিতরের একটি পাতা দেখানো হলো।

ওঁ শ্রী গুরুর বন্দনা
প্রাণকাচাং মা ত্রিপুরা
আবেদন

ওঁ তৎসং মালক্ষ্মী ওগতৈখা ফালক্ষী পদ জন্মরখা
মায়ানি য়াপায়ন কপাল বোওকথা
গুমতি বোচকগ আচায়খা
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুনী য়াপায়ন কপাল বোওকথা।
যুগ্‌যুগ্‌ খুলুমকা যতহাময়া চায়ান মাফ্‌ বিখা।
অকারান খুলুমক্য সাক্‌বাক্‌সান য়াক্‌রমখা।

চেরকন বড্ডারখা প্রাণকাচাংমা রাচামমন্ ন্
চাচায়ায়াফুং ছানানি উংখা।
যতন মাফ্ বিখা অধম বলংরায়
আনন্দপুর আশ্রম খায়কা।
সাধুভক্তন য়াঠি রমৈ মাফবিখা
সত্তর বছর উংখা আনন্দপুর তুংখা
যতন শোন্ চাখা। ওঁ হরি যতন সাকা।

•

প্রকাশকাল: ১৯৭৮ সন
সংকলক: শংকর চন্দ্র ত্রিপুরা
মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।

বাংলা ভাবার্থ

ও তৎসৎ মা লক্ষ্মী গর্ভে ধারণ করলো। পিতাশ্রী জন্ম দিলো। মায়ের চরণযুগল তাই কপালে নিলাম। গুমতির শেষ সীমানায় জন্ম আমার। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু সকলকে প্রণাম জানাই। সকলকে প্রণাম জানাই। ভুলত্রুটির ক্ষমা চাই। গুরুজনদের চরণ ধরি সমবয়সীদের হাত ধরি। প্রাণকাচাংমা গান শুরুর আগে কনিষ্ঠদের বর দিই। ভালোমন্দ সাহস করে শুরু করছি এই গান। ক্ষমা চাই এই অধম বলংরায়। আনন্দপুরে আশ্রম গেড়েছি। আনন্দপুরেই সত্তর পূরণ করেছি। অচেতনদের জাগিয়েছি, হরিনাম বিলিয়েছি।

গুরু বন্দনা

(১নং গান)
গুরুনি য়াপায়ন রমৈ কচই তুংদি শালবাই হরবাই
বতৈ গরর্জা করই আর
ভাবি নায়দিই সংসার
বাখা বাখা ভাবি ঐ নাই,
থানায় ফায়নাই সাগ তুংগ,
পালোক জাগখা যতব,
যেরম মানি য়াকতা হলদি
বছরনী মাই শোক নানিখায়।
গুরু গুরু যত হিংকা
গুরুতামা বাথাই উংখা,
অবাথায়ন সুংশন থালায় আবঠুয় গালাক ভবেয় নাই ॥
মানিওকনি অখাই ফাইকা,
যতব গুরুন রিংখা,

রিংঅয়ব ঐ হিংরা থালায় ভবেনী
পাইশোকখা নাই
অধম বুলুংরায়ব সাখা,
সানাই ককন পালোক জাগখা
সানাই ককন বাখা দয়ই ভাবান লামসোই কুফুংখা নাই।

বাংলা ভাবার্থ

শ্রী গুরুর চরণ তলে বসে থেকো দিবারাত্রি। এর চেয়ে বড় কিছু নাই। ভেবে দেখো এ সংসারে। মনে মনে চিন্তা করো। যাওয়া আসা ব্যথা আছে। ভুলে গেছো আজি সবে। যেই ধরেছো আর ছেড়ো না। থাকতে যদি চাও সুখে গুরু গুরু সদাই বলো। গুরুভক্তির কি ফল তা জেনো। সে ফলকে জানলে ভাই আর হবে না শেষ এ ভবে। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে যে করেছে গুরুর সেবা। সেই তো বুঝে গুরুর মহিমা। গুরু যদি না দেয় সাড়া, ভবের জনম সব যে বৃথা। আমি অধম বলংরায়, গুরুর কথা সব ভুলে যাই। গুরুর কথা ভুলে গিয়ে ভবের রাস্তা হারিয়েছি।

দেবী বন্দনা

(২নং গান)
আমানাশে সিয় সিদ্ধি বিদ্যা অবিদ্যান বিদ্যা প্রকাশ খালায়ছি।
শালবাই হরবাই ননরিংঅ, রিংঅয়ব ঐ হিঁয়াতুংগ,
বাসান নং দয়া উংগয় অপরাদন ক্ষমা খায়দি।
স্বতগুণবাই নংসেতৈমা,
রজগুণবাই নংসে হরমা তমগুণবাই জাংগালাংমা নং
য়াপায়ণ কপালবদি।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, যুগে যুগে নংসে কালী,
কৃষ্ণ উংগয় সুমুলসুবয় বিরাকন বাণী খানাইদি।
তালশাল উংগয় গুরাইতুংখা শাকনী সাক্ তৈ থাংগফায়,
আবোকরগই ইঅধমন বাখাগ সচাগয় তুনদি।
য়াকশী য়াকগ্রা থানাই হিনাই বাচায় তচাগয় তননাই,
নাইতালিগা বলংরায়ন য়াপায়ন কপাল রদি।

বাংলা ভাবার্থ

মাকে জানি সিদ্ধি বিদ্যা সে বিদ্যাকে প্রকাশ করো। দিবারাত্রি তোমায় ডাকি। সাড়া দাওনা কেন তুমি? সন্তানকে দয়া করে আমায় তুমি করো ক্ষমা। স্বতগুণে তুমি গঙ্গা মা, রজ গুণে তুমি অগ্নি মা তম গুণে রুদ্র মূর্তি মা। তোমার চরণ আমার কপালে দিও। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, যুগে যুগে তুমি কালী। কৃষ্ণ হয়ে বাঁশির সুরে বাণী শোনাও তুমি। চন্দ্র সূর্য হয়ে তুমি স্বীয় মানবদেহের মাঝে বিচরণ করো তুমি। স্তন দিয়ে এই অধমকে বুকে আগলে রেখো। সবদিকে পাঠাও তুমি মাঝখানে রাখো তুমি। দেখে রেখো বলংরায়কে মোর কপালে দাও চরণ।

www.pathagar.com

শ্যামা আরতি

(৩নং গান)

যুগখুলুমকা মা ত্রিভঙ্গি ভঙ্গিমা শ্যামা ॥
ই অধমন দু:খরগই আরবা ফলতামা।
ঠংতয় ঠংতয় পালোকযাগখা,
শালথামানী সিদিয়া বাখা,
আংসিয়াফুং নংলেসিয় বামসা ফায়দি মা।
শালঠাংচগয় সন্ধ্যা উংখা,
কাবনানী রংদিয়া তুংখা,
ওগতয়খা চাংগচুখা, বামসা ফায়দি মা।
হরাই খালায় কারিমানী,
শালঠাংবখা আচোকমানী,
লিখামসাকা আচোকমায়া ছচাফায়দি মা ॥
ঠুংগয় তুংনাই চালায় বাকছা,
যানীযেফারী থাংকা খাকচা,
নাইনুংয়া রমৈমীয়া বজাং থালাং মা।
হানি অধম বলংরায়ব,
য়াপায় রমৈ ননতংগ,
বিনি ককবাই নন রিংঅ বামই লাফায় মা

বাংলা ভাবার্থ

প্রণাম করি ত্রিভঙ্গি মা শ্যামা । এই অধমকে দুঃখ দিয়ে কি ফল তোমার মা? খেলায় মজিয়া আমি সব গেছিনু ভুলিয়া। বেলা যে গেল চলিয়া। তাই বলে তো তুমি জানো, আমায় তুমি কোলে তোল। বেলা শেষে হল যে সন্ধ্যা। ভুলে গেছি কাঁদতে আমি। তুমি মোরে জন্ম দিলে এবার কোলে নাও তুলো। সেই যে ভোরে আনলে তুমি। বসে আছি আজও আমি। ক্লান্ত হয়েছি আমি তুলে আমায় তুলে নাও মা। আমার খেলার সাথি। যে যার পানে গেল চলি। অদৃশ্য মাগো তুমি কোথায় লুকালে। আমি অধম বলং রায়, তোমার চরণে চেয়ে ক্ষণ কাটাই। আমি শুধু তোমায় চিনি চরণ দিও মা।

সন্ধ্যা আরতি

(৪ নং গান)

শালঠাঁকা সন্ধ্যাউংখা ফাই আমা ফায়।
শালবনংসে হরবনংসে আরকবৈ উপায় ।
য়াককোনৈন্ জুরখালায়কা,
বাসাকন হগলইরখা আরকরৈখা নাই,
সন্ধ্যানী সময় নাইয়, ভক্তসাধু ননরিংঅ,
য়াপায়ন কপাল বাগয় আচোগয় তুংফায়।

www.pathagar.com

দ্রৌপদীন লাংতি খায়কা,
রিনাইউংগয় কাফায় তুংখা ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠীর স্বর্গঅ হলকা নাই।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,
যুগে যুগে তুংগহরি, হরিন বরমানন
বামংতরখা নাই।
মনিঋষি ননরিংখা ঠুমানী বাচায়া তুংখা,
ভৃগুমুনি লাঠিরগয় বাখা ঠুপ কানাই।
হানি অধম বলংরায় সিয়াননং শিরফায়,
ইসময় ফাইয়া গুরু নি দুহায়।

বাংলা ভাবার্থ

বেলা গেল সন্ধ্যা হল মাগো তুমি কই? দিবারাত্রি শুধু তুমি নাইরে আমার কেহ নাই। হাত দুটি জোড় করে মা এই দেহ মন সব তোমায় দিলাম। এ সন্ধ্যা সময়ে, ভক্ত আমি তোমায় ডাকি। তোমার চরণ আমার মাথায় দাও। দ্রৌপদির বস্ত্র হরণকালে। বসন হয়ে তুমি এলে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিলে তুমি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। যুগে যুগে তুমি হরি। হরি নামের চেয়ে যে আর বড়ো কিছু নাই। মুণি ঋষি তোমায় ডাকে। তুমি আছো যেন ঘুমের ঘোরে। ভৃগুমুণি বুকে তোমার দিয়েছে আঘাত। আমি অবুঝ বলংরায়, বুঝ দিওগো আমায়। বলছি আমি গুরুর দোহাই।

আত্মতত্ত্ব

(৫ নং গান)
খুলুমকা গোঁসাইরাতক খানাদি নাক কোঁকখোকচা সানানী উংখা ॥
সিতানী ছারায়মন নাংসয় ফাল্গুন নদীরানৈ ঠাংকা ॥
কোকমিষা সাগয়তুংখা, সাকনী আয়ুক উঁচজাগখা।
যুধিষ্ঠির মিষাসাগয় নরক নুংগয় স্বর্গ ঠাংখা ॥
বফাং বিড়িফাং সতানসাকা সাকা,
ভবেয় ঠৈলদিয়া নুংযাগয় তুংখা
বাখাঠিক খায়দি সত্যনসাদি মায়া নাইমানৈ মানজাকনাই উংখা ॥
সত্যবান নায়দি সত্যন তি ঐ বিনী বিড়ীব সাবিত্রী উংখা।
চিবোক শোকজাগয় বুঠারজাগ বরোক যমবাই ছালাঐ মাঠাংগয় তখা ॥
অধম বলংরায় রাজ্যবেরাকখা, গুরুনী য়াঠা কচই হেমকা।
সাধুগুরুন সিনীমানদিয়া বাখাতৈ হাময়া আরকবৈখা ॥

বাংলা ভাবার্থ

শোন শোন গুরু আমার একটি কথা। সীতার অভিশাপ পেয়ে নদী শুকিয়ে গেল। মিথ্যা কথায় জীবন গেল চলে যায়। যুধিষ্ঠির একটি মিথ্যা কথায় নরক দেখতে হয়। বট বৃক্ষ শুধু বলেছে সত্য তাই। ভবের থলে হয়েছে দেখা।

www.pathagar.com

অন্তর ঠিক কর, সত্য বল। না হলে সব পড়বে ধরা। দেখ সত্যবান সত্য কথার জন্য তার স্ত্রী সাবিত্রি। সর্প দংশনে মৃত লোককে জীবিত করেছে। আমি অধম বলংরায় রাজ্য ঘুরে ঘুরে গুরুর চরণ শুধু ধরে। সাধু গুরু চিনলাম না শুধু কষ্ট পেয়েছি।

বাউল সুর

(৬ নং গান)
নায়তৈ নায়তৈ অথলৈ ঠাংঅ রঐলামাকয়া।
রমতৈ রমতৈ কেপ্লেজাগয় ফানবাই পায়রকয়া ॥
ফানবাই পাইয়া কলবাই নাইদি খেমালে রয়া।
পাড়া খুংচা তুংঅয় বন কাইছাবসিয়া।
বমাসব বফাসব সিনীমানদিয়া।
ববৈকন্নে বাতাকায়ছা বন রমমানয়া ॥
লমিকাচার আচোয় তুংদি য়োকলে য়ৌকনাইয়া।
বমাসাকা বফাতলা কাইছাব সিয়া ॥
দোগালামনী বুড়ীন সুংঅয় নাইমায়া।
অধম হননাই বলুংরায়ব, অবুড়ীন নুংলেনুংগ
নংগয়তামা খায়ন বন কোকলে সংমায়া ॥

বাংলা ভাবার্থ

দেখতে দেখতে চলে গেল নাগাল পেলাম না। ধরতে ধরতে ছুটে গেল বলে কুলায় না। বলে না হলে ছলে ধরব তাকে। এক গ্রামে থেকেও তারে কেউ জানে না। কেবা আপন কেবা পর কিছু বোঝে না। দুইবোন এক ভাই ধরতে পারে না। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকো পালাতে পারবে না। তার মা বলেছে গাছের তলে ছিল সে যে কেউ জানে না। দরজার কাছে বুড়ির নিকট জানতে চায় না। অধম বলংরায় তুমি বুড়ির কাছে যাও। দেখলে তারে কি হবে তোর এখনও জানো না।

মনোশিক্ষা

(৭নং গান)
বাখানি বরোকন কাছগম রমদি।
বাখাবাই বাখা তাকজাগয় তুংদি।
সিচারফা ঐ রাংচাক তিলাংন হপং হরায়উ থুঁয়াঅয় তুংদি ॥
মায়ালে হিংবা দয়াঠার মায়া কপাল তোকছাগয় রুতগয় লাদি।
সাকানী শালায় খানাসে তর, কাচারসব আচেকযাক নাইদি ॥
বখালে নবার কবনৈ তুংগ, বাখাবাই বাকসা উরাকজাক নাইদি।
নাইশোক মাখালাই বাথাঅমান শোমচাগয় বনলাসিদি।
অবোরকসান নোংশনমান খালায় কপালনী দুঃখ হলচিদি।
অধম বলংরায় সবন মুংখা পূর্ব্বানী কোকন
পালোকজাকশোকখা কপাল জাতাবাই বুদি ॥

বাংলা ভাবার্থ

মনের মানুষকে মনেতে রেখো। বুকের ভিতর আগলিয়ে রেখো। সীসা দিয়ে তোমার সোনা নিয়ে যাবে রাত জেগে পাহারা দিও। মায়া বলে দয়া জানে না, ভাগ্যে আছে খুঁজে নিও। নিজের চেয়ে মন যে বড়, মনের ভেতরে কে আছে দেখো। মন যে বাতাসে উড়ছে, বাতাসের সাথে সেও উড়ছে। বুঝতে পারলে দেখবে মনে জাগিয়ে নিও তাকে। সেই মানুষকে চিনতে পারলে কপালের দুঃখ যাবে ঘুচে। অধম বলংরায় ভুলে গেছে, কার কাছে সে যাবে। ভুলের মাসুল আজ কপালে আছে। কপাল চাপড়িয়ে মরতে হবে।

(৮নং গান)
গঙ্গাগয়া কাঁশী প্রয়াগ যতসাগ নাইদি।
মাপথিমা আপাস্বর্গ গুরুমাতায় কপাল তুংদি ॥
একুইশ হাজার ছয়চবার যতবনসিয়া থার,
তালখাকচাব থাংগ ফাইয় বজাং তুংখা নাইদি।
পনরদিনয় তালথৈনায়, পনর দিন পূর্ণিনাই,
পনর পনর করানৈ ঐ তালছা উংখা হিচাব খায়দি ॥
রবিসোম মঙ্গল বুধ বৃষি শুক্র শনি শুধ,
সালচিনিন হিচাব খায়য় বুকুংবায়সে রমৈসদি।
অধম হিমনাই বলংরায়ব অবরোকসা,
সাগভুংগ খিলাংফুং খাছিয়ান অবরোকন রমৈতুংদি ॥ থিইলাংফুং

বাংলা ভাবার্থ

গঙ্গাগয়া কাঁশী প্রয়াগ সব নিজের দেহে পাবে। মাতা পৃথিবী পিতা স্বর্গ গুরু হচ্ছে দেবতা। যে একুশ হাজার ছয়শত বার তারে কেউ বুঝে না । চাঁদ উঠে আর কোথায় যে চলে যায়। পনের দিনে অমাবশ্যা আর পনের দিনে হয় পূর্ণিমা। পনের পনের একমাস হল হিসাব করে দেখো। রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি। শুধু সাতদিন হিসাব না করে আসল দড়িতে ধরে টানো। অধম আমি এই বলংরায়। নিজের অজানতেও সেই মানুষকে রাখব ধরে যদি মরেও যাই।

মনোশিক্ষা

(৯ নং গান)
পালোকয়া পালোকয়া বাখা নুংলাংখা রুংনীবাজী।
সবতাংখা রুংনী নোকন বাখাগ বুঝিঅয় লাদি ॥
আষাঢ়মাসি শোকপাই থালায় অমসময় নংথয়কালাই
চালাববৈ বালখালাঅয় কিতীংগয় কাবনাই য়াচিমিচি ॥
আসাং আসাং বলরুংসাগয়, অসাকাঅ নন অনয় যতরণ
হরিধবনী মংসাকরৈ অরনিনী নুংখানন লাংতা বাজী
জতামুজা নিনি পশাক,

তুংজাকগালাক আর বাসাক, নাংগালাকখা লাচিখুশী ॥
অধম বলংরায়ব সাকা, সাকনী কপাল সাকসে চাখা,
গুরুন কপাল তনদি আরতাউং কিরিলাচি ॥

বাংলা ভাবার্থ

রংয়ের মহিমা যেন ভুলো না আমার মন। কে বানাইল এ রঙের বাড়ী বুঝে নাও আমার মন। আষাঢ় মাস এলে, তুমিও চলে গেলে। আত্মীয় পরিজন সবাই কাঁদবে বুক চাপড়িয়ে। শবের চিতায় তোমায় তুলে হরিধ্বনি উঠবে ডেকে। গায়ে তোমার বসন রবে না। থাকবে না আর শরীর তোমার, থাকবে না লজ্জা। অধম বলংরায় বলে, নিজের কপাল দোষে। গুরু পানে কর নতি, কর না আর কোন ভুল।

(১০ নং গান)

ত্রিপুরানি বফাংলে বাঠায় ঠায়তাম ছিচোক।
বনকাগয় থাগয় লামায়া বাড়ী বাফাং বচোক।
হাগতুংগয় নুংশাগান বদৈদৈথাম ছিচোক।
দৈশ্যা উত্তব দৈশ্যা দক্ষিণ দৈশ্যা পূর্ব্ব বচোক।
বালায় বিসীং হুয়জাখ তুংগ, বাঠায় থায়তাম ছিচোগ।
স্বর্গমত পায়লামানাই বিনি মূল্য আশোক ॥
কাচাক হিননাই হরবাই বাকসা কুফুলতুংগ তৈবাই বাকসা
কুরুমুনয় ছচাগয় লাসা নাইতুংদি নাওয়াক।
শালবাই হরবাই ছচাই লাদি বোচকন য়াফাং গ তদি
মানয়ামানৈ মানজাং লাংঐ বাখাগ বারী শোক ॥
অধম বলংরায়ব সাবা প্রাণথাঁয়াচাক নাইলাবা
নুংয়া মানি শোকফাই লাংখা বাখাগ আচোক।

বাংলা ভাবার্থ

ত্রিপুরা নামের বৃক্ষটিতে আছে তিনটি ফল। মগডালে আছে একটি, ধরা তারে যায় না। মাটি থেকে দেখবে তাতে আছি তিনটি ডাল। একটি উত্তর একটি দক্ষিণ আর একটি পূর্বে। পাতার ভিতর লুকিয়ে আছে ঐ তিনটি ফল। স্বর্গ-মর্ত্য কিনতে পারবে মূল্য এত তার। লাল ফলটি অগ্নি সম শুভ্র জলের সমান। হলদে ফলকে টেনে নিও নজর দিও তাতে। দিবা রাত্রি টেনে নিও আগাকে টানো গোড়ায়। অসম্ভবকে সম্ভব করে মনে পাবে সুখ। অধম বলংরায় বলে আমৃত্যু চেষ্টা করো। তোমায় দেখে সাধ ফুরোল বুকেতে এসো।

(১১ নং গান)

সেবাসে পরম ধন সেবাসে পরম বৃদ্ধি সেবাভক্তি
ঠিক উংখালায় আয়নাতয় পিজাগয় নাইদি। •

www.pathagar.com

সেবাতামান হিংকা য়াথীরময় মাফ বিজাকখা প্রাণবাই
প্রানণ মিশায় খালায় বসে সেবা উংখা নায়দি।
গুরুনি কোক সত্য খায়দি বাখানীচর ছগয়লাদি,
চাইব পাইলিয়া মানৈ জনম জনম চাগয় তুংদি।
অধম বলংরায়ব সাকা, গুরুমহাবিথি উংখা,
অবিঠিন বাখাঅ বাগয় নুংয়া মানৈ নাইতুংদি।

বাংলা ভাবার্থ

সেবাই পরম ধন সেবাই পরম বৃদ্ধি সেবাই ভক্তি। ঠিকঠাক করতে পারলে আয়নার মত পরিষ্কার দেখো। সেবা কাকে বলে চরণ ধরে ক্ষমা চাইছি। প্রাণের সাথে মিশিয়ে দিলে সেবা হবে। গুরুবাক্য সত্য জেনো, মনের ময়লা পরিষ্কার করো। খেয়ে শেষ নাহলে নিত্য খেয়ো তাকে। অধম বলংরায় বলে গুরু হল মহাঔষধ। সেই ঔষধ বুকে নিয়ে অদেখাকে খুঁজে দেখো।

বাউলসুর

(১২ নং গান)
আমা আপানোক খানাফায়দি দোক ।
বুড়াবুড়ী সামান দিয়া খানাইলাদি নোক।
মানি ও ফানী অখয় ফায়বা মানায় কোকন পালকজাগখা
থুগয় এমাং নুতৈ উংখা বড় থাংকা বাওক ॥
শালবাই হরবাই হরি হিনদি কপালন দুষিতারদি
নোক বাকসা সুঅয়পাইখা আরফরৈ বাওক।
যুগাযুগী তাংঅয় চাখা, বুড়াবুড়ী উংগয় ঠিকা শালচিনিন
ঠারমানদিয়া পালোকজাগখা বাওক।
অধম বলংরায়ব সাকা,যতনি য়াপাইন রমখা,
খানাগয়ব, ঠুঅয় টুংবাই নোক।
খানাগব যুগর তংবাই নক্ ॥

বাংলা ভাবার্থ

পিতা মাতা তোমরা সবাই শোন মন দিয়া। বয়োবৃদ্ধ সবাই তোমরা শোন একটি কথা। মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে সব কিছু ভুলে গেছে। ঘুমে যেমন স্বপ্ন দেখি তেমনি করে কোথায় গেল সব। দিবারাত্রি হরি বল, মিথ্যা ভাগ্যে দোষ দিও না। ঘরে সবাই এসে গেছে ওরা কেউ নাই। সারা জীবন থাকলো তারা, আজীবন কাজ করল। সাত দিনের কথা ভুলে গিয়ে। অধম বলংরায় বলে, সবার চরণ ধরে। সব জেনেও ঘুমে আছ কেন অচেতন? সব বুঝেও কেন চুপ করে থাকো?

(১৩ নং গান)
ওঁ কারন লাঠাখাগয় সময়তুংসিদি।
শালবাই হরবাই আঁজিভাই নং বাখান বাগদি ।
অজপা কোক খোনৈন জপেজাকফং জপেজাক নায়দি ।
কহিন বালা বনমঠর, বতামান বিচার খায়দি।
ববিসীং মাতায়তুংঅ নুংশন খালায় আরতাসাতি।
মাসে চালা ফাসে ববৈ বাখা বাখা হিসাব খায়দি
ফাসে স্বর্গ জন্ম রখা মা পৃথিবী ওগ তয়খা,
সিয়ান সিরনাইমা, বতয় মাতায় কৰৈ নায়দি
হানি অধম বলংরায় ছিয়া বাজার থাংকা নাই,
অবাজারন ঠারমান দিয়া ছাকনী ছাক পালোকখা নায়দি।

বাংলা ভাবার্থ

ওঁ কারে ভর করে সময় থাকতে উঠে দাঁড়াও। দিনরাত্রি সবসময় মনে রেখ তাকে। অজপা কিছু কথা জপেছে দেখো। ক বলে তাকে ঘুরাও, সে কি তাকে সন্ধান করো। কোথায় আছে দেব দেবী সব। খুঁজে দেখো আঁতি পাতি। মা যে স্বামী পিতা দিদি মনে মনে করো হিসেব। পিতা স্বর্গ জন্ম দিল মা পৃথিবী গর্ভে নিল। অজানাকে জানায় মা, তার চেয়ে বড় কিছু নেই। অধম আমি বলংরায়। কিছু না জেনে চলে গেছি। বাজারে গিয়ে নিজেকে দেখি। নিজের মাঝে নিজে তো আর নাই।

কলির গান

(১৪ নং গান)
নাগয় লাদি নোকযত কলিনী আচার।
মাফান বুগয় টাখোক শুগয় বুরৈন কপাল বাগয় বাসান বামচাক।
ব্রক্ষনব ব্রক্ষত্বসিয়া, বৈষ্ণব বিষ্ণুনসিয়া
সাক্তব মাতায়নসিয়া আশোক অবিচার।
তাখোক বিখোক মানিদিয়া হামজক শাজক থারখায়দিয়া,
চাককাবাকসা মানখালাই কপাল কাজাক।
চালানী কোকবৈ সিয়া, বরৈনী কোক চালাসিয়া,
আন্তাজিয়া বাসামানৈ ফিরাগয় বুজাগ।
গুরুখোকচা শাগয়রখা সাকাখামা কলৈঠাংকা
ওমতৈর মতৈ কেগেলেজাগয় মাঠালয় পালাক।
হানি অধম বলংরায়ব আশোক শাল আচোয় তুংগ
সমানী বাচাগয় নায়দি বতয় করৈ গারা।

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

চেয়ে দেখ তোমরা সবে কলির আচার। মাতা পিতাকে মেরে ভাইকে শত্রু করে স্ত্রীকে রাখে মাথায়। ব্রহ্মকে বোঝে না, বৈষ্ণবকে চিনে না। সাক্ত আর দেবতাকে জানে না এত অবিচার। ভাই ভগ্নি মানে না পুত্র কন্যা ভাবে না। কিসের সুরায় মাতাল হলো! স্বামীর কথা স্ত্রী জানে না স্ত্রীর কথা স্বামী। সন্তান জন্ম দিয়ে তার দ্বারা নিগৃহীত হয়। গুরু বাক্য বলে গেছে উপর নিচে দেখিয়েছে। তার সাথে তাল হারিয়ে যেন কুপোকাত। এই অধম বলংরায় শুধু দিন কাটিয়েছে। ঘুম থেকে জেগে দেখো, তার চেয়ে বড় আর যে কোথাও নাই।

ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা স্নান

(১৫ নং গান)

ধন্য ধন্য কলিউংখা।
যতপাপন পাইশোক খায় ব্রহ্মপুত্র তয়কুখা।
গঙ্গাত্বয়ং মাতায় নায়দি অরকালাঅয় তয়কুদি,
বিরাক ওকনাং খৈজাক নাইব পাপবাই তাপন তাগয় হলকা।
পশুরাম বনানতাংখা য়াকনিদা কালায় তাংখা ,
ব্রহ্মাপুত্রতয় কুলুগয় য়াকনীদা কারাঅয় ঠাংকা।
থামচি বাশোক হাময়া নায়দি বলংরায়ব আরায় তাউংদি
ঈমতয় সময় আর মাগালাক বাখা দু:খ ঠানায় উংখা।

বাংলা ভাবার্থ

ধন্য ধন্য কলি কাল। সকল পাপ ঘুচাবার জন্য ব্রহ্মপুত্রে কর স্নান। গঙ্গা জলে দেবতা দেকো। সেথায় নেমে স্নান করো। গর্ভবতীর মৃত্যু হলেও সকল পাপ মুক্ত হবে। পরশুরাম মাতৃহত্যা করে হাতে দা আটকেছিল। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে হাতের দা গেলো জড়ে। ক্রোধ কত খারাপ দেখো। বলংরায় তাই হইও মতি। এমন সময় আর পাবে না। মনের দুঃখ যাবে যে ঘুচে।

(১৬ নং গান)

স্বাধীনি খুমফাং খলাকাচারনি,
নবারনী বাদে কোতুগ।
বোদকন রময় সগয় নাইসিদি
বোচোকনী বাথায় কারায়গ।
টাকসাটাকালায় বুগয় তুংখা,
বোখরৈ ববার বাথায়থায়কা,
টানজাগয়া খালায় স্বাধীনি খুমফাং,
বিয়ারম সুদা কোকগয় ঠাংগ।
জেসকতান আশোক উংগ
টানজাকররক বাথায়তর,

www.pathagar.com

টানজাকয়া খালায় স্বাধীনি
খুমফাং গিরা ফাংচিনী ঠয়ঠাংগ।
বিরক বরৈনৈ য়াকসিয়াগরা,
কাচারতুংগ বুড়িহাকড়া অবুড়িভাই
কাঠামাখালাই নুংয়ানী মানৈফোনংগ
অধম বলংরায়ব বফানটানখা
টাননানী রংয়া রআকাজাকখা
টানিবপায়া ফানৈব পায়া হাগলই ঠাংগ।

বাংলা ভাবার্থ

মন বাগানের স্বাধীন ফুলের গাছ। বাতাস ছাড়াই দোল দিয়ে যায়। লতায় ধরে টান দিলে আগার ফলটি নিচে পড়ে। উপর-নীচ সে দোল খেলে যায়। কলি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল ধরেছে। না কাটলে স্বাধীন ফুলের গাছ শেকড়সহ নির্বংশ হয়ে যায়। যত কাটে ততই বাড়ে। যত কাটে ততই ফল বড়ো হয়। না কাটলে স্বাধীন ফুলের গাছটি চারা থাকতেই সব মরে যায়। দুই নারী তার ডানে আর বামে। বয়োবৃদ্ধা তাদের মাঝখানে। সে বৃদ্ধার নজর কাড়তে পারলে, অদেখা সব দেখতে পাবে। অধম বলংরায় গাছটি কেটেছে। কাটতে না জেনে জোঁকে ধরেছে। বলে না পারে ছলে না পারে। শেষ বেলায় পরাজয় মানে।

(১৭ নং গান)
বাসাগ তুংগ কারাকমা।
নাইব মায়া রমৈব মায়া আখলৈ ঠাংকা
হাংগালামা সাকনী হাংগালাম।
যতনী বমা নাই লাফাইদি বসেগজামা ফাইনানী
ফোগ ফাইতোং ফায়কা ঠানানী
ফো বকতয় লামা।
সাকাংতয় ফাইনাই উলআয়তা ঠানায় য়াকসী মঠরব
লারগয়তুংনাই যওনী অবতয় লামা।
শালনহর খায়দি হরশাল খায়দি,
প্রাণ বোদকনরমি তুংসিদী।
ছিয়ানায় কোকন যতসিকালায়,
ঠানানিলামলে কালায়মা।
অধম বলংরায় কচগয় তুংগ,
সিয়া নাই কোকন গুরুসিরগ বসেযতনী বমা ॥

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ
দেহে আছে এক কঠিন বস্তু। না যায় ধরা তারে না যায় দেখা। সে যে দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস। সবার মাতা এই বস্তু। কোনদিকে এসে প্রবেশ করে, কোনদিকে প্রস্থান তার। সামনে দিয়ে এসে পিছন দিক দিয়ে চলে যাবে। বাম দিকে মোচড় দাও। সবার জন্য যেন একই পথ রাখা হয়। দিনকে রাত করো, রাতকে দিন। প্রাণের দড়িটি ধরে রেখো। অজানা সব বিষয় জানতে পারলে, মুক্তির পথতো সহজ হবে। অধম বলংরায় ভেসে থাকে। অজানা বিষয় গুরু শিক্ষা দেয়। সেই তো সবার মা।

(১৮ নং গান)
বাখানিবরোক সরব নাইদি।
বাখা বিসিংঅ ফিরাগয় নাঐ।
হায়াবরোকন কোকসংগয় তুংদি ॥
বাখাসে হাময়া বাখাচে চায়া
বাখানিমতে তাচলিসীদি।
বাখান রময় বাখান ছাগয় মায়া
বাখাগ কাগয় তুংসিদী।
লাচিমা করয়, কিরিমা করয় বাখানী
মাসা য়ালান নাইদি।
বাখানী মতে বাখাঅ আসা বাখাঅ্ তুংগ
মায়ুং বাই মাসা সন্ধাননী মতে
বন্ধন খালাঅয় রময় তুংগান ফায়দি ॥
অধম বলংরায় বাখান ছিয়া
বাখাঅ মাতায় থারমানশন দিয়া।
গুরুনীয়াপায় তাপ জি খালাঐ
কপাল তয়তয় খাগয় তুংসিদী

বাংলা ভাবার্থ
মনের মানুষ কে দেখো ভেবে। মনের ভিতরেই সবকিছু পাবে। লোকের কাছে জেনে নিও। মন যে সকল নষ্টের মূল রে। মনকে বশ করতে না পারলে, মনকে বুঝতে পারবে না। মনকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রেখো। মনের কাছে হার মেনো না। লাজ-শরম হীন বাঘ থাকে এই মনে। তার কবলে পড়িও না। মনের মত মনের আশা মনেতে আছে। বাঘ আর হাতির মতো পুষ মানিয়ে বন্ধন করে ধরে এসো তারে রাখি ধরে। অধম বলংরায় বুঝতে পারল না মনের মধ্যে যে রয়েছে দেবতা। গুরুর চরণ জপের মত মাথায় রেখো সব যথাযথ।

ভাবের গান
(১৯ নং গান)
সাকনী প্রাণ আখলয় ঠাঁলাংখা
মংসাব নুংয়া মংসাবসিয়া,
তামানি বাখা খাতংখা।

www.pathagar.com

ঠানানী ফোগ ছায়চংচে ঠাঁনায়
বমা ঠারমানলিয়া, সরন রিংনাই
তাওকশে বাড়ী ঠেকাইকা।
সাকনি বাখান কায়সা খায়সিদী,
বিনীবমং বাই প্রাণন রসিদী,
চায়ামানৈন চাইছিকানাই তয়হরচংতয় উংলাংখা।
গুরুনি কোকন বাখাগ তনদি রমজাক
তাননৈ হলঐ তারদি পালোক জাগ খালায়
অববোসান ভবিনীলীমূলে বফংকা।
অধম বলংরায় পালোকযাকশো কথা
গুরু হনজাগয় ছাগয় রফাইকা,
নুংয়ান মানুইন বাখাগনুংগয়
ঠুনানী বাচাতয় অংলাংখা

বাংলা ভাবার্থ

শরীর থেকে প্রাণ উড়ে গেলে কিছুই তো আর থাকে না। কেন যে এ মন আজ উতলা! যাবার কালে যাবে চুপিসারে। মা বুঝলা না কাকে যে ডাকবে! কিংকর্তব্যবিমূঢ় আজ হলো। মনকে আজ ঠিক করো রে। তার নামে প্রাণকে ধর রে। যাবার কালে একাই যাবে। সকল খারাপকে ফেলে দিয়ে আজ গুরু বাক্যকে মনে রেখ সদা। সে বাক্যকে সদা মনে রেখো। অধম বলংরায় সব ভুলে গেছে। গুরু এসে সব বলে গেল। না দেখাকে মনের মধ্যে দেখে, ঘুম থেকে জেগে উঠার মতই আজ আবার জেগেছে।

(২০ নং গান)
প্রেমবাতামা জাংগ্রীদয় কারায়।
বাথায় কুমনয়া খাগয় চানানি,
ববাতামা হুদাদয় আরায়।
প্রেমনিকোক কিছিচাদয় যতনীভাগ্যগ গঠেবাদয়,
প্রেমনী কোকন সালয় নাইয়,
যত মূর্খ ফষ্টী বড়াই ॥
প্রেম হাপুংগ তুংগ হাকর,
তালকনেনী কাচারতয় জলেজাক পরশপাঠর,
লামকাচারনী চিবোকনী হাংগলা
নাংগয় প্রাণ গলেখা আরাই ॥
হানি অধম বলংরায়ব অমানৈন এমাংঅ নুংগ,
এমাংন মংঠাং খায়মান খালায়,
বাখাদু:খ সাড়াই সাড়াই ॥

বাংলা ভাবার্থ

প্রেম কি এতোই ঠুনকো রে ভাই। নাড়া দিলে পড়বে ঝরে? সে তো আবার পাকা ফলও নয়, যখন ইচ্ছে খাবে পেড়ে। প্রেমতো কোন বস্তু নয় রে ভাই। প্রেম যে সাধারণ জিনিস নয়, সবার ভাগ্যে তা না সয়। প্রেমের কথা বলে দেখ যত মূর্খ করে বড়াই। প্রেমের পাহাড়ে গর্ত আছে। দুই চাঁদের মাঝে পরশ পাথর। দূর পথে সাপের নিশ্বাস। লেগে প্রাণ গলে যায় যেন। অধম বলংরায় সেই জিনিসকে স্বপ্নে দেখে। স্বপ্নকে বাস্তবে করতে পারলে। মনের দুঃখ কেটে যাবে।

(২১ নং গান)
দুঃখীয়ানী দুর্গতিন কিচানাইদিমা।
নিনিআরাই বিবটিবাবটি তামামতিমা।
বরোকবাই বাকসা নংসেহর রজগুনবাই হরমা।
স্বতগুণবাই আমাতয় বোকমা
ত্বমগুণবাই নবারন মাতায় জাংগ্রাংমা।
মাতায়নীব আরমাতায় মাতায়নি বমা।
অন্ধ কমপা নাইথকয়াব নুংসে নাইথকমা
মকল খুঁজুর বোখক বুকুং নংসে হাংগালামা।
অধম বলংরায় নন রিংগ নুংতয় নুংতয় নুংয়া উংগ
গুরুবাক্য কোকখোকচান তাপালোকর মা ॥

বাংলা ভাবার্থ

দুঃখীনির দুর্গতি একটু দেখ মা। তুমি কি ধরো নাকি ছাড়ো তোমার এ কি মতি মা? অন্যের মতো তুমি রজ গুণের আগুন। স্বত গুণে মা গঙ্গা। ত্বম গুণে বাতাস দেবতাকে জাগাও। তুমি দেবতারও দেবতার মা। অন্ধকার ও অসুন্দরের মাঝে সুন্দর তুমি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা তুমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। অধম বলংরায় তোমায় ডাকি, দেখতে গিয়েও নাই তো দেখি। গুরু বাক্যটি যেন আমি কভু ভুলে না যাই।

(২২ নং গান)
ওঁ কারন গাড়ী খায়য় ঠানানি খায়দি।
আজি ভাই আই খালাঐ বাখাগ তুংদি ॥
অজপা কোক খোকসান দোহাই রসিদী।
মায়াভাই সেবজাগই বসাক থৈঠাঁকা নায়দি ॥
টাখোক বিখোক বরোকরক যতঠান সাকব ওয়াইসা।
সাকান শেলাশোকথা থারনানী খায়দি।
নবারণ ছচাগয় কপাল তনদি কিচাকিচা ছক্রায়ঐ বিসীংগ দাদি।
অধম বলংরায়ব কবরচাখা নুংজাকমানী
কামা জাকখা দোহায় নাংঅ গুরু মাতায় তাশারী ছিদী ॥

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

ওঁ কারকে বাহন করে সামনে এগিয়ে চলো। সত্য কথা সবসময়ে মনেতে ধরো। জপহীনের আকুতি মনেতে রেখো। মায়া জালে আটকে দেহ মারা যাচ্ছে দেখো। ভাই-ভগ্নি যত সবে যাবে একদিন চলে। সময় থাকতে প্রজন্মকে মুক্তির পথ দেখাও। বায়ু টেনে কপালে রেখো। ধীরে টেনে ভেতরে নিও। অধম বলংরায় পাগল হলো। কাছে পেয়েও হারিয়ে ফেললো। দোহাই লাগে গুরুদেব আমায় ছেড়ে যেও না।

(২৩ নং গান)

হায়রে পাষান্তী বাখা তামায় গায়ঠালউং।
মাসিনিদী ফাসিনিদী গুরুতত্ত্ব বিচারলাদি নায়দিকালিরং।
গুরুনী অর সতালদি বেদন বেদখালায়দি তময় আন্দারতুং।
সত্যবর মিসাউং মিসাবরো সত্যউং।
চারাকায়ঐ তয়লুখলাই বদৈবফরা সাওয়ালয় বোখরয়,
বাবার বাথায় থায়লাংফুং। গঙ্গাগয়া কাঁশী প্রেয়াগ, ·
উরিস্যা বৃন্ধাবন, মাফাগুরুনী বাদেআর ছড়তুং ॥
অধম বলুংরায়ব সাকা গুরুবাদে আরবরৈখা
গুরুলে মনূষ্যয়া স্বয়ং মাতায়ফুং ॥

বাংলা ভাবার্থ

হায়রে পাষাণ্ড মন আমার। কোন দোষে তুমি এতো অবাধ্য হলে। মাতা-পিতাকে চিনে রেখো। গুরুতত্ত বিশ্লেষণ করো, বুঝে দেখ কালি রং। গুরুর কাছে নিবেদন করো অন্ধকারে থেকো না। সত্য কখনো মিথ্যে হয় না, মিথ্যা হয় না সত্য। বৃক্ষের সঠিক যত্ন নিলে তার শাখা হবে। কলি থেকে ফুল হবে এবং ফলও দেবে। গঙ্গা গয়া কাশী প্রয়াগ উড়িষ্যা বৃন্দাবন। পিতা মাতা সত্য গুরু তার চেয়ে নেই কেউ। অধম বলংরায় বলে গুরু বিনা আর কেউ নেই। গুরু তো সাধারণ নয় স্বয়ং ঈশ্বর হয়।

(২৪ নং গান)

ঐনাখনদি জগৎনি প্রান বাচাজাক কদমতলা।
সুমুলখারাংবাই প্রানউরাকখা বাখাগ নাংথাজালায়।
খেলানি বাগয় ফায়মানি অব ববাই খালায়দি খেলা।
ইমতয় সময় আর মানগলাক বাখাগ তাউংহেলা।
বননুংখলাই হুলুংগলিয় ভবিনি বসেচালা ॥
কেন হামজাগ কেন হামজাকয়া বাড়ীসে কুসুমজালা।
অধমবলুংরায়ব কপাল হুমদি গৌসায়নি য়াপান তালা ॥

বাংলা ভাবার্থ

শোন ঐ জগতের প্রাণ দাঁড়িয়ে আছে কদম তলে। বাঁশির সুরে প্রাণ উড়ে যায় মনে লাগে দোলা। খেলার জন্য সে এসেছে করো তার সাথে খেলা। এমন সময় আর পাবে না মন কর না হেলা। তারে দেখে পাথর গলে ভবের সে যে সেরা। কাউকে আপন কাউকে পর সে তো মহাকালা। অধম বলংরায় মাথা রেখো গুরু যদি হয় কৃপা।

বার অক্ষর ত্রিপুরা সংগীত

অ-অহিংবা অজপা আংশে সাকাংফাই
নবারনী শালায়ব কারাক যতনি ছাগনাই ॥
আ-আহিংবা আংবুঝিয়া বাখা খাছিয়া তামাখায়জাকছিনাই।
আমা বাবা গুরুমাতাই যতছাগনাই।
ই-ইহিংবা ঈশ্বর সবছাগতুংগ বনহিংনয় নাই
নাইনানি রংখালায়ই বন বাছাগসেস মাননাই।
ঈ-ঈহিংবা আশক ঈচ্ছা উংমা খালায় বোকতয় থানায়,
নাইব নুংয়া রমৈমায়া বাছাগছে মান্নাই ॥
উ-উহিংবা উবতয় বড়তুং তামাখায় ঐ নুংনাই
ফিলেনাইদি ইবাসাকন হামজাগয় মিনিনাই।
ঊ-ঊহিংবা উড়ুনানিব কপাল নাংগ যতখানাবাই
উড়মান খালায় মানজাগান মাঠালয় তুংনাই।
ঋ-ঋহিংবা রাংচাকসেব রমৈনাইদি বিসিংঅ বাথায়
চায়াবাদে কেপংগান বনমানখালায় ॥
ঌ-ঌ হিংবা লিলাখেলা ফায়কাব শরঠার খালায়,
লিলাংজাকসে বাশাকযত অআইছাকে থানাই ॥
এ-এহিংবা এমাংবায়সে তুংগ প্রান সবঠার থালায়,
এঁওয়াঁএঁওয়াঁ কাবহিনয় বড়ঠাংগয় নুংনাই ॥
ঐ-ঐহিংবা রিখন খালায় ঐহিনান ছাগবন মাননাই,
রিংনানী রংখালায়ব ঐহিনয়ছে ফায়নায় ॥
ও-ওহিংবা ওঁমকার সব নাইলাদি কোকছাগয় বতুংনাই,
বরকশ্রাবই রম্‌ন খালায় ভবেনীব য়োকনাই ॥
ঔ-ঔহিংবা উকপংগয়ব বাখা পংয়া বাখাকবর নাই,
বাখা দুঃখীয়া বুঝিতিলায় ভবেনিব য়োকনাই ॥
বার বাথায় বারকোকবায় হরি ধবনি রদি,
দুঃখদষা ছাগনি পাপ যত পাইশোকরদি ॥
বারবাথায় বারকোকবায় তয়ছারচাগয় কুনাই।
নবগ্রহ অষ্টদষা কাচাগনাই কবননাই,
বারবাথায় বারকোকন বলংরায়ব ছাকা,
আচায়ফোগ মাতৃউংনায় যত অখলৈ থাঁকা ॥
বারবাথায় বারকোকন খুলুময় তুংসিদী,
ঈহানি বরোকনি য়াপায় কপাল রসিদী ॥
বারবাথায় বারকোকনি বাখাগ লাগয় তুংদি,
মাফাগুরুনীদষা যত ছাড়ি থাংদি ওঁ তৎসৎ ॥

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

অ- বলে অজপা আমি এসেছি সবার আগে
বায়ুর চেয়ে শক্তিশালী দেখ সবার প্রাণেতে
আ- বলে বুঝিনা আমি কী করতে হবে
পিতা মাতা গুরু দেবতা সবার কাছে রয়
ই- বলে ঈশ্বর সবখানে আছে তাকে দেখতে জানলে
সবখানে সবার শরীরে রয়েছে
ঈ- বলে এত ইচ্ছা করলে কোনদিকে যাবে
তাকে চোখেও দেখবে না হাতে ধরা যাবে না হৃদয়ে আছে
উ- বলে এমন জিনিস কোথায় আছে কেমনে দেখবো তাকে
ভাল করে শরীরে দেখ সে তো রয়েছে
ঊ- বলে উড়তেও ভাগ্য লাগে শোন সবাই
উড়তে পারলে সবই পাবে হাতের মুঠোয়
ঋ- বলে সোনাকে ভাল করে দেখে নিও
ভেতরে কোন খাদ থাকতেও পারে
ঌ- বলে লিলা খেলা কত যে কে দেখে ভেবে
সব কিছু নরেবরে শরীরং যাবে চলে
এ- বলে স্বপ্নে আছে প্রাণ সবার কে চিন্তা করে
ওমা ওমা কান্না করে বলে তাকে পাবে দেখতে
ঐ- বলে সঠিকভাবে ডাকলে তুমি তাকে পাবে
ভালমত ডাকতে পারলে সে চলে আসবে
ও- বলে ওঁকার সবখানে সে বিরাজিত আছে
তাকে সঠিকভাবে ধরতে পারলে মুক্তি হবে
ঔ- বলে আত্ম তৃপ্তি পায় না যে মন ভরে না
মন যদি সব বুঝতে পারত ভবের মুক্তি পেত
বার অক্ষর বার বাক্যে হরি ধ্বনি কর
দুখ দশা পাপ তাপ সব যাবে ঝরে
বার অক্ষর বার বাক্যে গঙ্গা স্নান কর
নবগ্রহ অষ্টদশা মুছে যাবে সব
বার অক্ষর বার বাক্য বলংরায় বলেছে
জন্ম সময় মাতৃ উধরে সব রেখে এসেছে
বার অক্ষর বার বাক্য প্রাণাম কর সবে
যতমানুষ এ কথাটি কপালে রাখ
বার অক্ষর বার বাক্য মনে রাখ সর্বদা
পিতা মাতা গুরু প্রণাম দুখ যাবে ভুলে

-০-

www.pathagar.com

চৌত্রিশ পদাবলী
(কক্ বরক)

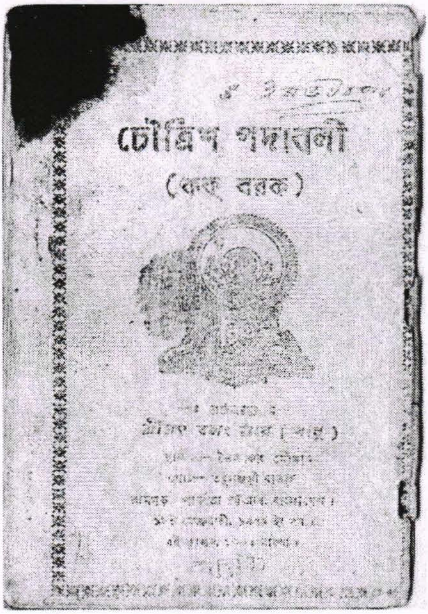

[১]

রচনায়:-
শ্রীমৎ বলং রায় (সাধু)
স্থান: তৈলাফাং মৌজা, পো: তবুলছড়ী বাজার।
রামগড় পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ ইং সন, ৫ই ফল্গুন, ১৩৮৫ বাংলা।

কক্ বরক ত্রিপুরা আরতি

দুঃখীনী দুঃগতীন কি মা নাদি মা। ঐ দু আঃ
নীনী আরাই বিভতি ভাবতী তামা মহিমা ॥
অন্দ কম্পা নাই থৈয়াব, নংশে নাই থৌমা ॥
বরক ভাই বাশানুং সে হর, রজগুবাই ব্রক্ষা।
সত্ত্গুনি বিষ্ণুনং, আমা তই বুক্‌মা ॥
তম গুনি নব্বা নূং, মাতাই জাংগ্রাংমা।
মাতাই নিব আর মাতাই, নুংসে গর্জ্জামা ॥

www.pathagar.com

যত বিশয় যত সম্পত্তি দু:খ: নি লামা ॥
ই ভবেনি মায়া জাল, লঠা গর্জ্জামা ॥
গুসা রত্ন সা গই রখা, অদম বলং থার ম্যালিয়া মা ॥
মকল খুর্জ্জুর বুখুও বুকু নুংশে হালামা ॥ ইতি ॥

বাংলা ভাবার্থ
দুঃখিনি মা তোমার কি দুঃখ তোমার।
তোমার এই মহিমা কিছুই বুঝি না ॥
সুন্দর অসুন্দর তোমার ভিতর তুমি সুন্দর মা।
সবার মত তুমি অগ্নি রজগুণে ব্রহ্মা ॥
শতগুণে বিষ্ণু তুমি মা গঙ্গী মা।
তম গুণে বায়ু দেবী তুমি আমার মা ॥
দেবতারও দেবতা তুমি সবার বড় তুমি।
যত বিষয় সম্পত্তি দুখের কারণ ॥
এই ভবের মায়া জাল বড় বাধা।
গুরু রত্ন বলে গেছেন অধম বলংরায় জানে না তা ॥
চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা তুমি ঈশ্বর।

(২ নং আরতী)
যোগ খুলুমুখা মা সুরবী নং আন অগ: তুই খা।
ফা: লক্ষী ধন জর্ন্ম রগই, ইং হান নং ফুনুও খা ॥
দশ মাস দশ দিন কাখা অ: বিশিনি আখলই ফাইকা।
মানি মেজা গর্জা চামান নি তৈ কুর গই আভুক রখা ॥
তৈশা খুম তুইশা বালাই মুতুম শা, খলই খজ্জুর ফেরকা।
আমা হাম জাক গই খুরীয় ভামই, কাবাক সো আর মুতুমখা ॥
বালাই চিকন সা বব্বা মতুম সা।
কেতে নে কেশ্বের বর্ব্বান, বন (হাম জাক গই খলই কান মায়া বুশুন নুং গই কিরী খা ॥
হাকারা মাই তং অকারা কৌতং মাফা: ফরং গই রখা,
ফুরুং নাই কৌন বাক্ষা করই বিরকন নং গই পালখা ॥
অদম বলং রাই বাক্ষা খাছিয়া,
গুরুশে মাতাই শিবি মান লিয়া, ছিনি নাই কৌন বাক্ষা কালিয়া
ভবেনি লামন কুফুংকা ॥ ইতি ॥

বাংলা ভাবার্থ
প্রণাম করি মা সুরবী, আমায় ঔরসে ধারণ করেছ। পিতা লক্ষ্মী জন্ম দিয়ে এ পৃথিবী দেখালে। দশ মাস দশ দিন পর আমি বেরিয়ে এলাম। মা আমায় স্নান করিয়ে স্তন পান করালেন। বনের সুঘ্রাণ ফুল তুলে কানে গুঁজলেন। আদর করে কোলে নিয়েছেন, চুমু

www.pathagar.com

খেয়েছেন কপালে। ছোট পাতা বিশিষ্ট সুঘ্রাণ ফুল কাঁটা নাগেশ্বর। তাকে কিন্তু সুন্দর লাগলেও খোঁপায় দেওয়া যায় না। কাঁটা তার বড়ো বাধা সদা করে ভয়। পুরনো জুম চাষের জন্য ভাল, বৃদ্ধ লোকের কথার যুক্তি ধারালো। এসব কথা ভুলে গিয়ে ভবের রঙ্গে মন মজিয়ে। অধম বলংরায় সব ভুলে গেল। গুরু ঈশ্বর ভুলে গিয়ে, জপের কথা ভুলে গিয়ে সে যে ভবের পথ হারায়।

চৌত্রিশ অক্ষর পদাবলী

ক- কহিনবা কলিযুগ নাইলাদি নুংয়া মানুই নুংখা।
আদি গুরু মা ফালাই যতনি সাগ থক্‌কা ॥
আর মাতাই কাইসা তংগ রমছিদি কলম্‌ন।
অ কলম বাই হান খাকা খানাই লাদি কক্‌ন ॥
খ- খহিনবা তা থুছিদি শালবাই হরবাই সিসা রফায়ান।
সাগতংগ রাংচাক বাথায় সিকক্‌ তিলাংগান।
গ- গহিনবা গেরগই গেরগই রমদি সাগসে মাতাই।
মাতাই বর তুংখা নাইদি বন বাসগসে মাননাই ॥
ঘ- ঘহিনবা ইভবে অ ফাইকা যত বাসাকন নুংলিয়া ॥
নুংনাই তিলাই হানি বরক মাই খৈলেব চায়া ॥
ঙ- ঙ হিনবা স্বর্গ মত্য পাতাল হিননাই ই হাগসে তংগ।
নাইনানি রুংখালাই বন বাগছে মানজাগ ॥
চ- চ হিনবা চেতের মানৈ নারদি বন বরতংলা ক।
বাখানি মাছাসে অয়ালনাই বলং নিয়া ব ॥
ছ- ছহিনবা তাছারিদি রমই নায়দি ফায়ই তংফায়ান।
নুংয়া মানই সত্যসেব নুংজাগই তংগান ॥
জ- জহিনবা জাতি বংশ সিয়াবন যতনি অর নাই ॥
হচলাই তই চুংজাগন জুলুই জুলুই নাই।
ঞ- ঞ হিনবা সকালাই সচা খায়দি বাসাকনি বোদক্‌ন।
রম্‌মান খালাই য়াগ তাহলদি প্রাণ আখলই থান ॥
ট- টহিনবা মানি অকনি আখলই ফায়কা মুংসাবনছিয়া।
গুরুনি কক্‌ন বিশ্বাস খায়দি অয়াইছ লাই য়কনাইবা ॥
ঠ- ঠহিনবা জুলুই জুলুই চুংজাক সেব কপালনি কাচার।
ইায়ই নুংয়া রমই মায়া গুরুনি অর ॥
দ- দ হিনবা দসুই দসুই খায়ই রমদি সাকনি হালমান।
রমম্মান খালাই অমানুইন আচগই চামান্‌ন ॥
ধ- ধহিনবা ধনব নংয়া জনব নাংযা বাখারগই নাই।
রমজাগ খালাই অবরকসা মাথালই তং নাই ॥
ন- নহিনবা নুংজাগান যত ফাইকা তামাচালা বুরুই ॥
থাঁলাংফুগ খাছিলিয়া নাইখনদি মুরুই মুরুই ॥

www.pathagar.com

ত- তহিনবা থাঁলাংফুগ বুরুই বাছা কাইসাব নুংগালাক।
থাঁলাংফুগ রাজা প্রজা কাইসাব সিগালাক্ ॥
থ- থহিনবা থানানি সময় যত সাইচুংছে থানাই।
হরিনি বমংন মান খাই উহংগ তংনাই ॥
ড- ডহিনবা অধম বলংরায়ব সাবা গুরুন রিংছিদি।
রমান খালাই সাগ তংনাই খাছিয়া তা সংদি ॥
ঢ- ঢ হিনবা নায়ই লাদি বমা বাছা নক্ ॥
নুংজাগান তুই তুই রমদি কালায়ান পলক্ ॥
প- পহিনবা পাইতক্যা তাঅংদি বক্ন তামা বুরুইবাছা।
সকালাই সচা খায়দি রমমান খায় ছামাচা ॥
ফ- ফহিনবা ফাইমানি লামান যত কুফুংগই থাজাগ খা
হালমাবাই রমই নায়দি য়কলাই য়কগালাক খা ॥
ব- বহিনবা ইববেনি সব তরলাং বাখাদায় থাককা।
তিন কনাব বুসুক সক্তাম অরনি ফাইবাইকা ॥
ভ- ভহিনবা ভাবেয়ই নাইছিদি বাখা সাগ বুদুক তুংথাম।
অয়াপার রগই কাগই লাদি মাননাই হা খরতাম ॥
ম- মহিনবা সাগতংগ বুদুক গরজা কাইছাব নুংলিয়া।
বুদুকন সমান খালাই ই হাগব ফায়া ॥
য- যহিনবা বুদুক তুংথাম সগই নায়দি বফাং নালজাগন।
শালবাই হরবাই সগই নায়দি স্বর্গ লামা মানন ॥
র- রহিনবা আমা অংগই ওগতুয়ই অপা জর্ন্মরখা।
গুরুলাই স্বয়ং মাতাই নায়দি যতন ফুনুক্ খা ॥
ল- লহিনবা সাকনি বাসাক নায়ই নায়দি গুরুনি অরসে।
ছিয়ান ছিরনাই গুরু নাল খালাই ছিনাই সে।
শ-তালিবিয়াশ দায় ৩৬ শ অক্ষর কাইছাব নুংলিয়া ।
সকলনাই বতনি তংগ, ফিয়গই নাইমায়া ॥
ষ- হরিনি বাসাক লাই বর সাগছে নাই ছিদি।
হরিনি সালাই মংসে তর, বমুং রমই তংদি ॥
ং- অনুসারন সার খালায়ই বাখান শুম্চাদি।
ঃ- বিসর্গ লাই মকল কলন্নই নাই শুগই লাছিদি।
ওঁ মকার ফাইমানিথ কুসুমুলুই খবাই।
সুরমা বাই রাবজাগ সেব যতনি সাগ নাই ॥
হবাই ছন, মিশাই খালাই, অজপাসে অংনাই ।
কাচার দায়নি বরক কাইছা বর তংখা নাই ॥
নাইতং লিগা বলংরায়, মংসাবন ছিয়া।
গুরু সে মনিশরয়া স্বয়ং মাতাই বন থার মান লিয়া ॥
হরি হরি - হিনছিদি, হর বাই শালন-

www.pathagar.com

বাগছিদি- ও” হরি তৎ সৎ - ।
ঁ- চন্দ্র বিন্দু তাল খাকচান বলংরায়ব ছিয়া ;
খাকচা দায় খাকনৈ অংগই দিশা খায়মানলিয়া ॥
হাপং থায়চা হাকর খরচা হচলাই চংযাকছে।
অ হাকর কালাই খালায় যতব থৈ নাই চে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চার যুগয় থৈয়
হরি মংন লাদি যত ববাই সাংগই ফায়
আর করই নাইছিদি - খাছিয়াব তা অংদি ॥

বাংলা ভাবার্থ

ক- বলে কলিযুগে অদেখাকে দেখা হল
আদি গুরু পিতা মাতা সবার শরীরে রয়েছে
আর একটি ইশ্বর হচ্ছে কলম
সে কলমে পৃথিবীকে বশ করা যায়
খ- বলেছে ঘুমিও না দিবা রাত্রি ডেকে যাবো
গায়ে আছে স্বর্ণ রৌপ্য চুরি হয়ে যাবে
গ- বলেছে শক্ত করে ধরে রেখ শরীরের দেবতাকে
কোথাও দেবতা না খুঁজে শরীরে খুঁজলে পাবে
ঘ- বলেছে এই ভবে এসে নিজের শরীরকে চিনলাম না
দেখতে পেলে ভবের মানুষ খাওয়া ভুলে যেত
ঙ- বলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সেতো এ ভবেই আছে
তাকে দেখতে জানলে শরীরেই পাবে
চ- বলছে জেগো মানুষ কোথায় তুমি দেখ
মনের বাঘ কামড় দেবে বনের বাঘ নয়
ছ- বলছে ছেরনা তাকে ধরে রেখ তারে
না দেখাকে দেখতে পাবে সত্য যে সে
জ- তে জাতি বংশ না ভেবে সবার কাছে দেখ
অগ্নি শিখার মত সেতো জ্বলবে
ঞ- বলছে শরীরের রশিগুলো টেনো আর ছাড়ো
ধরতে পারলে ছেড়োনা আর প্রাণ যে চলে যাবে
ট- বলছে মাতৃ গর্ভ হতে নেমে এসে কিছুই জানি না
গুরু বাক্যে বিশ্বাস রেখো তবে মুক্তি হবে
ঠ- বলছে কপালের মাঝখানে জ্বলছে অগ্নি শিখা
ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না গুরু কৃপা ছাড়া
দ- বলে তাড়াতাড়ি নিশ্বাস ধরে রেখ
ধরতে পারলে এর ফলকে সারাজীবন পাবে
ধ- বলছে ধন লাগে না জন লাগে না মনের মধ্যে দেখ

www.pathagar.com

ধরা পড়লে এমন লোক পালাবে কোথায়
ন- তে সবাই এসেছে নারী কিবা পুরুষ
যাবার কালে না বুঝে সে দেখছে ফিরে ফিরে
ত- বলছে যাবার কালে স্ত্রী পুত্র রবে না কেউ
রাজা প্রজা থাকবেনা তো ভবের সাঙ্গ কালে
থ- তে যাবার কালে সব লোকে যেতে হবে একা
হরি নামে পার হবে যত পথের জঞ্জাল
ড- তে অধম বলংরায় বলছে গুরু পূজা কর
ধরতে পারলে শরীরে থাকবে ক্ষয় যাবে না তো
ঢ- বলছে দেখো দেখো আত্মীয় স্বজন
ধর ধর শক্ত করে পড়ে যাবে যে
প- তে পুত্র সন্তান না ভেবে বিশ্বাস রেখ সবে
শ্বাস প্রশ্বাস সঠিক রেখ নিকটে এলে ধরতে পারবে
ফ- তে আসার পথকে হারাতে বসেছে
নিঃশ্বাসের সাথে ধরে দেখ পার পাবে না আর
ব- বলছে এই ভবে মনের চেয়ে বড় আছে কে
ত্রিদিকে ত্রিকাণে পাবে সেখানে
ভ- বলছে ভেবে দেখ মনের তিনটি রশি
সেখানে উঠে দেখ পাবে ত্রিভুবন
ম- বলছে শরীরে আছে বড় রশি দেখে না কেউ
রশিগুলো টানতে পারলে ভবে আসতে হবে না
য- বলছে তিনটি রশি টেনে দেখ নড়বে গাছ
দিবা রাত্রি টেনে রেখ স্বর্গ পথ পাবে
র- বলছে মা হয়ে পেতে ধরলে পিতা হয়ে জন্ম দিলে
গুরু স্বয়ং দেবতা যে বিশ্ব দেখিয়েছেন
ল- বলছে নিজের শরীর দেখ গুরু কাছে আছে
অজানাকে জানে মানুষ গুরুর নিকটে
শ- তে ৩৬শত অক্ষর কেউ দেখে না
টেনে নেওয়ার সুযোগ আছে খুলে দেখা যায় না
ষ- হরির শরীর কোথায় নিজের কাছে দেখ
হরির চেয়ে নাম যে বড়, নাম ধরে রেখ
ং- কে সার করে যে মনকে জেগে নাও
ঃ- যে দু চক্ষু দিয়ে দেখে নিও
ওঁ কার এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে তোল
সুরমা দিয়ে পেঁচানো সবার গায়ে আছে
আগুনের সাথে শন মিশালে ধ্বংসই তো হবে
মাঝ থেকে একটি মানুষ কোথায় আছে দেখ

www.pathagar.com

নাইতং লিগা বলংরায় কিছুই বুঝে না
গুরুতে মনুষ্য নহে স্বয়ং ঈশ্বর বুঝে না সে
হরি হরি বল সবে দিবা রাত্রি তাকে
ওঁ হরি তৎ সৎ
ঁ- চন্দ্র বিন্দু অর্ধ চন্দ্র বলংরায় জানে না
অর্ধ অর্ধ পূর্ণ যে হয় পেলনা দিশা
পাহাড় গুহা সর্বস্থানে অগ্নি জ্বলে আছে
এমন গুহায় পড়লে সবাই পুড়ে যাবে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চার যুগে মরে
হরি নামে জপ করো সকল নামই আসবে চলে
আর কিছু নেই দেখ, অবুঝ হইও না।

সাধু বাহুচন্দ্রের আধ্যাত্মিক সংগীত

১

সাকাং গুরু আপা আমা বওকন খুলুমখা
আন জন্ম রগৈই ইঁ হান ফুনুক খা।
দিক্ষা মন্ত্র রগই গুরু আবুর ন চাংরখা।
শিক্ষা মন্ত্র ন ব রগই জ্ঞান বাতি মুচুংখা।
অরনি খাই সালচিনি সাল বাজার মেলে নাই।
সৎ গুরুন রম মান খাইসে অককন সিনাই।
সাল সিনি নী বুমুংন জীব লাই পালক গই তংখা।
গুরু রুপ নঃ লাগই স্বয়ং কৃষ্ণ যতন সুমচাখা।
সাল সিনি নি সাল হাতিন, বন বেরেয়ই নাই থাই।
অ হাতি গঃ থার মান খাইসে, গুরুন মালাই নাই।
অধম বাহু থার মানয়াগই গুরাইয়ই তংখা।
গোঁসাই বলং হাম জাকগই সাগই রফাইকা।

(দসই দসই)
আন দয়া অংজাদি, গুরু মাতাই সাফাইদি,
বাখাগ সে তংজাদি, নিনিয়াপাই রফাইদি,
কলি পাপন ত রাইনি, নিনিয়াপাই রজাদি,
গোঁস্বাই বলং দয়া অংদি, বাহুনি বাখাগ তংদি,
নিনি য়াপাই রজাদি, যুগেযুগে তাসারেদি।

বাংলা ভাবার্থ

প্রথম গুরু পিতা-মাতা প্রণাম করি তাদের
দেখাল এই পৃথিবী জন্ম দিল তারা মোরে
গুরু করিল পবিত্র দীক্ষা মন্ত্রে

www.pathagar.com

শিক্ষা মন্ত্র দিয়ে আমায় জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালাল
অতঃপর সপ্তাহের সাত দিবস মিলবে
মহাগুরুকে গ্রহণ করিলে এই কথা জানিবে
সাতবারের নাম ভুলিল মানবকুল
গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ জাগাল সকলকে
সাত দিনের হাটের নাম জানিবে তখন
জগৎ ঘুরিয়ে দেখিবে তখন
জগৎকে জানিলে তবে, গুরুকে জানিবে
অধম শিষ্য না জেনে ঘুরিল জগৎ
গুরু বলংরায় ভালবেসে আসিয়া কহিল।

ঝুমুর
দয়া কর মোরে, ঈশ্বর-গুরু জ্ঞান দাও
হৃদয়ে আসন গড়, তোমার পায়ে ঠাঁই দাও
কলি পাপ দমনে দাও হে তোমার পদ মোরে
তোমার পদ দাও মোরে
কোনো যুগে নিও না যেন
তোমার আশীর্বাদ তুলে।

২
বাখা হাখর নঃ লাং লাং খাই নাই অবতই গুরুন।
অ হাকরন লাং লাং খাই নায় খুলুমখা আং বন।
গুরু আপা গুরু আমা গুরু মাতাই শিব ॥
যত দায় গুরু তংগ হানি যত জীব।
মাতাই থামচুই আখল খালাই গুরু মুক্ত খাইয়।
গুরু থামচুই আখল খালাই নরগ মাথাংগ।
য়াক জোর খায়ই খুলুম খা আং অবতই গুরু ন।
বিনি পাই খাই খুলুম খা আং জর্ম্ম রনাই ফা ন।
বিনি পাই খাই অগতুইনায় মা ন খুলুম খা।
দশ মাসে দশ দিন আন অগতুই খা ॥
বিনি পাই খাই খুলুম খা আং যত অকারা ন।
সাকনি চালাই মালাই যত য়াক রম খা বক ন।
বিনি পাই খাই বর্রদা রখা যেসুক কতই রক ন ॥
গুরু গোঁস্বাই অকারা চেরক মাপ রবাইদি আ ন।
কীর্তন খাইয়ই রাচাপ খালাই ফাইয় বিরক চেরক।
শুধু খুজুর সু:খ খালাইয় বুজি মানয়া বওক।
গুরু গোঁস্বাই বলং রায় ব দু:খ নুংগই বক ন।

www.pathagar.com

ত্রিপুরা কক বাই সুইদি হিনকা অধম বাহ্ ন।
চা চায়া ফুং আংলাই অধম সুইয় নাই জাখা।
ধ্যান যুগ গোঁস্বাই বলং সাগই রফাই খা।
গুরু উক্তি প্রাণ সুমচানাই রাচামুং।

(দসুই দসুই)
গুরু গোঁসাই ফাইলাংখা, বাখা হাখর লাং লাং অংখা।
সৎ গুরু ন,সুসিদি বাসাক গীতা কাম খাইদি,
রবি সোম বক কাই নই তামা খালায় সুংদি,
মঙ্গল বুধ বক কাই নুই তামা খালাই নাই সিদি,
বৃহস্পতি শুক্র বওক কাইনুই কাফাক জাকসে খাকসিদি,
শনি সালসুংসে নালজাগঃ বিসিং ফাতার নুং জাকগ।
অবরকন নুংসন খালাই, থুমানি বাচাতই অংখা,
কালাই ফুগঃ পালকখা গুরু রমই সুংদি,
বুমুং থার মান য়াগই তংখা তাকসে বারি থেকাই খা ॥
দুহায় নাংগ গুরু মাতাই বাখা গসে তংজাদি,
যোগা যোগী তাসা রিদি, বাখাগসে তংজাদি।
যুগে যুগে মানা তই, নিনি য়াপাই নুং নাতই,
বরন আন রজাদি, নামন বাখা তনজাদি।
গোঁসাই বলং উক্তি রজা খা, অধম বাহ্ রাচাপ খা।
ওঁ গুরু তৎ সৎ ওঁ গুরু তৎ সৎ ওঁমঃ ॥

বাংলা ভাবার্থ
হৃদয় সুরঙ্গ পবিত্র করে যেই মহাগুরু
আমি তারে প্রণাম করি হৃদয় করি পবিত্র
গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু মহাদেব
সকল জীবে গুরু আছে
ভগবান ক্রুদ্ধ হইলে, গুরু মুক্ত করে
গুরু ক্রুদ্ধ হইলে পরে যাইবে নরক পাড়ে
করজোরে প্রণাম করি মহাগুরু তোমায়
অতঃপর প্রণাম করি জন্মদাতা পিতারে
তারপর প্রণাম করি গর্ভধারিনী মাতারে
যিনি মোরে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছে
তারপর প্রণাম করি সকল বয়োজেষ্ঠ্যদের
হাত ধরি যত সমবয়সীদের
তারপর আশীষ করি আমার কনিষ্ঠজনদের
গুরু-মহাগুরু ছোট-বড়ো ক্ষমা করো সকলে

www.pathagar.com

কেবল কর্ণসুখে বুঝিল না ওরা
তাদের কষ্ট দেখিয়া গুরু বলংরায়
বলিল লিখিতে গান ত্রিপুরা ভাষায়
হোক বা না হোক আমি অধম চর্চা করিলাম
ধ্যানযোগী গুরু বলংরায় তাই কহিল
গুরু বাণী প্রাণ জাগরণী গান প্রচারিত হইল

ঝুমুর
মহাগুরু আসিল, হৃদয় মন পবিত্র হইল
প্রশ্ন করো গুরুকে, ভাবো গীতা দেহকে
রবি সোমকে করো প্রশ্ন, কর্ম তাদের কী?
মঙ্গল আর বুধ দেখো তারা করে কী?
বৃহস্পতি আর শুক্র তাদের যুগল ভেঙ্গে দাও
শনি একা রহিল, ভিতর বাহির দেখিল
ওইসব প্রশ্ন করিলে, যেন কেবল ঘুম হতে জাগিলে
যখনি বিপদে পড়িবে, গুরুকে স্মরণ করিবে
গুরুকে ভুলিলে মন, বিপদ বাড়িবে
দয়া করে গুরু তুমি হৃদয়ে করো আসন
যুগে যুগে যেওনা যেন, করো হৃদয় আসন
আশীষ করো মোরে, বসো হৃদয়তরে
মহাগুরু দিল বাণী, অধম শিষ্য তাই গাইল গীতি
ওঁ গুরু তৎ সৎ ওঁ গুরু তৎ সৎ ওঁম

৩
সাল থাসক গই সইন্দা অংখা
বাসাক কাম তাংদি।
তৈই সক-থামনি তৈইন খকগই
গুরু য়াপাই ববাই সুগই
বাসাক যত শুদ্ধ খায়ই গুরুন পুজিদি।
মা বুদুক বাই সগই নাইদি
ফা বুদুক বাই হলই রদি।
গুরু বুদুক রমই লাগই
ব্রম্ম জ্যোতিস নায়ই তংদি।
সংক সুপদি বাদ্য তামদি
বুদুক তুংথাম রমই তংদি।
দশম দারনি ওঁকার ধ্বনি খানাগই তংদি।
গুরু ককবাই কাম তাংমানখাই

www.pathagar.com

বাসাক মাতাই অর নুংনাই।
বার দল আচকগই দল কাইনুই বাতি নাইদি ॥
নানা জাতি বাদ্য তামদি
মহামন্ত্র জপ খালাইদি।
ওয়াইব্রৈ সদি ষোলন তনদি আষ্ট ন সিদি।
গোঁসাই বলং কাইসা ফাইকা
সন্ধ্যানি কামন তাংদি-হিনখা।
অধম বাহু থার মানলিয়া ফুরুংগই রজাদি ॥

(দসই দসই)
আন মায়া অংজাদি, গুরু মাতাই সাফাইদি,
বাখা গসে তংজাদি, নিনি য়াপাই রফাইদি,
কলি পাপন তরাইনি, নিনি বুদ্ধি রফাইদি,
আং সিয়াফুং নুংসেসিয়, যত পাপন মাপরদি,
গোঁসাই বলং মায়া অংদি, বাহুনি বাখাগ তংদি।
যুগে যুগ তা সারিদি, নিনি য়াপাই রজাদি।
অউম গুরু তৎ: সৎ: অউম গুরু তৎ: সৎ:
অউম গুরু তৎ: সৎ: অউম গুরু তৎ: সৎ:

বাংলা ভাবার্থ
বেলা গেল সন্ধ্যা হইল,
করো পূণ্য কর্ম
উজান ঘাটের জল তুলে গুরুপদ ধুয়ে
দেহ মন পবিত্র করে গুরুকে পূজিবে
মাতা রশিতে টেনে রেখো
পিতা রশিতে ছেড়ে দেখো
গুরু রশি টেনে ধরে
ব্রহ্ম জ্যোতিষ দেখিবে পরে
শঙ্খ বাজাও, বাদ্য বাজাও
ত্রি রশি ধরে রেখো
দশম দ্বারের ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পাইবে
গুরুর নির্দেশে কর্ম করিলে
ভগবানকে দেখিবে সাকারে
বার দলে বসিয়ে দুই দল প্রদীপ দর্শিবে
বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে নয়, মহামন্ত্র জপিবে
চারকে টানিবে, ষোলকে রাখিবে
অষ্টকে দমিবে

www.pathagar.com

মহাগুরু বলংরায় আসিল
শেষবেলার কর্ম করিতে বলিল
আমি অধম কিছুই বুঝিনি
শিখিয়ে দিও মোরে তুমি মহাগুরু।

ঝুমুর
দয়া করে ওহে গুরুদেব কহো মোরে
হৃদয়ে আসন করো, তোমার পদ দাও মোরে
কলি পাপকে দমিতে তোমার আশীষ দিও মোরে
আমার অজানা যত পাপ
তুমি ক্ষমা করো
মহাগুরু বলংরায় তুমি দয়া করো মোরে
আসন গড়ো তুমি মোর হৃদয়তরে
তোমার পদ নিওনা প্রভু তুলে যুগ যুগান্তরে
ওঁ গুরু তৎ: সৎ: ওঁ গুরু তৎ: সৎ:
ওঁ গুরু তৎ: সৎ: ওঁ গুরু তৎ: সৎ:

৪
অ গুরুয়ই যত নিনি
নিনি নিনি নিনি যত নিনি।
অ গুরুয়ই যত নিনি ॥
বাখা বাখা ওয়াসক গই নাইবা
য়াফাং বুচুক থিক খালাই বা যত নিনি।
বাখা কবর কক বুজিয়া
কাম শক্রুন মেচেন মানয়া
নাইদি বন মেচেন নানি ॥
ওঁ অস্ত্র বাই ককগই
নাইদি বন মেচেন নানি।
গোঁসাই বলং উক্তি রখা
অধম বাহু চিন্তা খাইবা
বিশ্বাস ভক্তি সাধন ভজন যত নিনি ॥
গোঁসাই বলং তত্ত ককন
পাইসক-রগই সালাং মানি।
বন থার মানয়া অধম বাহু
ইঁ ভবে গুরাই মানি
ওঁ হরি তৎ: সৎ:

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

ওহে গুরু সবই তোমার
তোমার তোমার সবই তোমার
ওহে গুরু সবই তোমার
মনে মনে ভাবিলাম
আগা হইতে গোড়া সবই
মরিলে হবে সবই তোমার
পাগল মন আমার বুঝে না কিছুই
দমিতে পারে না কাম
চেষ্টা করো দমিতে কাম
ওঁ অস্ত্রে মারো তারে দমিবে কাম
মহাগুরু বলংরায় দিয়ে গেল বাণী
আমি অধম ভাবিলাম যত
বিশ্বাস ভক্তি সাধন যত তোমার
মহাগুরু বলংরায়ের শেষ তত্ত্ব কথা
আমি অধম বুঝিনি তাহা
ঘুরি দেশান্তরে
ওঁ হরি তৎঃ সৎঃ

৫

আ মায়ই নুং আন বাম জাদি।
রিং নানি রং রুংয়া নঃ নঃ আং রিংয়।
বাখা বিসিংয় ওয়াসক গই তং গ।
আং সিয়া ফুং নুং লাই সিয়
বাখা বিসিং আচক গই তংদি।
কিরি কিরিয়ই নঃনঃ রিংয়
বাখা গ ওয়াসুক গই আচকগই তংগ।
নিনি ককবাই নঃনঃ রিংয়
বামই আন তনজাদি ॥
অধম বাহু থুগই তংখা
গোঁসাই বলং প্রান সুমচাখা।
দুহাই নাংগ গুরু মাতাই
তাবক লাই তা সারিদি ॥

বাংলা ভাবার্থ

মাগো ওমা কোলে নাও মোরে
ডাকিতে জানি না আমি
তবু ডাকি তোমায়
মনের গভীরে শুধু ভাবি তোমায়

www.pathagar.com

আমি নই, জানো তুমিই
মনের আসনে তাই বসো তুমি
ভয়ে ভয়ে ডাকে তোমারে মোর মন
একাগ্র মনে বসে ভাবি সারাক্ষণ
তোমারই ভাষায় তোমায় ডাকি
কোলে রেখো আমায় তুমি
অধম আমি ঘুমিয়ে ছিলাম
মহাগুরু বলংরায় জাগিয়ে দিলেন
দয়া করে গুরু মোরে ছেড়ে যেওনা।

৬
ভাবেতই ভাবেতই সময় লাই করই খা।
বাইফু গসে আং গুরু নাম লানাই ॥
সময়লাই তং গালাক আনব নাইসিংগালাক।
সময় ফাই কাই যম রাজা লাই রমই তিলাং নাই ॥
যম বাই সালাইনি বন ফাঁকি রনানি।
গুরু নি বুদ্ধিন রমই আচক গই তংথাই ॥
সৎ গুরুন রমদি, রামপ্রা থার খাইদি।
ইঁ ভবে সাগরনি য়গই থানানি খালাই ॥
গোঁস্বাই বলং রায় সাগই সে রনাই।
অধম বাহু নুং বাখা ভাবেয়ই নাই।
থাই নুই ন সচাদি থাই তাম ন জপেদি।
বৃন্দাবন হিন নাই লাই বাসাক গসে নুং নাই ॥

(দসই দসই)
বাখা গসে ধ্যান খাইদি, বাখা গাই থাল তা অংদি,
বৃন্দাবন হিন নাই ন বন অর নুংগ ন,
বুঝি মান খাই গুরু কক ন
রাধা কৃষ্ণ যোগল নুং ন,
বাসাক গীতা গাম তংদি।
গুরু য়াপাই পুজিদি।
ওঁ গুরু তৎ:সৎ:ওঁ

বাংলা ভাবার্থ
ভাবিতে ভাবিতে সময় গেল
কখন আমি আবার গুরু নাম লইব
সময় থামিবে না
অপেক্ষা করিবে না

www.pathagar.com

সময় আসিলে যমরাজ নিবে ধরিয়া
যমের লগে কথা কহ ফাঁকি তারে দিয়া
গুরুর শিক্ষা নিয়ে বসিয়া থাকিবে
মহাগুরুকে স্মরিবে, শেষ পথ দেখিবে
ভবের সাগর হইতে পাইতে রেহাই
মহাগুরু বলংরায় বলিছে কথা
অধম তুমি তাই ভাবিও তথা
দুই আঙ্গুলি টেনে জপিবে তিন আঙ্গুলি
বৃন্দাবন দেখিবে তখন নিজের দেহেতে

ঝুমুর
একাগ্র মনে ধ্যান করো
মন থেকে কাম দূর করো
বৃন্দাবন দেখিবে তবে
গুরু তত্ত্ব বুঝিলে
রাধা-কৃষ্ণরে যুগল দেখিবে
গীতাসম দেহরে পবিত্র রাখিতে
গুরু পদ পূজিবে
ওঁ গুরু তৎঃসৎঃওঁ।

৭
কাঁশিয় থুইমানিলাই মুক্তি জরাসে।
মুক্তি লাই ভক্তিনি রিনায় সুনায়সে ॥
গুরু তত্ব সামানি রাই বুদ্ধি রমানিসে।
গুরুনি বুদ্ধি ন মান খাই তত্ব নাংয়া সে।
মহাদেব উক্তি রগই বলাই সামানি সে।
রিং নানি রংখালাই আদ্য শক্তি বামই তং নাই সে।
আমা আপা গুরু গোঁস্বাই যত সাগ সে।
সাগ সভব সিনি মানয়া এমাং মুক থাংসে ॥
হালামা বাই রমই নাইদি বন নুং নাই সে।
লাম কাচার আচক গই তংদি ববাই মালাই নাই সে ॥
ইঁসক কক্‌ন থার মানয়া খাই গুরু ন সুং থাই সে।
অ লামা তই বৌদ্ধ খ্রীষ্টান যত মা থানাই সে।
ইঁ ভবেয় গোঁস্বাই বলং বুদুক তুং তাম রজাক সে।
অধম বাহু রময়ই সদি নুংব সিনায সে ॥

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

কাঁশিতে মৃত্যু জেনো সবে মুক্তি।
মুক্তিলাভ জেনো ভক্তির ধোপাতি ॥
গুরুতত্ত্ব কহিলে বুঝিবে, শিক্ষাদানসম।
গুরুশিক্ষা পাইলে তবে তত্ত্ব মিছা সে ॥
মহাদেবের উক্তি দিয়ে কহিল মহাগুরু।
ডাকিতে জানিলে তবে আধ্যাত্মিক হইবে সে ॥
মাতা পিতা গুরু মহাগুরু সকলে কহিছে।

নিজেকে চিনিতে পারিনাই আমি ॥
ভাবি দিবা নিশি।
পথে পথে ঘুরে দেখো ॥
দেখিবে তাহারে তুমি।
দূর পথদ্বারে বসে করো অপেক্ষা।
অবশ্যই পাইবে তুমি তাহারই দেখা ॥

৮

ইঁ ভবেনি রংনি খেলা
ওয়াই সা বাইয়ই থাংগ ন।
আই ফুগ বুঝি জালাই ন ॥
ইঁ ভবেনি য়গই থাংমানি
নিনি জাবিন সব অংনানি।
বুরুই বাসা বন্ধু বান্ধব
কাইসা করই
সাইচুং সাইচুং সে মা থান ॥
সাগ তংগ বুমুং কাইসা
বন হি ন বলংনি তকসা।
তকসা উরিগই থানানি পুগ
ন ন তমই সালাংন।
আইফুগসে বুঝি জালাই ন ॥
মা ফা বাসা তংগালাকখা
বন্ধু বান্ধব সিগালাকখা
থানানি ফুগ জাগা জমিন
দালান কুটা কালাইয়ই তুরুক গন।
থানানি ফুগ মুংসা করই
নামসে থাইসা তংগন
আইফুগসে বুঝি জালাই ন ॥

www.pathagar.com

গোঁসাই বলং হিনবা মতি অংদি।
মায়া জালনি য়গই থাংদি।
অধম বাহু চিন্তা অংদি
গুরু সাগই সানাই কক ন
হরি নামনি কক্‌ন ॥

বাংলা ভাবার্থ
এই ভবের রঙের খেলা
একদিন শেষ হবে রে
তখনই তোর মাথায়
জ্ঞান হবে রে
এই ভব হতে মুক্তির জন্য
কে হবে তোর জামিনদার
স্ত্রী-সন্তান বন্ধু বান্ধব
কেউতো যাবে নারে।
মনের ভেতর বাস করছে
অচিন এক পাখি
সেই পাখি উড়ে গেলে
তোকে বলে যাবে না রে
তখনই তোর মাথায়
জ্ঞান হবে রে
মা-বাবা সন্তান থাকবে না
বন্ধু বান্ধব বুঝবে না
জায়গা জমি দালান কোঠা
সব পড়ে রবে রে
যাবার কালে সঙ্গী সাথী
কেউ রবে না রে
তখনই তোর মাথায়
জ্ঞান হবে রে
গুরু বলং আদেশ করেন
মতি হোক তোদের
মায়াজাল কেটে যাক
তোদের সকলের
অধম বাহু স্মরণ করো
গুরুর সব আদেশ
হরিনামের উপদেশ।

www.pathagar.com

ত্রিপুরা বৈষ্ণব সংগীত

১

অ আনি রাংচাকনি বাখা
কৃষ্ণ মুংন তমই পালক লাং
বতই মিসা সানাই বরক
জনম হাময়া বিনি বাখা॥
কৃষ্ণ মুংন তমই পালকখা,
তামা সাগই ফাইখা,
তাবক তামা অংখা।
মিসা মায়াদাইয়া বুজাগই তংখা
কৃষ্ণ মুংন তমই পালকখা॥
হরে কৃষ্ণ হরি মুংন তমই পালকখা॥
হরে কৃষ্ণ হরি মুংন
সালবাই হরবাই লাদি নাম ন
হানি বিয়ারাম অংন আরাম
জমনি জালা তংমান গালাকখা॥

বাংলা ভাবার্থ

ও আমার সোনার মন
কৃষ্ণ নামটি ভুললে কেন
মিথ্যেবাদির কথায় কেন
ভুললে সোনার মন
কৃষ্ণ নামটি ভুললে কেন
কী হওয়ার কথা ছিল
আজ কী যে হয়ে গেল
মিছে মায়ায় মিশে গিয়ে
কৃষ্ণ নামটাই ভুলে গেলে
হরে কৃষ্ণ হরিনামটি ভুললে কেন মন
হরে কৃষ্ণ হরি নাম
দিনে রাতে কর সাধন
দুঃখ জরা দূরে রবে
সদায় খুশি থাকবে মন।

২

চিনি হা ন কসল নাইথক হালাই আর করই।
হাপার হা কাচাং বফাং বিরিফাং
তকসা তক মুলুই পুংলাইদৈই
বলং হালং তৈসা তৈমা চিনি হালাই ব সে
আমা জুগ জুগিলাই তনখা
চ ন অনই তনখা চ ন বামই
চিনি বরক জত বাকসা
কানমুং চুমুং জত বাকসা নাইথক
মাচাং জত বাকসা চুংতই আর করই
বাকসা খায়ই তংলাইমানি ব ন সিবিয়ই
বর থাং চন্দন হিনবা, সাদিন বাগা
তংলাইমানি চুংতৈ আর করই॥

বাংলা ভাবার্থ

আমাদের এই দেশের মতো
দ্বিতীয় দেশ আর নাই
পাহাড় মাটি গাছে ভরা
পাখ পাখালির গানে ভরা
বন জঙ্গল নদী ভরা
এইতো আমাদের দেশ
এই দেশটিই আমার মা
সেইতো কোলে নেয় তুলে
সুখে দুঃখে যুগে যুগে
মানব সন্তান সবাই সমান
পোশাক পরিচ্ছদে রঙিন
এমন সুন্দর দ্বিতীয় কোনো
দেশ যে আর নাই
সম্প্রীতির সব বন্ধনে
ভালোই তো ছিলাম
কোথায় গেল সেসব দিন আজ
চন্দন বলে পুরনো দিন
আনতে হবে ফিরিয়ে
আমাদের মতো ঐক্যের প্রতীক
দ্বিতীয় কোথাও নাই রে।

www.pathagar.com

৩

গাউর চাননি প্রেম বাজারঅ
সব থাংনাই দাকতুই ফাই
গাউর চাননি প্রেম বাজার
রসিক রকলাই দোকান রগ
রসিক ফালনাই রসিক পাইনাই অ রসিক লাই
প্রেম বাজারনি ফালনাই পাইনাই
রাংচাক রুফাই মানিক নুংনাই
চন্দন হিনবা লোবি কামিক থাংমায়ানাই
থাংকাই বিপদ গতেনাই॥

বাংলা ভাবার্থ

গৌরচন্দ্রের প্রেম বাজারে
কে কে যাবে তরায় আয়
গৌরচন্দ্রের প্রেম বাজারে
রসিকজনে সদাই করে
রসিক বেচে রসিক কিনে
রসিকজনই সেখানে সব
সোনা রূপা সবই পাবে
চন্দন বলে লোভীজনের
সেখানে যে ঠাঁই নাই
লোভী মানুষ গেলে সেথায়
বিপদ থেকে রক্ষা নাই।

৪

বাখা নুং তমই আসুক কবর অংলাং
ওয়াইসা বাই মাননাই হিনকাই
মাজনরক আরাই খায়ই তমই তংলাং
জুগে জুগে বতই ককন
গুরু বৈষ্ণব সাগ বন
প্রবত সাদক সিদ্দি
তমই বন সাগই ফাইলাং
চন্দন হিনবা খানাদৈই ককন
কাতর খায়ই
জতন সান, ব্রজগুপি বেশ লায়াখাই
কৃষ্ণন লাই সব মানলাং॥

বাংলা ভাবার্থ

ওরে মন তুই কেন পাগল হলি রে
একবারেই যদি সবই মিলে
মহাজন কেন খেটে মরে
যুগে যুগে গুরু বৈষ্ণব
দিয়ে গেছেন উপদেশ
সিদ্ধ সাধকগণ
দিয়ে গেছেন সদুপদেশ
এসব শুনে চন্দন বলে সকাতরে
ব্রজগোপী বেশ না নিলে
কৃষ্ণের পথ মিলবে না।

৫

গুরু ভক্তি করই খালাই
কৃষ্ণন লাই মান গালাক
জে গুরু ব সে কৃষ্ণ,
শাস্ত্রদাইয় সাগই রজাগ॥
সাকাং খাইদি গুরুনি বজন
অনুরাগ সুদ্দ বজন
গুসাইনি বাব বুজিয়ই খাইদি
সেবন সেবানি বাদে মানগালাক॥
কক কাথক অংখা বাগবত দায়,

বাংলা ভাবার্থ

গুরুতে ভক্তি না থাকলে
কৃষ্ণ বলো কেমনে মিলে
যে গুরু সেই কৃষ্ণের পথ
শাস্ত্রমতে করো শপথ
আগে করো গুরু ভজন
অনুরাগেই শুদ্ধ ভজন
ভাবনা করো গুরুর নামে
সেবাতেই শিবকে মেলে

www.pathagar.com

আর সাকা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থদায়,
সয়ং কৃষ্ণ গুসাইনি দাইয়
চন্দন লাই সাগই রজাকা॥

ভাগবতের সব কথাই অমৃত
চৈতন্য চরিতামৃতে একই পথ নির্দেশিত
স্বয়ং কৃষ্ণের পাদপদে
চন্দন করে আত্মনিবেদন।

মারমা লোকগীত : কেপ্যা

কেপ্যা: কেপ্যা এক ধরনের মারমা জনজাতির লোকগীত। অনেকটা বাংলা কবি গানের মত। এটি কাহিনি ভিত্তিক হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ বেদনার কথার প্রাধান্য থাকে। আবার মহাপুরুষের জীবনের প্রতিচ্ছবিও এতে উঠে আসতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে কেপ্যা প্রেমসঙ্গীত। দু'জন মারমা যুবক-যুবতীর সুরে সুরে উক্তি-প্রতুক্তির মধ্য দিয়ে প্রাণ পায় কেপ্যা।

কখন গাওয়া হয়: মারমা নৃ-গোষ্ঠী অবসর, সামাজিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় কেপ্যা পরিবেশন করে। কাজের সময় একঘেঁয়েমি কাটাতে, যুবতিরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা অথবা প্রশংসাকীর্তনেও কেপ্যা গেয়ে থাকে।

গায়েন সংখ্যা: একক, দ্বৈত।

বাদ্য যন্ত্র: সাধারণত এ গীতে কোন বাদ্য ব্যবহার করা হয় না। আনুষ্ঠানিকতায় হারমনিয়াম ও বাঁশির ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়।

সুরের ধরন: সুরের কোন বৈচিত্র্য নেই। একই সুরে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সুরের বৈচিত্র্য না থাকলেও মারমা নৃ-গোষ্ঠীর ভালোবাসা, কষ্ট ও বেদনাবোধ সুরের প্রলম্বিত বিস্তারে শ্রোতার বুকের গভীরে লুকোনো আবেগকে স্পর্শ করে।

কথা– দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে গান রচিত হয়। বিশেষ সাহিত্য/ আনুষ্ঠানিক শব্দের ব্যবহার এখানে অনুপস্থিত। এ গান রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতা/ গায়েন কোন ছন্দ,মাত্রা বা ব্যাকরণ মেনে চলেন না। সাধারণত গায়েন কর্তৃক তাৎক্ষণিক গান রচিত হয়। তাই লিখিত রূপে সংরক্ষণ খুবই কম।

কথার ধরণ

আয়াংখা চাহ্গা গো তউপ রাগে
ম্যাচিগালে ম্যায়রে লেতে
আফু-আবং পিলিচালে তাহ্ মণয়-ল
লপ কু-ব চারে রাউ যাদো লাহারে!
আগ্রী আয়েং সিরে রাউ পউরে।
লেমে-খ্যায়ংমা ঙারো আকুং জিমা
কুমা ক্রে-গে উইফু ত্যাংগা মিহিল্
আয়াংখা চাহ্গা গো তউপ রাগে
ম্যাচিগালে ম্যায়রে লেতে।

www.pathagar.com

বাংলা

অতীতের কথা মনে পড়লে
চোখে জল আসে
দাদা-দাদীর আবহ রাখতে পারলাম না
মিলে মিশে খাওয়ার দিন কোথায় গেল!
বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সন্মানের দিন শেষ।
জমি-নদীর মাছ সব বাজারে
নিজের কাছে টাকা নাই
অতীতের কথা মনে পড়লে
চোখে জল আসে।

তথ্যনির্দেশ ও গায়েন

অং চাই রী মারমা (বয়স ৪৩), র‌্ওয়া-সঃ পাড়া, গুইমারা ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি

মারমা গীতি নৃত্যনাট্যঃ পাংখুং

পাংখুং গীতি নাট্য-নৃত্য বিশেষ। কথিত আছে জনৈক মারমা বৌদ্ধ ভিক্ষুই প্রথম পাংখুং রচনা করেন। তখন একক শিল্পী কর্তৃক পরিবেশিত হত। কালক্রমে অভিনয় এর পাত্র-পাত্রী সংখ্যা একক থেকে একাধিক সংখ্যায় এসেছে। পাংখুং-এর সংলাপ, নৃত্য একই সুরের ধীর লয়ের মারমা ভাষা ও বর্ণমালায় রচিত। পাংখুং-এর বাদ্যযন্ত্র বাংলা যাত্রাদলের অনুরূপ। বৌদ্ধশাস্ত্রীয় জাতক, মারমা সমাজে মানবীয় জীবনে প্রবাহিত সুখ-দুঃখের কাহিনি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি, মারমা লোককাহিনি ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মারমা পাংখুং রচিত। পাংখুং-এ গীতি, নৃত্য, নাট্য এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় আছে। পরিবেশনের ভঙ্গিমার ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে কাঁধ, নিতম্ব, পা, বসা অবস্থায় হাঁটু এবং বাহুদ্বয়ের সাধারণ সঞ্চালনকে দেখানো হয়। এর অঙ্গভঙ্গির মুদ্রা খুবই সীমিত। পাংখুং এর সুর,তাল, লয়, ধীর লয়ের হলেও দারুন হৃদয়গ্রাহী।

বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সব মৌসুমে ধর্মীয় ও মারমা সামাজিক অনুষ্ঠানে পাংখুং পরিবেশিত হয়। এই পরিবেশনা ও উপস্থাপনার শৈলীতে লক্ষণীয় বিষয় হল-বর্গাকার বাশেঁর খুঁটি পুঁতে এর উপর বাশেঁর তলয় বা ছাউনি দেওয়া হয়। ছাউনির নিচে মাটির উপর খড় বা মাটি দিয়ে একটু উচুঁ করে মঞ্চ বানানো হয়। মঞ্চের চতুর্দিকে দর্শক বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চের এক পাশে সারিবদ্ধভাবে পাংখুং বাদকদল স্ব স্ব বাদ্য যন্ত্র নিয়ে বসেন এবং তাদের পাশে বসেন প্রম্পটার। ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ও পোষাক বাংলা যাত্রা দলের অনুরূপ। নারী চরিত্রে নারীর স্থলে পুরুষরাই অভিনয় করে থাকেন। তবে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পরিবেশনের সময় দৈর্ঘ্য বিবেচনায় পাংখুংকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথা- ক। অনুজাইত্ পাংখুং (স্বল্প দীর্ঘ পাংখুং)
খ। জাইগ্রী পাংখুং (দীর্ঘ পাংখুং)

ক। অনুজাইত্ পাংখুং (স্বল্প দীর্ঘ পাংখুং): অনুজাইত্ পাংখুং (স্বল্প দীর্ঘ পাংখুং) সাধারণত একরজনীতে পরিবেশন সমাপ্ত করা যায়। অনুজাইত্ পাংখুং এর ১১টি পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছে এবং তা বর্তমানেও প্রচলন আছে। এ গুলোর নাম হল- ১. থাম্র ২. লংমায়া ৩. কঃকানু ৪. রামা ৫. সাইতাথানু ৬. ওয়াইচাকুমা ৭. মঃনঃ ৮. লংচাইন্দা ৯. চোঃমালাপ্রু ১০. মেচাইন্দা ১১. বদ্রওয়েথু।

খ। জাইগ্রী পাংখুং (দীর্ঘ পাংখুং): জাইগ্রী পাংখুং (দীর্ঘ পাংখুং) পরিবেশন সমাপ্ত করতে দ্বি-রজনীর প্রয়োজন হয়। এর ২০টি পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এর মধ্যে কেবল ছয়টি পাণ্ডুলিপি বর্তমানে তথ্য সংগৃহীত এলাকায় প্রচলিত আছে বলে জানা গেছে। গুলোর নাম হল- ১. ম্-হ্-রী ২. ফ্-লুঃমাং ছাংজোয়ে ৩. শোয়েফংদ ৪. উইজেয়া ৫. সিলাবাঙ ৬. ওয়েসাইন্দ্রা ৭. বর্তমানে বাকি চৌদ্দটি অপ্রচলিত পাংখুং গুলোর নাম হলো– ১. তেমী ২. জনাক্ষা ৩. সুওয়াঞ্জাসামা ৪. নেমী ৫. পুরীদ্দা নাঘাঃ ৬. চাইন্দা কুমার ৭. নারদা ৮. উইথুরা ৯. উঃদ্-না ১০. মাগালুংলাং ১১. মাংসা ১২. গোঃ সাঃল্-না ১৩. ওয়ংগ্রইং ১৪. সাংজোয়ে।

মারমা পাংখুংসহ নানা গীত, আখ্যান ও কাহিনি মারমা হরফেই লেখা থাকতো। যাঁরা এই গীত, আখ্যান ও কাহিনি ব্যবহার করেন, তাঁরা যত্ন করে একটি বিশেষ কাগজে মারমা হরফে এগুলো লিখে রাখতেন। মারমা হরফের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো–

মারমা বর্ণমালা

মারমাদের ধর্মগুরুরা নানা ধর্মীয় পুঁথি ও মন্ত্র-তন্ত্র লিখে রাখার জন্য তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করেন। অনেকটা বার্মিজ বর্ণমালার অনুরূপ মারমা বর্ণমালায় আঃ আক্খ্রা বা স্বরবর্ণ রয়েছে ১২ টি এবং ব্যয়ঞ আক্খ্রা বা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩ টি। বর্ণমালাগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল–

আঃ আক্খ্রা (স্বরবর্ণ-১২টি)

အ আঃ	အာ আ	ဣ ইঃ	ဤ ঈ	ဥ উঃ
ဦ উ	ဧ এ	အဲ এহ্	ဩ অঃ	ဪ অ
အံ এইং	အား আহ্			

www.pathagar.com

ব্যয়ঞ্জ আক্খ্রা (ব্যঞ্জন বর্ণ -৩৩টি)

𑄇 কাঙ্গ্রী	𑄈 খাঃখুয়ে	𑄉 গাঃঞে	𑄊 ঘাঙ্গ্রী	𑄋 ঙাঃ
𑄌 চাঃলুং	𑄍 ছাঃলিং	𑄎 জাঃগুয়ে	𑄏 ঝাঃম্রাংছুয়ে	𑄐 ঞাঃ
𑄑 টাঃসলাংখে	𑄒 ঠাঃওয়েংবে	𑄓 ডাঃরেংগৌ	𑄔 ঢাঃরিমু	𑄕 নাঙ্গ্রী
𑄖 তাঃওয়েংবু	𑄗 তাঃছেংথু	𑄘 দাঃদুয়ে	𑄙 ধাঃউখ্রহ্	𑄚 নাঃঞে
𑄛 পাঃজৌ	𑄜 ফাঃউথু	𑄝 বাঃথাখ্রহ্	𑄞 ভাঃগুং	𑄟 মাঃ
𑄡 য়াঃ	𑄢 রাঃগৌ	𑄣 লাঃ	𑄤 ওয়াঃ	𑄥 সাঃ
	𑄦 হাঃ	𑅄 লাঙ্গ্রী	𑄃 আঃ	

চাকমা গেংখুলি গীত : চান্দবি বারমাসী

চান্দবি বারমাসী একটি চাকমা পালাগীত, যা চাকমা ভাষায় গেংখুলি গীত নামে বেশ জনপ্রিয়। এটি চান্দবি বারমাস্যা নামে চাঙমা বর্ণে লিখিত একটি বারমাসী পালা। এই গীত পরিবেশনার প্রাক্কালে চাকমা কবিয়ালরা সনাতনী হিন্দু কবিয়ালদের ঢঙে একটি বন্দনা করেন। বন্দনাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

সুলুক

নমং কৃষ্ণনং গুপি সবে বল্লভং
কারণং। কমলানং। পতি ভকত বাঞ্চা পুনঃপুনঃ ॥
ত্রি-ই অংশে জরমে নং। কন্দেত্তং। পায়েনং।
(জিলবাত্তেং। পাবি সর্ব শাস্ত্র)। মা স্বরস্বতি।

www.pathagar.com

পয়ার

নম নম বন্দম মুই প্রভু নারায়ণ।
যাআর কারণে সৃষ্টি এই তিন ভুবন ৷৷
স্বর্গ মর্ত পাতাল জান এই তিন পুরি।
তাআরে বন্দম মুই নমসকার করি ৷৷
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
তাহারে বন্দম মুই ধরিয়া চরণ ৷৷
আদ্য শক্তি মহামায়া বন্দি এগামনে।
যদেক্ক দেবতা বন্দম ধরিয়া চরণে ৷৷
গংগার চরণে বন্দম শিবের ঘরণি।
সহস্র প্রণাম করম লুটায়া ধরণি ৷৷
সত্য লাগি প্রিতিম্বিতে থাগে চারি যুগ।
সংসার নরক্ক উনদে উদারিত্তে লুক ৷৷
তাহারি উদ্দেশে মুর' সহস্র প্রণাম।
যাহারি কৃপায় পায়ে মূর্খ লুক দাম ৷৷
বন্দম যে স্বরস্বতি জগত্ত জননি।
অবিরদে কন্দে বসি যগাইব্যা আপনি ৷৷
বৈস মাতা স্বরস্বতি কন্দের উপর।
বারমাসে যগাই দিব্যা অক্ষরে অক্ষর ৷৷
শ্রীরাম লক্ষণ বন্দম ভমিত গরেহ্ পড়ি।
আর পত্তনি বন্দম মুই সিতা থাগুরানি ৷৷
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বন্দি এগামনে।
সাত বার বন্দিলাম সবার চরণে ৷৷
চন্দ্র সুর্য বন্দম মুই করি নমসকার।
দিবারাত্রি ভেদ জান যাহার অধিকার ৷৷
সুরাসুর বন্দম মুই ভকতি করি মন।
বাররাশি নবগ্রহ করিলুম সাধন ৷৷
তির্থ সব বন্দম মুই গয়া বারণসি।
অগিনি কুন্ড বন্দম মুই আর বন্দম কাশি ৷৷
কদেক্ক বন্দিতে পারি তির্থ যে আছয়।
লেগিত্তে বিস্তর হয় পুস্তগেত্তে কয় ৷৷
অশ্বত্থ বৃক্ষ বন্দম মুই‌্র তাল গাছ।
জলমধ্যে বন্দম মুই বড় বড় মাছ।
নদানদি বন্দম মুই সাগর গম্বির।
জলমধ্যে বন্দম মুই হাংগর কুম্ভির।
তায়ন সকলইধু সহস্র প্রণাম।
জ্ঞানি ধ্যানি পদে মুই জানাইলুম সালাম ৷৷

www.pathagar.com

অঝা গুরু আঅ বাপ করি নমসকার।
যাহার সাথে দেগি সকল সংসার ॥
অন্ধজন চক্ষু গুরু বেদে শাস্ত্রে হয়।
গুরুর লাগিয়া প্রভু বৈদেশেত্তে রয়।
ওহার উদ্দেশে মুর সহস্র প্রণাম।
যাহার কৃপায়ে পাই সহস্র সালাম ॥
যেত্তকুর পিতা আদি ভাই গুরুজন।
তাহারে বন্দম মুই ধরিয়া চরণ ॥
চারি বেদ সত্য শাস্ত্র বন্দিলুম হরি।
[আখনে কহিব আমি অশেজ বিচারি]
কিবা ছ-দ কিবা বড় প্রণাম করিয়া।
কহিব চান্দবী কধা শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চার।
তাহারে বন্দম মুই মাগি বড়ি (তার) ॥

সুলুক

সত্যং ত্রেতা দ্বাপরং। কলিযুগং।
এই চারি তাথা। কলি যুগে জরমে নামং।
চান্দবী মানবি কুলেনং। জাতং রূপং
গুণং তিনং কুলং তুলনা দিবার
নাহিক্ক যত ত্রিভুবনং ব্যাপিতং।
রূপং কয়েশ্রী ধন্মধন পন্ডিতং।
নমঃ নমঃ ॥

পয়ার

সত্য ত্রেতা দ্বপর কলি যুগ আর।
কলি যুগে জরমে চান্দ ভুবন মাঝার ॥
রূপে গুনে তিন কুলে কেঅ নাহি আর।
তুলনা দিবার তার কিছু নাহি আর ॥
শুন ওরে লুক একা মন করি।
চান্দবী উৎপন্ন কধা শুন কন্ন ভরি ॥
প্রত্তমে কহিব আমি পয়ারের ছন্দে।
কুনমতে তার মাতাই ধরিলক্ক গর্ভে ॥
দিতিয়ে কহিব আমি লাচারি উপাখ্যান।
কিমতে কান্দিল সেই সব কারণ ॥
তৃতিয়ে কহিব আমি রূপ গুন তার।
চতুত্তে কহিয়া দিম মুই সাজন তাহার ॥

www.pathagar.com

পঞ্চমে কহিয়া দিম মুই তার বারমাস।
যে মতে গাভুরের পুরায় মন আশ ॥
এই পন্‌জ কথা (আমি) কহিব এগন।
একামন হইয়া (লুক) শুন সর্ব জন ॥
অতঃ জর্ম মাসে কথা।

বন্দনা শেষে চাকমা কবিয়ালদের কণ্ঠে চান্দবির জন্মকথা বয়ান হয়। চান্দবি বা সান্দবির জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, সোমবারে সে জল ছিল, মঙ্গলবারে ভ্রূণ হয়েছে এবং বুধবারে তার বুক, শুক্রবারে দুই চোখ, শনিবারে কান ও রবিবারে মাথা গঠিত হয়েছে। এই বিষয়ে পালাকারদের মুখে বর্ণিত হয়েছে–

যক্কনে অইল চান্দ গরভেতে উৎপত্তি।
কনমতে করিলেক্ক গরভেতে বসত্তি ॥
কি খাইয়া রইলেক্ক গরভের ভিদরে।
এগে এগে সব কধা শুন নরলুকে ॥
চারি নালে কাইয়া বিষ ভুক্যন করে বায়ু।
মায়ের চ্চিাচে বারে আপনার আয়ু ॥
সমে দারা মংগলে নাভি বুধে পদায় বুক।
ব্রিহ্‌চপতি বারে পুরিলেক্ক চান্দবীর মুক ॥
শুক্কর বারে স্রিজিলেন তার দুই নয়ন।
যাইত্তে চাইত্তে দিল (দুক্ক) এই তিন ভুবন ॥
শনিবারে কন্ন পদায় রবিবারে মাধা।
দিন কধা শেচ ঐল্য শুন মাসের কধা ॥
এগ মাঘে কাল চান্দ এগ বিন্দু পানি।
দুই মাসে কালে চান্দ পরজিয়ে জানাজানি।
তিনমাসে কালে চান্দ অয়ে রক্ত দলা।
চারি মাসে কালে চান্দ হার মাংস জরা ॥
পুনজ মাসে কালে চান্দ পুনজ ফুল ফুদে।
ছয় মাসে কালে চান্দ উল্লাদে পুল্লাদে।
সাদ মাসে কালে চান্দ সপ্ত শরিল হয়।
আত্ত্য মাসে কালে চান্দ অষ্ট (মুআময়) ।
নয় মাঝে কালে চান্দ পুগা মারি চায়।
দশ মাস দশ দিন পুরাইয়া দুনিয়াত পদায় ॥

তৃতিয় সুলুক
মাতৃ উদরে নং গর্ভে বালিকং বালিকা জাত।
ত্রি ধর্‌ম পালনং (সত মাত্রি সয়ানং জাত।

www.pathagar.com

ত্রি ধরম পালনং) সত্যং কয়ে শ্রী ধরমধন
[পন্ডিততং। নম (২)।]
গর্ভের যাতনা দুক্ক সহন না যায়।
ত্রি ধরম পালন লাগি সহিয়াছে মায় ॥
কন্দক্ক ফুদিলে পায়ে কি করে পরানে।
ত্রি-ধরম পালনা লাগি সহিয়াছে মায়ে ॥

চান্দবির জন্ম ছিল এক বিরল মুহূর্ত। তার জন্মের সময় দেব-দেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন। পালায় উল্লেখিত হয়েছে-

যক্কনে অইল চান্দ ভুমিত্তে শয়ন।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেক্ক যতদেবগণ ॥
জ্ঞাতিবন্ধুগণ মিলি সাধু সাধু বুলে।
জন্মিল সুন্দর কন্যা তুর কর্ম্মফলে ॥

চান্দবির নামকরণের জন্য রাজ্যের নামকরা ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা পরামর্শ করে তার নাম রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এ সম্পর্কে কবিয়ালগণ বিবরণ করেছেন-

ফলবিচি চুম্ব দিয়া বলে ধির বদন।
ভাগ্য উন্দে আসিয়াছে ঘরেতে ব্রাহ্মণ।
হৃষিতে দুইজনে কল্ল্য নিবেদন।
কি নাম রাখিব আমি বলগৈ ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ সগল মিলি কয় হাসি হাসি।
ঝলা উনদে বাহির কল্ল্য তখন যে পানজি।
পন্ডিত ব্রাহ্মণ গনে গনাইয়া চায়।
চান্দবী বলিয়া নাম রাখিলেন তায়।
ভালা নাম বুলিয়াছে বুলিল সগলে।
নানান রত্তন আনিয়ে যে দিল ব্রাহ্মণরে।
নানান ধন দিয়া যদি তুসিল ব্রাহ্মণ।
আনন্দে চলিয়া যায় জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
ইহার হত্তে চান্দবী নাম বলে সর্বজন।
কুন জাত অইবেক্ক বলগো ব্রাহ্মণ।

বাল্যকালে চান্দবি পিতাকে হারায়। মা ও ভাইদের কান্নাকাটি দেখে চান্দবি মাটিতে লুটিয়ে কাঁদে। লাচারি ছন্দে কবিয়াল বলেন-

আহায় বিধি অবরাধ বুক্কে মাল্য বজ্রাঘাত
আচম্বিত্তে বাভ গেল মরি।
ভুমিত্তে লুটায়া কান্দে চিক্কুর নাহিক্ক বান্দে
বাভ শোকে হৈল্য অচেতন।

www.pathagar.com

ভাই বন্ধু সবে কান্দে চিকুর নাহি কেহ বান্ধে
 ভুমিত্তে লুটায়ে ধরণি।
যে মুরে করিব দয়া তেয়্য গেল নিঠুর হইয়া
 কুন মতে থাগিম মুই সে ঘরে।
চারি বৎসর পাইলুম সুখ পনজ বচ্ছর কালে দুখ
 বিধাত্তায়ে করিল নিরাশ।
বাভ শোকে হয়া দুক্কি কান্দের চান্দ অধ মুগি
 মুনিম্মুই যে সাগরে ঝামব দিয়া।
মুর বাভ গেল মরি কনে দিব অন্ন পানি
 বিষ পানে মরিম মুই নিচ্ছয়
ফলবিজি বলে ঝি কি কল্ল্য বিধি না বুঝি
 জিয়নেত্তে হইয়াছি মরা।

যৌবনে চান্দবি রূপে গুণে অতুলনীয় হয়ে ওঠে। তার রূপে যেন আলো ফুটে। কোটি কোটি চন্দ্র তারা যেন তার রূপের ঝলক। গুরুজনের সেবা ও রান্নাবান্নায় চান্দবির তুলনা শুধুই চান্দবি। বহু পাণিপ্রার্থী যুবকদের মধ্য হতে গ্রামের যুবক নোয়ারামের প্রেম প্রস্তাবে সাই দেয় চান্দবি। নোয়ারাম তার কাছ থেকে স্বেচ্ছায় কিছু দেওয়ার জন্য আবেদন করলে চান্দবি তাকে যৌবন উপহার দিয়ে আশ্বস্ত করে। কবিয়ালের গানে চান্দবি-নুয়ারামের প্রেমালাপ বাজে-

একাকি আসিলে ঘাত্তে শুন চন্দ্রমুখি
এগ দুই তিন কধা তুমারে জিগ্যাসি
কুন কধা কহিবা যে কগৈ প্রাণনাথ
মিনত্তি করিয়া বুলিম তুমার সাক্ষাত
হাস্যমুখে কধা কয়ে শুন সুবদনি
কিছু দান দিয়া ঘরে যাইবা আপনি
তুমা রূপ দেখি মুই পড়ি গেলুং ভুলে
কিছু দান দিয়া ঘরে যাইবা (সত্বরে)
নুয়ারামে কইল যদি এ সব বচন
লাজে হেত মাধা করে চান্দবী তখন
কৃষ্ণ বন্ন মুখ যদি দেখিল তখন
হাদেত্তে ধরিয়া তারে বলিল বচন
মন থির কর (দানি) যবুন কর দান
তুমা রূপ দেখি মুই ব্যাকুলিত্ত প্রাণ
অবরূপ দেখি তুর সর্বাংগ সুন্দর
নিত্য কৃষ্ণ সুগে দহয়ে অন্তর
তুমার ভাবে প্রেম করি কলংগে ডুবিলুম মুই
তুমার ভাবে হেথায় আইলুম এই ঘাত্তে চলি

www.pathagar.com

তুমি যদি দয়া কর সুগে নাই মর সিমা
তুমি যদি প্রাণ বধ তুমার মহিমা
এগা মনে এগা চিত্তে যেবা যারে চায়
অবশ্য নিরঞ্জনে তাহারে মিলায়
মন বাঞ্ছা মন পুরে প্রাণি বাঞ্ছা হিয়া
মনে কয়দে মরি যেদুং যুবন তরে দিয়া

চান্দবি-নুয়ারামের প্রেম জমে উঠতে থাকে। তারা পরস্পরকে নিয়ে নিশিদিন ভাবতে থাকে। কিন্তু চান্দবিদের এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় তার ভাই জয়সিংহ ঠেগা অঞ্চলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে মাছ মাংস ও জুমের জন্য জঙ্গলের অভাব নেই। এই সিদ্ধান্ত শুনে চান্দবি দিশেহারা হয়ে যায়। হরিনাম জপতে থাকে। পালাকারদের মতে-

সেই যুক্তি শুনিল যদি চান্দবী সুন্দরী
মনে দুখ পায়ে চান্দ শরিল শ্রীহরি।
কি মতে এরিয়া যাইমু মর প্রাণ নাথ
হৃদয় জলিয়া উদে অনল সন্তাপ।
হৃদয় বিচারি চান্দ এরিল নিশ্বাস
মনে মনে ভাবি চান্দ জুরিলেক্ক তপ।
কত কত যুক্তি কল্ল্যে কহন না যায়
সব যুক্তি ফুরাইয়া ঘরে চলি যায়।

অবশেষে পুরনো লোকালয় ছেড়ে নতুন লোকালয়ের পথে অগ্রসর হয় চান্দবির পরিবার। দুইদিন পর তারা ঠেগা নদীর তীরে পৌঁছায়। স্নান করতে জলে নামে চান্দবি। ভক্তিভরে জল নিয়ে হরিনাম ডাকে এবং এক আঁজলা জল পান করে চান্দবি। চান্দবি গঙ্গাস্তব করে বলে–

তুলশি মালা গলে দিয়া সুন্দর মাদপ
জুর হাত গরি গংগা করে তপ।
স্বর্গেতে আছিলা দেবি নামে সুরেশ্বরি
ভগিরথে আনি হৈলা গংগা ভাগিরথি।
তুমি মাতা সুরেশ্বরি তুমি সে যমুনা
ত্রিজাতি অবলা আমি না জানি মহিমা।
অপরাধ ক্ষেমা কর করিলুম প্রণাম
যেন মতে অভাগিনি পুন্ন হবে কাম।
পুনঃ পুনঃ পদে ধরি প্রণাম যে করি
জরমে জরমে পাইতুম মাগৈ নুয়ারামে পতি।

নোয়ারাম বাণিজ্যের উছিলায় চান্দবিদের নতুন লোকালয় ঠেগায় আসে। নোয়ারামের সাথে দেখা করার জন্য বুনো ফুল দিয়ে নিজেকে সাজায় চান্দবি। কানে দেয় ঝুমকা, নাকে পরে নথ, মাথায় খবং, পায়ে হারু আর টেঙাছড়া গলায় দেয়। এখানে চান্দবির সাথে নোয়ারামের মিলন হয়। সেই মিলনে চান্দবি সন্তানসম্ভবা হয়। চান্দবির মা তার মেয়ের শরীরের পরিবর্তন দেখে জানতে চান, কার বাচ্চা পেটে ধারণ করেছে চান্দবি? মাকে সব কথা জানায় সে। পাড়াময় নিন্দার ঝড় ওঠে। এ কথা নোয়ারামের কানে যায়। নোয়ারাম চান্দবিকে মেনে নিতে চাইলেও তা মা-বাবার পরামর্শে চান্দবির সাথে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে। রাজদরবারে দাঁড়িয়ে নোয়ারাম বলে, তোমার সাথে আমার কোনকালেই দেখা হয়নি। আমার সন্তান তোমার গর্ভে ধারণ করার প্রশ্নই আসে না। কবিয়াল বর্ণনা করেছেন- •

কতদিনে নুগা সাদি আসিল নুয়ারাম
চান্দবি হইল গর্ভ শুনে লুগ থান
নুয়ারামের বাবে মায়ে যুক্তি করি কয়
একশত বাজাইলে তুমি কইবা নয়
কোন দিনে তার সংগে নাহি দ্রশন
লজ্জা নাহি কয়ে সেই আমার নন্দন
বেশ্যা সংগে বেশ্যা মিলি গর্ভে হৈল তার
সুন্দর দেগিয়া মরে কহিল আমার
আকাশের চন্দ্র দেখি শৃগালে ফাল মারে
কত ইজা মৎস্য জলে কহিত্তে না পারে
ক্রোধ ভরে কহিলেক্ক জলন্ত আগুনি
নয়ন ঘুরাইয়া সভা ধানে বসি।

গর্ভের সন্তানকে প্রেমিক নুয়ারাম অস্বীকার করলে চান্দবি যেন আকাশ থেকে পড়ে। নিজে নিজে বিলাপ করতে থাকে। তার বাড়ির লোকজন আর তাকে ঘরে তুলে না। তাই সে কাকুতি মিনতি করে যাতে তাকে অন্তত একটি কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে অনেক দিন কেটে যায়। চান্দবি দ্বিতীয়বার রাজ দরবারে যায়। কিন্তু নুয়ারাম তাকে নানা যুক্তি দিয়ে আবারও অপমানিত করে। সেদিন বাড়িতে ফিরেই তার সন্তান জন্ম নেয়। সদ্য ভূমিষ্ঠ পুত্র সন্তানের মুখ দেখে চান্দবি সব দুঃখ ভুলে যায়।

অন্যদিকে রাজদরবারে মামলার রায় ঘোষিত হয়। রায় অনুসারে নুয়ারাম নির্দোষ প্রমাণিত হয় এবং চান্দবিকে দোষী সাব্যস্ত করে তার ভাই জয়সিংহকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হয়। এতে আরও ভেঙে পড়ে চান্দবি। এমনি এক দুঃখময় দিন অতিবাহিত করতে থাকে চান্দবি। শেষে শীত কনকনে এক রাতে তার পুত্রধন তাকে ছেড়ে চলে যায়। মৃতপুত্র কোলে নিয়ে বিলাপ করে চান্দবি। কবিয়াল লাচারি ছন্দে এই দুঃখময় দৃশ্যের বর্ণনা করেন-

মরাপুত্র কোলে লয়া কান্দে চান্দবি কয়া
আহায় বিধি পুত্র নিলা হরি

www.pathagar.com

বুগেতে চাবর মারে পুত্র পুত্র বুলি ডাগে
কগৈ পুত্র তুমার মায়ের গস্নানি
এই বড় রহিল দুখ ন দেগিম পুত্র মুখ
এই দুক্ক রহিল জীবনে

তারও অনেকদিন পর অবশেষে চান্দবির বিবাহ হয় ফুলচান নামের এক যুবকের সাথে। চুঙোলাঙ পূজো দিয়ে সামাজিক আচার বিধি অনুসরণ করে যথানিয়মে তাদের বিবাহ হয় এবং এরপর থেকে চান্দবি-ফুলচান সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগল। কবিয়াল শেষ বয়ান দেন-

পুঝল মাসেত্ত চান্দ পুস্পে রঝের মালা
পুন্নবার ভাই সংগে অইলেন দেগা
ইষ্টমিত্র ভাই বন্ধু দেগিলেন মুখ
অতি হ্রসিত্তয়ে পাসরিল দুখ
উবুদি নিকটে গিয়ে কইল তরিত
মর সমান দুক্কি নারি নসাই পৃতিম্বিত
ভাগ্য উন্দে পুনশ্চবার আসিলাম বাড়ি
হাঝি হাঝি কয়ে চান্দ হইলাম জেদারানি
এই মতে কত দিন রইল হরিষে
কতশত লুগ আইল জয়সিঙের কাছে
কত কত লুগে তাওে চাইলেন বিয়া
এই কন্যা জন্মিয়াছে ফুলচান লাগিয়া
পত্র লয়ে লাপবাদিয়ে চলিল তখন
উপনিত্ত হৈল গিয়া ফুলচান গুচর
জয়সিঙের ঘরে আছে চান্দবি সুন্দরি
রূপে গুণে সুলক্ষণে (তার) সমান নাইক্য কামেনি
নানান মত রূপ তারে লাপবাদিয়া কয়
এই কন্যা বিয়া কর যদি মনে লয়
লাপবাদির মুক্কে যদি শুনিল বচন
সাত কুড়ি তাগা লয়া আসিল সত্বর
সাত কুড়ি তাগা দিল জয়সিঙ গুচর
এই মতে চান্দবি যদি বিবাহ অইল
নানা উৎসব করি ঘরে চলি আইল
এই মতে তারা যদি আনন্দ অপার
মন সুগে গঙাইল কি কহিব আর
মাগল' মাসেত্ত চান্দ পুরায় বারমাস
তবে সে পুরাই জান দুক্কিনির আশ
শশিরে পাইয়া যেন চন্দ্রের প্রকাশ
এই মতে দুইজনের মনেত্তে উল্লাস।

www.pathagar.com

চাকমা গীতগুলি চাকমা হরফ বা চাঙমা হরফ দিয়েই লেখা থাকতো। সমাজের বৈদ্য, ওঝা ও কবিয়ালরা যত্ন করে চাকমা লেখা চর্চা করতেন। চাকমা হরফের নমুন নিম্নে দেওয়া হলো-

চাকমা গণনা

চাকমাদের নিজস্ব গণনা পদ্ধতি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, চাকমারা কেবল বিশ বা কুড়ি পর্যন্তই গুণতে জানতো। কুড়ির পর এক কুড়ি এট্, দুই কুড়ি এট্ করে গণনা করা হতো। কাল পরিক্রমায় চাকমা ভাষার এখন অনকে উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই বর্তমানে এই ভাষায় কোটি পর্যন্ত গণনার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। চাকমা ভাষায় প্রাচীন গণনা পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো-

১ এক ত
২ দি ত
৩ তিতিরি
৪ তিত

www.pathagar.com

৫ তাল
৬ কদম
৭ বৈলা
৮ নিল
৯ রাজা
১০ মোগর
১১ হাত
১২ ঘাট
১৩ বাবনে
১৪ নিল
১৫ সোনার
১৬ তাত
১৭ ঘন্ডা
১৮ ঘন্ডি
১৯ উন্‌চ
২০ কুড়ি

এভাবে কুড়িটি রাশিতেই চাকমাদের হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যেতো। কুড়ি শেষ হওয়ার পর এক কুড়ি এট্, দুই কুড়ি এট্, তিন কুড়ি এট্, চার কুড়ি এট্ এভাবে পাঁচবার গুণে শত পূরণ করা হতো। তবে বর্তমানে এটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। যার বর্তমান রূপ হলো-

১ এক
২ দুই
৩ তিন
৪ চের
৫ পাচ
৬ ছ
৭ সাত
৮ আত্য
৯ ন
১০ দচ্
১১ এগার
১২ বার
১৩ তের
১৪ চোদ্দ্য
১৫ পন্দর
১৬ সুলো

www.pathagar.com

১৭ সদর
১৮ আদর
১৯ উনচ্
২০ কুড়ি
২১ এগোচ্
২২ বেচ্
২৩ তেচ্
২৪ চোব্বিচ্
২৫ পোজোচ্
২৬ ছাব্বিচ্
২৭ সাদেচ্
২৮ আদেচ্
২৯ উন্ তিরিচ্
৩০ তিরিচ্
৪০ চল্লিচ্
৫০ পঞ্জাচ
৬০ হেত্
৭০ হোত্তর
৮০ আঝি
৯০ নোব্বোই
১০০ একশদ্
১০০০ আহ্ঝার

ত্রিপুরা গীতিকাব্য : পুন্দা তাননাই বা জিজোক পুন্দা উপাখ্যান

পুন্দা তাননাই বা জিজুক পুন্দা উপাখ্যান একটি গীতিকাব্য। সাত ভাগে বিভক্ত এই গীতিকাব্যটি লোক গায়েনদের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে। মধ্যযুগের কোন এক সময়ে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠি বসবাস করতো। সেই সময়কালের ত্রিপুরা জনসমাজের বিভিন্ন কাহিনি এই গীতিকাব্যের উপজীব্য বিষয়। গীতিকাব্যের প্রথম পর্বে গান সৃষ্টির কথা রয়েছে। যেখানে গীতিকাব্যের নায়ক-নায়িকা হেমন্ত ও লালমতির কথোকপথন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে অপর এক নায়ক সুমন্তের গুণ বা যাদুবিদ্যা শিখতে যাওয়ার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে লালমতির পশুরূপী প্রেমিককে ক্রয়ের কাহিনি পরিবেশন করা হয়েছে। চতুর্থ পর্বে গোসাঁই রাজার সৈন্যদের লালমতির পশুরূপী প্রেমিককে ধরতে আসার কাহিনি। পঞ্চম পর্ব্বে সুমন্তের ঘরজামাই উঠার বিবরণ। ষষ্ঠ পর্বে শস্যদেবীর পূজার বিবরণ। সপ্তম পর্বে অন্যের ঘরের জামাতা হিসেবে দংশি দর্প নারান রূপে সুমন্ত কর্তৃক লালমতির ছাগলরূপী প্রেমিককে বধ করার কাহিনি।

www.pathagar.com

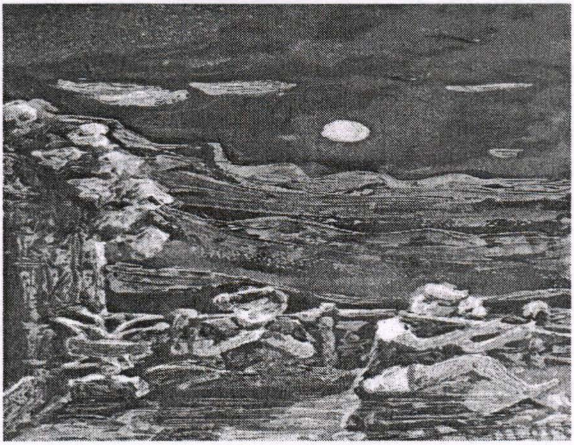

শিল্পীর কল্পনায় লালমতি ও হেমন্তের প্রেমের বিশেষ মুহূর্ত (শিল্পী- মিলন জ্যোতি ত্রিপুরা)

প্রথম পর্ব

পাহাড়ি ছড়ার পাশে একটি ধানী জমি। জমির পাশে একটি জংলা লটকন গাছ। তার পাশে স্বচ্ছ পানির একটি ছোট জলাশয়। জলাশয়ের পানিতে খেলা করে যায় ছোট মাছগুলি। একবার উজানের দিকে যায় তো আরেকবার নিচের দিকে। গোধুলির সময় ঘনিয়ে আসার সাথে গৃহস্থের শুকরের পাল খাবার পাওয়ার আশায় ডেকে চলে। লালমতির মা চুলোয় ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে ছোট লালমতিকে দোলনায় রেখে শুকরের পালকে খাবার দেওয়ার জন্য চলে যান। লালমতির কান্নাকাটি শুনে তার দাদু কোলে তুলে নেন। খাদি দিয়ে লালমতিকে পিঠে বেঁধে নিয়ে হাতে হাতপাখা নিয়ে দাদু পাড়া বেড়াতে নামেন। লালমতিকে পিঠে করে পাড়ার মাঝখানের বুড়ো কাঁঠাল গাছের নিচে পৌঁছালে দাদুর ভাইবোনেরা তাঁকে ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞেস করেন, 'এতো কুচকুচে কালো নাতনিকে কোলে-পিঠে করে বাহাদুরি করার কি আছে? কেউ তো তাকে বিয়েও করবে না।' তা শুনে লালমতির দাদু বলেন, 'আমার ছোট্ট দিদিমণিকে তোমরা এভাবে বলো না। আমি তাকে আর্শীবাদ করছি, সে এমন এক স্বামী পাবে, যার থাকবে অসীম ক্ষমতা।' দেখতে দেখতে একদিন লালমতি যৌবনে পা দিল। পাড়ার স্বাভাবিক নিয়মে অন্য দশজন যুবক-যুবতির সাথে লালমতি মোরগ-ডাকা ভোরে কলাপাতায় মোড়ানো ভাতের মোচা নিয়ে জুমে যায়। জুমে গিয়ে নানা জাতের ধান রোপন করে, রোপন করে নানা সবজি ও বাহারি ফসল। দলে-বলে নির্মাণ করে মাচাংঘর। এমনি এক ব্যস্তময় সময়ে যুবক-যুবতিদের মধ্যে মন দেয়া-নেয়ার পালা চলে। লালমতির সাথে পরিচয় হয় পাড়ার এক সুদর্শন যুবক হেমন্তের। গীতিকাব্যের শুরু লালমতির সাথে হেমন্তের পরিচয় উপলক্ষে কথোপকথন ও হেঁয়ালি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

হেমন্ত: ববই লালমতি খানাদি
আংলাই ন'ন লাই মানগালাক
নুচু বাক্য ন' খাইলাংখা
করং-করই বাই খাইমানাই
কারাং করই বাই বিরমানাই
অ-বতয় চালাছে নুং মাননাই
আংলাই ববইয়া লখিয়ৈ
করং করই-ব' খাইমানয়া
কারাং করই-ব' বিরমানয়া
আংব' নন' লাই লামাঁয়া!

বাংলা ভাবার্থ

হেমন্ত লালমতির উদ্দেশ্যে বলছে- লালমতি লক্ষ্মীটি আমার শোন। সাধ করি ভালোবাসি তোমায়। যে সাধ কখনো পূরণ হবার নয়। তোমার দাদুর শর্তবাক্য শোন- 'বিনাশিঙে যে গুঁতোতে পারে, বিনাডানায় যে উড়তে জানে' সেই হবে সেরা পুরুষ, যে তোমার স্বামী হবে। আমি এক অভাগা পুরুষ। না পারি উড়তে, না পারি গুঁতোতে। তোমাকে পাওয়ার তো আমার কোন উপায় নেই।

লালমতি: হ-রে দাদায়া লখিয়ৈ
নন' অ কক ন' সরো-সা?

বাংলা ভাবার্থ

ওরে আমার লক্ষ্মী নাগর, ওসব আজব কথা কে বলে বেড়াচ্ছে?
হেমন্ত: মিঁয়া গাতিঅ থাঁ-ফুগো
ন-বাচৈ আ-ন সামানি-
নুচু বাক্য ন' খাইলাংখা
নুংলাই দা-লখি খালাংখা
ববই লখি নুং সিয়া
থুগই মুকতরই থাঁলিয়া
চাগই অকনি মাই হাবলিয়া
বাখাগ' দুগু নাংজাকগৈ
নন' সুংমানি খা-কাগৈ
চারাই ফাংসিনি নুং বাই আং-
আসুক মায়া-ন' খাইমানি
আনি কপালগ' লখিয়ৈ
আসুকদৈ চায়া অংথালাং?
(আই হিনৈ হেমন্ত কাবখাই রিসাবাই মুকতৈ হুগৈ রখা)

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ
কাল ঘাটে গিয়ে তোমার বৌদির মুখে সব শুনেছি। কেন এতো ভালোবাসলে আমায়? দাদুর শর্ততো পূরণ হবার নয়। ঘুম নেই এই দুই চোখে এখন অন্ন নেই পেটে। শৈশব হতে কেন যে আমার মনটা তোমায় দিয়েছিলাম। এতকালের সব সাধনা এক নিমিষেই কি ফুরিয়ে যাবে? এই বলে হেমন্ত কাঁদতে থাকলে বুকের রিসা/খাদি দিয়ে তার চোখের জল মুছে দেয় লালমতি।

লালমতি: হ-রে দাদায়া লখিয়ৈ
আন' হিনয় নুং অংজাকখায়
আনি কক খুকসা খানাদি-
নুংবা চালা-সাজালা অংজাগৈ
বুদ্দি হারান' তা অংদি।
. . .
দেশে বেরায়ৈ নায়ৈ ফুং
স-ব' গুন কুরুং রুতুকদি
বিসি চিনৈ নুং বেরাইনি
বাসুক রাং নাংনাই নুং সাদি
বাসুক রি নাংনাই নুং সাদি
ত-ব দেশের ন' বেরায়ৈ
হানি গুন্ ন' নুং সুরুংদি

বাংলা ভাবার্থ
ওগো লক্ষ্মী নাগর আমার। আমায় যদি সত্যি ভালোবাসো। তবে একটা কথা বলি শোন। পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি বুদ্ধিহারা হইও না। দেশ বিদেশ ঘুরে হলেও যাদুমন্ত্র খুঁজে নিয়ে এসো। বারোটি বছরও যদি লাগে তবুও পিছ পা হইও না। অর্থকড়ি কাপড় চোপড় যা লাগে আমি সংস্থান করবো। তবুও দেশ ঘুরে নিয়ে এসো বিশ্বের সেরা বিদ্যা যেখানে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড
পাড়ার আরেক যুবক সুমন্ত। রাজার সৈন্যবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার মানিক দর্প নারানের ছেলে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল লালমতিকে তার মনের কথা বলবে। কথাগুলো বলেই ফেলবে ঠিক করে লালমতির কাছে আসার সময় আড়াল থেকে হেমন্ত আর লালমতির কথোপকথন শুনে ফেলে সুমন্ত। তাই, তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে সে গুণ শিখার জন্য পরদেশের যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লালমতি তাকে দেখতে পারে না। তাই তাকে কোন টাকা পয়সাও দেয় না। মন্ত্র শিখতে যাওয়ার জন্য রাস্তাও বাতলে দেয় না। তাই জেদ ধরে যে কোন উপায়েই হোক তাকে মন্ত্র শিখতেই হবে। আর হেমন্তই বা কেমন ছেলে, একই পাড়ার যুবক হয়েও তাকে কিছুই বলে গেলো না? তাই যে কোনভাবেই হোক তার চেয়ে একটু হলেও বেশি মন্ত্র সে শিখবেই। চারণ গায়েন উল্লেখ করেন-

www.pathagar.com

আইচুক তকজালা কুচুইখাই
সুমন্ত থাঁনানি নাখল খা
কামি ওয়াইসিনি খুলুম ঐ
কামি কালাংগই.ব থাংখা
কামি কালাংগই থায়কালাই
হাতুং না খললৈ ব থাংকা
তৈসা গাতিয়ো কালাইখা
তৈসা গাতিয়ো কালাইখাই
তৈ-ন খুলুমৈ বর বিখা
হা-রে আমায়া মা গংগি
আ-ন কিসা নুং বর রদি
করং করইবাই খায়মানায়
কারাং করইবাই বিরমানায়
অ-ব-তৈ মন্তর নুং মান্নায়
. . .
দেশের শঅর' সগইখা
দেশের শঅর' সইখালাই
বারোই কামিয়ো হাবই খা
বারোই জালানো ফা রিংখা
বারোই-জকমান মা রিংখা

বাংলা ভাবার্থ

মোরগ-ডাকা ভোরে দূর দেশে যাওয়ার জন্য সুমন্ত পথে নামে। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে নিজের গ্রামকে সাতবার প্রণাম করে। নিজ গ্রামকে পিছনে ফেলে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, সুমন্ত চলে বিদেশের পথে। গ্রাম ছেড়ে গিয়ে স্রোতস্বিনী ছড়া পার হয়ে যায়। ছড়া পার হওয়ার সময় থেকে গঙ্গা প্রণাম করে- 'হে মা গঙ্গা, আমায় এমন আশীর্বাদ দিও যাতে আমি শিং ছাড়াও শিঙের কাজ করার এবং ডানা না থাকলেও উড়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারি'।

গ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে শহরে গিয়ে পৌঁছে সুমন্ত। পানচাষীদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয় সে। এক পানচাষীর ঘরে গিয়ে তাদের প্রণাম করে সে। গৃহকর্তাকে বাবা ডাকে আর গৃহকর্ত্রীকে মা ডাকে।

সুমন্তঃ বারোই জালায়া পাপায়ৈ
বারোই জকমায়া মামায়ৈ
নকনি খুরিয়ো লাসিদি
খাচার আবুকন চারদি
নকনি মন্তর রসিদি

www.pathagar.com

বাংলা ভাবার্থ

ওরে পানচাষী গৃহস্থ। তোমরাই আমার বাবা, তোমরাই আমার মা। তোমাদের কোলে ঠাঁই দিও। নিজের সন্তানের মতো করে নিও। মন্ত্র শেখার জন্যই তোমাদের কাছে এসেছি। মন্ত্র যদি কিছু জানো তা-ই দিও।

বারোইজালা: খানাগারাদি বাসায়ৈ
মুংসা মন্তর মানজায়া
. . .
নামাসে মন্তর' ব মাঁনো
হানি ফান গানাং মানৈ নো
ফান ন সাবাইয়ৈ র-মানো
বাসাক পাসানতৈ অংজাকফুং
ব-ন গলেয়ৈ র-মানো
. . .

বাংলা ভাবার্থ

হে আগন্তুক পুত্র আমার। কোনো মন্ত্র যে আমি জানি না। ---- মা-ই যখন ডেকেছো, আমার গিন্নির কাছে গিয়ে খুঁজো। বলবানদের বল সে নিমিষে ভেঙে ফেলতে পারে। পাষাণসম শক্ত শরীর সবকিছু সে গলিয়ে ফেলতে পারে।

এরপর গায়েন বিবরণ দেন-

(অ-দায় বি-সা পাইলাংখা
অন্য দেশেরো থাঁনানি
বিনি মারসানো খাইজাখা)
. . .
(কামার গারামো কালাইখা
কামারনি নকগো হাবইখা
কামার জালানো খুলুমখা
কামার জকমানো মা রিংখা)

বাংলা ভাবার্থ

সেখানে তার একটি বছর কেটে গেল। আরেকটি দেশে যাওয়ার জন্য কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে সে ওঠে। এবার গেল কামারদের গ্রামে। এক কামারের ঘরে গিয়ে কামার পুরুষকে বাবা ডাকে আর কামারের স্ত্রীকে মা ডাকে।

সুমন্ত: বামৈ খুরিয়ো লাসিদি
খুরি সাজালা খাইসিদি

www.pathagar.com

নকনি মন্তর রসিদি
অকগ মাই করই আং ফাইয়ো
খা-গ তয় করই আং ফাইয়ো
নকন অংজাগে আং ফাইয়ো
বামৈ খুরিয়ো লাসিদি

বাংলা ভাবার্থ

আশ্রয় দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে, কোলে আমায় নিও তুলে। মন্ত্র যদি কিছু থাকে এই অধমকে দিয়ে দিও। অন্ন-পানি সব ছেড়ে তোমাদের খুঁজেই এসেছি। আমায় ছেলে করে কোলে নিও তুলে।

কামারজালা: যখন নুং চুংন অংজাগই
চিনি দারিয়ো ফাইজাখা
চুংবা দা তাগৈ চাথানি
ব-র মন্তর' চুং মাননি
চুংলাই মন্তর মানজায়া

বাংলা ভাবার্থ

আমাদের উদ্দেশ্যেই আসছো শুনে খুবই খুশি লাগছে। দা তৈরিই আমাদের পেশা। কোন মন্ত্রে নেই তো নেশা। তোমার জন্য মন্ত্র কোথা পাই?
গায়েন কবি বিবরণ করেন-

যখন গারামো কালাইখায়
কুমার তোক তাকমং ন নুংগইখা
কুমার জালানো ফা রিংখা
কুমার জকমানো মা রিংখা

বাংলা ভাবার্থ

আরেকটি গ্রামের কাছে গিয়ে কুমোরদের হাড়ি-পাতিল তৈরির ব্যস্ততার আওয়াজ শুনতে সুমন্ত। সেখানে গিয়ে কুমোর পুরুষকে বাবা ডাকে আর কুমোর স্ত্রীকে মা ডাকে।

সুমন্ত: খুরি সাজালা খাইসিদি
আংতই দুঃখিয়া জালাবা
নকন অংজাগই ফাইমানি
নকনি মন্তর রসিদি

বাংলা ভাবার্থ

বড়ো দুঃখী ছেলে আমি। আশ্রয় দিও তোমার কোলে। তোমাদের আশ্রয়ের খোঁজেই এসেছি আমি। মন্ত্র যদি থাকে কিছু আমায় তোমরা শিখিয়ে দিও।

www.pathagar.com

কুমোর পুরুষ সুমন্তকে সবচেয়ে কার্যকর মন্ত্র শিখার জন্য যোগী গ্রামে যেতে পরামর্শ দেন। এবার সে যোগী গ্রামের দিকে রওনা করলো। যোগী গ্রামে গিয়ে সুমন্ত যোগীর সংসারে আশ্রয় নেয়।

সুমন্ত: তামা উপায়ন খালাইনাই
নকসে হাল বেহাল নাইজাকনাই
গোসাই রাজানি হা দায়ো
বা-র বিসিনি বিসিংগো
কারাং করই ফুং বিরমায়া লাই
করং করই ফুং খাই মাঁয়া লাই
গাতি খামানি দেমফলো
আনি মানব লাই বিফলো

বাংলা ভাবার্থ

তোমরাই উপায়হীনের উপায়, তোমরাই হালহীনের হাল। গোসাই রাজার দেশে বারো বছরের মধ্যে শিং না থাকলে গুঁতোতে পারে আর ডানা না থাকলেও উড়তে পারে, এমন মন্ত্র শিখে ফিরতে হবে আমায়। না হলে বনে জঙ্গলে পড়ে থাকা অকেজো ফলের মতোই অর্থহীন হবে আমার জীবন।

যুগিজালা: খানাগারাদি বাদুয়ৈ
বতই মন্তর মানগালাক
দেশের বরমানো নুং থাংদি
তিলি থক সেবনাই তংবেলে
তিলি গারামো নুং থাংদি
অ-রসে মন্তর নুং মান নাই
. . .
তিলি গারামো মাঁয়াখাই
অ-র বসবত তা-অংদি
বা-র মাসিনি লাম থাকখাই
সাগর পারসিনি মা বালনো
বা-র দলিয়া মালাইনো
অ-র সে মন্তর মানৈ নাই

বাংলা ভাবার্থ

ওরে আমার সুসন্তান, এমন মন্ত্রতো আমাদের কাছে নেই। ভালো কোন মন্ত্রের জন্য ব্রহ্মদেশেই যাওয়া উচিত। তবে তেলিদের গ্রামে গিয়ে দেখতে পারো। তাদের কাছেও নানা কিছিমের মন্ত্র আছে শুনেছি। তেলিদের গ্রামে যদি পাওয়া না যায়, তবে সেখানে

www.pathagar.com

বেশিদিন অবস্থান করো না। বারো মাসের পথ পাড়ি দিয়ে সাত সাগর পার হয়ে বারো দলিয়াই গিয়ে পৌঁছবে। সেখানেই তোমার মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে।

যোগীদের গ্রাম ফেলে সুমন্ত তেলিদের গ্রামের দিকে রওনা হয়। যেতে যেতে দূর থেকে দেখতে পায় তেলিরা তেল সংগ্রহে ব্যস্ত। সেখানে তেলি সর্দারের পা ধরে প্রণাম করে সে। তাঁকে বাবা ডাকে আর সর্দারনীকে মা ডাকে।

সুমন্ত: বাক্য কক খুকসা খানাগৈ
চালা-সাজালা আং অংগৈ
সত্যগুণ নাইনি আং ফাইয়ো
কারাং করই দোই বিরমানাই
করং করই দোই খাইমানাই
বতই গুণ নাইনি আং ফাইয়ো
নকনি আশ্রয় ন লাফাইয়ো

বাংলা ভাবার্থ

একটি সত্যবাক্য রক্ষা করতে গিয়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তোমাদের কোলে আমায় সন্তান করে তুলে নিও। ডানা ছাড়াই উড়তে শিখতে হবে আমায় শিং ছাড়া গুঁতোতে শিখতে হবে। তোমাদের কাছ থেকেই এই গুণ পাওয়া যাবে বলে জানি। তাই আমায় সন্তান করে প্রশ্রয় দিয়ে তোমাদের মন্ত্র শিখিয়ে দিও।

তিলিজালা: চিনি দারিয়ো মানগালাক
সত্য গুন নাইনি হিনকালাই
. . .
বা-র যুগ পুর্ন খাইনি খাই
ফুকির দেশেরো নুং থাঁদি
অর সে পাষান অংলাংফুং
আরাই গুন ন নুং মা-ন নো
কারাং করই ফুং বির মানাই
করং করই ফুং খাই মানাই
. . .
সাগর অবিলা য়াফাংতৈ
দরা মানুইনি দুমসাগরতৈ
ফুকির রাজ্য গো বালই দি।

বাংলা ভাবার্থ

আমাদের কাছে এরূপ কোনো মন্ত্র নেই। সত্যগুণ যদি পেতে চাও তো, বারো যুগ পূর্ণ করার জন্য ফকির দেশে যেও। আর যতই পাষাণসম শক্ত হোক, সে পাষাণ তুমি

www.pathagar.com

গলাতে পারবে। এমন গুণ তুমি পাবে, যাতে তুমি ডানা ছাড়া উড়তে পারো আর শিং ছাড়াও গুঁতোতে পারো। সাগর অবিলা পার হয়ে, দুম সাগর পাড়ি দিয়ে ফকির দেশে তুমি যেও।

এরপর সুমন্ত বামন গ্রামে গিয়ে পৌঁছে। বামন গ্রামে গিয়ে বামন-বামুনীকে মা-বাবা ডেকে মন্ত্রের হদিস জিজ্ঞেস করে-

সুমন্ত: ব-ক দেশেরো গুন মাননাই
ব-ক রাজ্য গো গুন মাননাই
ব-ন খানাগৈ ফাইমানি
নকনি গারামো তং দৈ তং?

বাংলা ভাবার্থ

কোন দেশে গেলে আমি এমন গুণ পাবো? তার জন্যই এসেছি। এই গ্রামে আছে কি?

বামন: ব-তই মন্তর মানগালাক
ব-তই মন্তর লানিখাই
সাগর পার বালৈ নুং থাঁদি
থাঁনি হিনৈ ফুং থাঁমায়া
হাইচিং বালুদুম লুতুগৈ
. . .
কালি শশানো আচকদি
কালি আরাধন খায়ইদি
. . .
কারাং করইয়ৈ বিরমান থং
করং করইয়ৈ খাইমান থং
যেনো বর বি নুং বর মান থং

বাংলা ভাবার্থ

এমন গুণতো এই গ্রামে কেউ জানে না। তেমন মন্ত্র পেতে হলে সাগর পাড়ে যাও। যেতে চাইলে যে কেউ সেখানে যেতে পারে না। বালুর চরে গিয়ে ধ্যান করো। কালি শ্মশানে গিয়ে ধ্যানে বসো। কালির আরাধনা করো। তা করতে পারলেই ডানা ছাড়া ওড়ার এবং শিং ছাড়া গুঁতোবার গুণ তুমি পাবে।

বারো দলিয়া পার হওয়ার পর সুমন্ত গোঁসাই রাজার দেশের সীমানা পেড়িয়ে যায়। রাজ্যের শেষ সীমান্তে সাগরের তীরে গিয়ে উপস্থিত হয়। কাঁধের বোঝা নামিয়ে সাগরে নেমে স্নান করে নেয়। স্নান করে পুত-পবিত্র হয়ে কালী শ্মশানে গিয়ে কালীর আরাধনায়

www.pathagar.com

নিমগ্ন হয়। অন্ন-পানি ত্যাগ করে দিনরাত তপস্যায় বসে থাকে। তার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মা দূর্গার মায়া উদয় হয়। দূর্গার মনের অবস্থা গায়েন কবি বিবরণ করেছেন-

সব আরাধন খাইজালাং
বতৈ ককবতি খা-কাগই
ফুকির দারিয়ো খা রখা
. . .
ফুকির গাইতিয়াল অংনাই বো
য়াকনি পাংগাইনো ব লাগৈ
রুংনি গলাইয়ো আচকখা
রুংনো ছারিয়ৈ ব রখা
. . .
ইজাং তৈরুকুং সকপাইখা
. . .
রুংগো কাসিদি হিনকালাই
থাংগই রুং রমই কাসাকা
ফুকির রাজ্যগ সগৈ খা
থাংগৈ ফুকিরনো বজেখা
ব-ন গোঁসাইনো রমৈখা
ফুকির কালা বই কারিখা
নখা বিসিনৈ ব নাইখা
সাল্‌ল বইনো ব নাইখা
হ-রো পরিক্ষা ন খালাইখা
অ-রনি কারাং করইয়োই বিরমানখা
কালি তব খাইয়ৈ বর মানখা
ফুকির অংসিদি হিনসাখা
বা-র বসরনো কারগৈ।

বাংলা ভাবার্থ

কে আমার আরাধনা করে? তার মনের বাসনাতো পূরণ করতেই হয়। এই বলে দূর্গারূপী কালী ফকিরের মনে সহযোগিতার মনোভাব উদয় করে দেয়। ফকিরের মাঝি তার নৌকা নিয়ে সুমন্তের কাছে এসে বালুচরে উপস্থিত হয়। নৌকোয় ওঠার আহবান শুনে সুমন্ত বালুচর থেকে নৌকোয় গিয়ে ওঠে। দরবারে গিয়ে ফকিরের দু'পায়ে ধরে প্রণাম করে তাঁকে গুরু মানে। ফকির তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের বই বের করে সুমন্তের হাতে তুলে দেন। দুই বছর ধরে সেই বইটি অধ্যয়ন করতে থাকে সুমন্ত। দিনে অধ্যয়ন করে আর রাতে গুণ পরীক্ষা করে। এভাবে করতে করতে সে ডানা ছাড়া উড়তে সক্ষম হয়ে ওঠে। এভাবে বারোটি বছর তপস্যা করে সুমন্ত নানা গুণ শিখে ফেলে।

www.pathagar.com

তৃতীয় খণ্ড

এদিকে হেমন্তও বেরিয়েছে মন্ত্র শেখার অভিযানে। নিজের গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে সে প্রথমে শহরাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে। সেখান থেকে পতিগ্রামে গিয়ে প্রবেশ করে। সেখানে মন্ত্রের ব্যাপারে কোনো হদিশ না পেয়ে সে বারো বাজার, ষোল বিভাগ, তেরো গলি ঘুরে দেখে। কোথাও যুৎসই উৎস সে খুঁজে পায় না। পরে আবার এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরতে থাকে। বহু গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। কোথাও মন্ত্রের খোঁজ মেলে না। বড়ো দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় হেমন্ত। এবার সাগর পাড়ি দিয়ে বহু দূরে গিয়ে অনুসন্ধান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় সে। সাগর পারের বালুচরে গিয়ে সে বসে। কিন্তু সাগর পারাপারের কোনো উপায় সে খুঁজে যায় না। তাই বালুচরে বসে ফকিরের আরাধনায় বসে হেমন্ত। এভাবে সাত দিন সাত রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে আরাধনা করতে থাকে হেমন্ত। তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ফকিরবাবা নৌকা পাঠিয়ে হেমন্তকে সাগর পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে নৌকা মাঝি হেমন্তকে নিতে আসে। মাঝি শর্ত দেয়, ওপারে যাওয়ার পর আর ফিরে আসার জন্য নৌকা ব্যবহারের বায়না ধরা যাবে না। হেমন্ত শর্ত মেনে নিয়ে সাগর পাড়ি দেয়। ফকিরবাবাকে ভজন করে হেমন্ত তার এখানে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। ফকির তখন তাঁর কালো বই বের করে দিয়ে কোন মন্ত্র পছন্দ শিখে নেওয়ার জন্য বলেন। দিনরাত কালো বই পড়তে পড়তে বারোটি মাস কখন যেন পেরিয়ে যায়। হেমন্ত কালো বই পড়ে কোনো ফলাফল লাভ হয়নি বলে ফকিরকে জানায়। ফকির আরো একটি বই দেন। সেই বই আরো বারোটি মাস ধরে পড়তে থাকে হেমন্ত। সেখানে কোন যুৎসই মন্ত্র পাওয়া যায়নি বলে আরো একটি বই নিয়ে পড়ে হেমন্ত। এভাবে তিন বছর ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে পড়তে থাকে হেমন্ত। এক সময় দেখা গেল, সারাদিন বিরামহীন মন্ত্রের বই পড়ার পর রাতে হঠাৎ তার শরীরের আকার আকৃতি পাল্টে যায়। পশুর মতো চেহারা হয়ে যায় তার। হেমন্ত ফকিরকে গিয়ে বলে, আপনার তিনটি বই পড়ার পর রাতে আমার রূপ পশুর মতো হয়ে যাচ্ছে। এখন কি উপায় হবে? ফকির আরো একটি বই দিলেন। তা দিনরাত পরিশ্রম করে পড়তে থাকে হেমন্ত। এভাবে আরো এক বছর অধ্যয়ন করে হেমন্ত। কিন্তু পশুর রূপ তার পরিবর্তন হয় না। ডানা ছাড়া উড়তে পারে না। তবে শিং ছাড়াই গুঁতো মারতে পারে। ফকির তাকে দূর্গা বন্দনা করার জন্য উপদেশ দেন। মা দূর্গা শিবসহ হেমন্তের বন্দনায় তুষ্ট হয়ে সাক্ষাত দিয়ে তার কি বর চাই জানতে চান। হেমন্ত বলে-

হেমন্ত: পশু বাসাকনো সি-নানি
নকনো আরাধন খালাইয়ো

. . .

পশু বাসাকনো মানৈ আং
যেফুং তানৈ ফুগু চা-মানো
বুজাক তকজাকগৈ থুই-মানো

বাংলা ভাবার্থ

পশুর শরীর আমি কিভাবে ত্যাগ করবো। এজন্যই তোমার আরাধনা করি মাগো। আমার পশুর শরীর যে কেউ কেটে খেতে পারে। যে কেউ মেরে ফেলতে পারে।

দূর্গা: ন-ন কাইসাবো তানমায়াতৈ
নিনি সাক অংথং হলংনি
সালাই সৌদানি নুং মানথং
নিনি য়াকুং অংথং লুয়ানি
করং অংথং হিরানি
খুন্জুর অংথং কাঞ্চননি
খিতং অংথং রাংচাকনি
মকল অংথং মানুই-নি
য-ত সম্পুর্ন অংরখা
বা-র বিসিনি বিসিয়ো নুং
পশু বাসাকবাই মাতংনাই
সালঅ খাই পশু নুং অংগৈ
হরঅ খাই মিনিসর অংমানাই
বা-র বিসিনো কি-রগৈ
তের' বিসিনো সকগৈখাই
নিনি বাসাকনো নুং মাননাই
ইঁ হানি রাজা গরজামা
আইফুসে নুং অংজাকনাই

বাংলা ভাবার্থ

তোমাকে যেন কেউ কাটতে বা মারতে না পারে, সেজন্য তোমার শরীর করে দিলাম পাষাণের। জিহ্বা করে দিলাম সীসার, পাগুলো লোহার হোক, শিং দু'টো হোক হীরার। কান দু'টো হোক রৌপ্যের, লেজটি হোক স্বর্ণের, চোখ দু'টো হোক মানিক। সবকিছু পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তবে বারোটি বছর এই পশুর রূপ নিয়ে থাকতে হবে তোমার। দিনে তুমি পশুর রূপেই থাকবে, রাতে তোমার আসল মনুষ্য রূপ ফিরে পাবে। বারো বছর পার হয়ে ত্রয়োদশ বছরে পা দিলে তুমি তোমার রূপ ফিরে পাবে। তখন তুমিই হবে বিশ্বের সেরা পুরুষ। তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে এমন পুরুষ দ্বিতীয় কেউ থাকবে না। তুমিই হবে রাজার রাজা।

মা দূর্গার সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত ঘটনা হেমন্ত এসে ফকিরবাবাকে অবহিত করে। ফকির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন বারোটি বছর ধরে এই পশুরূপী হেমন্তকে কোথায় কিভাবে আগলে রাখবেন ভেবে। হেমন্ত ফকিরকে অনুরোধ করে-

www.pathagar.com

হেমন্ত: আনো কিসা নুং তিলাংগই
বার' হাতিয়ো বালরগৈ
সাকনি দেশের' তিলাংগই
আনো ফালৈ নুং সিসিদি
কিন্তু কক খুকসা আং সানো
ফুকির খানাদি গোঁসাই নুং
আনো যে পাইনি ফাইয়ো-ন
য়া-গ দূর্বাসক তৈ-তিয়ই
আনি কতক ন কাবাকগৈ
য়াকনি দূর্বান' চার' মানাই
বিনি দায়' সে ফালদি নুং
পাই পৈচা ফ মানখালাই
বিনি দায়' সে রদি নুং
বিনি বাদে লাই তাফালদি
সাইসি কুরু দক মুলুকফুং
হানি রাংগানাং অংলাংফুং
রাজা গরজামা অংলাংফুং
বিনি দায়' নুং তাফালদি

বাংলা ভাবার্থ

ওরে আমার ফকির বাবা! আমাকে নিয়ে তুমি বারোটি বাজার পার করিয়ে আমার দেশে নিয়ে বিক্রি করে দিও। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রইল, আমাকে যে কিনতে আসবে সে নিজের হাতে আমার গলা জড়িয়ে হাতের দূর্বা খাওয়াতে পারলে তার কাছেই বিক্রি করে দিও। সে যত কম পয়সাই দিক তার কাছেই বিক্রি করে দিও। কিন্তু দুনিয়ার যতই পয়সাওয়ালা মানুষ আসুক। দুনিয়ার যতই বড়ো রাজা মহারাজা আসুক। হাজার দশেকের বেশি দাম দিলেও তার কাছে কোনমতেই বিক্রি করো না।

রাতে হেমন্ত লালমতির স্বপ্নে গিয়ে দেখা দিয়ে বলে-

হেমন্ত: আংলাই মাননিয়া লখিসা
কারাং করইবাই বিরমানাইনো
করং করই খাইমানাইনোসে মানসিয়ো
পশু বাসাকসে মানসিয়ো
নুংবা লাফাইয়া হিনকালাই
আংলাই ফাইমাঁয়া মাতংনাই
ফুকির জালানো সাগৈ আং
বার' হাতিয়ো কাগৈ নো
ফুকির জালানো কক রখা

যেবা পাইনানি ফাইকালাই
আনি কতকনো কাবাকগৈ
য়াকনি দুর্বাসক চার' মানাই
পৈচা থকসাফুং রমানথং
বিনি দাইয়ো নুং মাফালনাই

বাংলা ভাবার্থ

ডানা ছাড়া ওড়ার মন্ত্র আমি পেলাম না লক্ষ্মীটি। শিং ছাড়া গুঁতোনোর মন্ত্রটিই শুধু পেয়েছি। মন্ত্র শিক্ষা পূরণ না হওয়ায় পশুর শরীরটাই পেয়েছি আমি। তুমি যদি আমায় নিতে না আসো, তাহলে আমার পক্ষে তোমার কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না। ফকির বাবাকে বলে আমি বারোটি হাট পেরিয়ে আমাদের পাশের হাটে আসবো। আমি ফকির বাবাকে বলেছি, যে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাতের দূর্বা খাওয়াতে পারবে। কম পয়সার বিনিময়ে হলেও তার কাছেই আমাকে বিক্রি করবে।

প্রেমিকের এই দুর্দশার কথা শুনে লালমতি দিনরাত বিলাপ করে কাঁদতে থাকে। সকাল হলে ঘাটে জল তুলতে গিয়ে পাড়ার বান্ধবি ও বৌদিদের সাথে দেখা হলে তার দুঃস্বপ্নের কথা সকলকে শোনায় লালমতি। তার বান্ধবি ও বৌদিরা তাকে স্বপ্নের নির্দেশনা অনুসারে পশুরূপী প্রেমিককে কিনে আনার জন্য পরামর্শ দেয়। লালমতি তার ভগ্নিপতিকে হাটে গিয়ে পশুরূপী প্রেমিককে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করে। লালমতি তার ভগ্নিপতিকে প্রথমে কাজি হাতি (কাজিরহাট) গিয়ে দেখতে বলে। সেখানে স্বপ্নের নির্দেশনা অনুসারে ছাগল না পেলে নারান হাতি (নারায়নহাট), সেখানে না পেলে বিবি হাতি (বিবিরহাট), বিবিরহাটে না পেলে বার দলিয়া, সেখানেও না পেলে সাগরের পারে গিয়ে সকল রাস্তায় তন্নতন্ন করে খোঁজার অনুরোধ করে। সেসব স্থানে না পেলে লালা হাতি (লালার হাটে) দেখে আসার অনুরোধ করে। লালমতি প্রয়োজনীয় সব টাকা পয়সা দিয়ে তার ভগ্নিপতিকে প্রেমিকের সন্ধানে পাঠায়। ভগ্নিপতি তাঁর শ্যালিকার বিবরণ অনুসারে সকল স্থানে খুঁজে বেড়ান কাঙ্ক্ষিত ছাগলটির জন্য। কোন কোন হাটে অনুরূপ ছাগলের বিবরণ কোনো কোনো হাটমুখি বা হাটফেরত মানুষের মুখে শুনলেও তিনি তার সন্ধান পান না। সাতদিন সাতরাত বিভিন্ন স্থানে ঘুরে হাতের টাকা-পয়সা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় ভগ্নিপতি বিফল মনোরথে ফিরে আসেন। খালি হাতে ভগ্নিপতির প্রত্যাগমন দেখে লালমতি বুক চাপড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদতে থাকে।

লালমতি একদিন স্বপ্নে দেখে, স্বচ্ছ একটি জলাশয়ে ছোট্ট মাছগুলি খেলা করছে। পাশের একটি লটকন গাছে অনেকগুলো লটকন ধরেছে। লালমতি তার স্বপ্নের কথা দাদুকে গিয়ে বলে। দাদু তাকে বলে, তোমার একটি সুখবর আসছে। পুরনো একটি দোকান থেকে রূপোর আংটি কিনে আঙুলে পরলে তোমার সুদিন আসবে।

দাদু লালমতিকে আংটির দোকানে যাওয়ার পথ বাতলে দেয়। দাদুর নির্দেশনা অনুসারে সাত পাহাড় পার হয়ে, সাতটি ছড়া পাড়ি দিয়ে, সাতটি খাদ পার হয়ে, ধানী জমির পাশ দিয়ে, ডানের উপত্যকাকে পাশ কাটিয়ে, মুলি বাঁশের ঝাড়ের নিচ দিয়ে, বামপাশের জমিতে বুড়ো বটগাছটিকে পিছনে ফেলে, লিচু সুপারি ও নারিকেল গাছের সারির পরের বারোই গ্রাম, তারপর কামার গ্রাম, এরপর কুমার গ্রাম আর যুগি গ্রাম পার

www.pathagar.com

হলে তেলিদের গ্রাম পার হয়ে লালমতি আংটি কিনার জন্য বারো বাজারের দিকে যেতে থাকে। গ্রামের পথ শেষ হলে কাজিরহাট, বিবিরহাট ও নারায়নহাট পার হওয়ার পর বার দলিয়ার পাশে লালারহাটে পৌঁছে। লালারহাটের পর বারো দোকানের মাঝখানে তেরো পাড়ার ভিতরে শংকর স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় লালমতি। পথে পথে আংটির দোকানে যাওয়ার পথ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আংটির মাহাত্ম্য শুনে বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লার নারীরা লালমতির সাথে আসে। স্বর্ণকারকে তিনি সত্যি আংটি বানান কি না জানতে চাইলে তিনি হ্যাঁ বোধক উত্তর দেন। অমনি লালমতির সাথে আসা সব নারী-পুরুষ আংটি কিনতে শুরু করে। লালমতি একটি আংটি নিয়ে দাম দিতে চাইলে স্বর্ণকার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে-

স্বর্ণকার: আচু সাক কুসুং তাকমানি
আপা কুসুংসা তাকমানি
আনি সাক কুসুং অংমানি
জনম ফালমাঁয়া তংমানি
তাবক নুং ফাইয়ৈ সকফাইয়ৈ
য়াইতাম কুলুকয়া অংলাংখা
তামা য়াইতামনি দাম লানি?

বাংলা ভাবার্থ
পিতৃমহের ও পিতাদের জীবনে এবং আমার জীবনের দীর্ঘ পথে মনের মাধুরি দিয়ে গড়েছি এক একটি আংটি। অনেক আংটি অবিক্রিত থেকে যেতো সবসময়। তুমি এসে আজ আংটি বানিয়ে আর কুলোতে পারছি না। তোমার কাছ থেকে দাম নিই কোন মুখে?

লালমতি: দেশে বেরেয়োই ফাইতিয়ৈ
আংলাই বুরুই নি সা বুরুই
য়াইতাম মাংগানা লাখালাই
হা-নি বরনামনো মাঁ-ননো

বাংলা ভাবার্থ
দেশ-বিদেশ ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি এক অবলা নারী। তোমার কাছে বিনামূল্যে অংটি নিলে দেশ দুনিয়ার মানুষ বদনাম করবে।

স্বর্ণকার: নুংলাই মাংগানা বিজায়া
আংসে মাংগানা রমানি
তমই কলংক অংনানি?

বাংলা ভাবার্থ
তুমি তো আর বিনামূল্যে চাওনি। আমিই তো নিজ থেকে দিচ্ছি তোমায়। এতে বদনাম বা কলংকের কি আছে?

www.pathagar.com

আংটি কিনে দলবল নিয়ে লালমতি এবার তার পশুরূপী প্রেমিকের খুঁজে ফকিরের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ফকিরের কাছে বন্দনা করে লালমতি ফকিরের ছাগলটাকে তার কাছে বিক্রির জন্য অনুরোধ করে। ফকির ছাগলটাকে কেনার জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীর কথা লালমতিকে জানিয়ে দেন। লালমতি সকল শর্ত মেনে ছাগলটার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে ঘাস খেতে দেয়। ছাগলটি তার হাতের ঘাস খেয়ে নিলে লালমতি কৌশলে ছাগলের গলায় দড়ি পরিয়ে ধরে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলে লালমতির জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। কিন্তু পশুরূপী হেমন্তের অসীম শক্তির কথা জানতে পেরে এলাকার যত ব্যবসায়ী, সওদাগর, মহাজন ছাগলটাকে নিজের আয়ত্তে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কেউ লোহার শিকল দিয়ে, কেউবা রূপোর শিকল দিয়ে এবং কেউবা তামার দড়ি দিয়ে ছাগলটিকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। তাদের সকল শিকল ও দড়ি ছিঁড়ে ছাগলটি লালমতির সাথে গেলে সবাই হাল ছেড়ে দেয়। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত লালমতি তার প্রেমিককে নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে।

চতুর্থ খণ্ড

নিজ গ্রামে ফিরে আসলে গ্রামবাসী সকলে মিলে লালমতি ও তার পশুরূপী প্রেমিক হেমন্তকে ঘিরে দেখতে লাগলো। সকলে মিলে ছাগলটির জন্য ঘর বানিয়ে দিল। ছাগলটি সারাদিন গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। রাতে ঘরে বন্দি থাকে। দেড় মাস এভাবে চলার পর হঠাৎ ছাগলটি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আজ কারোর ফুলের বাগান নষ্ট করলো তো কাল কারোর ফুলে কলি খেয়ে ফেলে। আরেকদিন কারোর ঘরের খুঁটি ভেঙে ফেলে অথবা উঠোনের ঘেরা ভেঙে দেয়। গ্রামবাসীরা লালমতিকে তার ছাগল বেঁধে রাখার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু সারাদিন ঘরে বন্দি করে রাখলে ছাগলটি কি খাবে? তাই লালমতি কোনমতেই ছাগলটিকে বেঁধে রাখে না। এতে ছাগলের বেপরোয়া ভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। কখনো জ্বালানি কাঠ খুঁজতে যাওয়া নারীদের ঝুড়িতে গিয়ে গুঁতো মারে, কখনো বাঁশ কাটতে যাওয়া যুবকদের পিছনে তাড়া করে। শিশুরা উঠোনে খেলা করলে সেখানে গিয়ে ভয় দেখায়। নারীরা কলাপাতা কাটতে গেলে সব পাতা গিয়ে খেয়ে ফেলে। গ্রামবাসীরা লালমতির ছাগলে বিরুদ্ধে গ্রাম প্রধানের কাছে নালিশ দেয়। কিন্তু লালমতি নানা যুক্তি দিয়ে পার পেয়ে যায়।

এক রাতে লালমতির বৌদি দেখতে পায়, লালমতির ছাগলটা দিব্যি হেমন্তের রূপ ধরে লালমতির সাথে বসে প্রেমালাপ করছে। লালমতির বৌদি বিষয়টিকে গ্রামের কয়েকজনকে বলে। গ্রামবাসীরাও গোপনে গিয়ে তাদের এই গোপন অভিসারের দৃশ্য দেখে আসে। এদিকে দিনের বেলা ছাগলটির উপদ্রব দ্বিগুণ বেড়ে গেল। জুমে আর কোনো সবজি অবশিষ্ট থাকলো না। ফুল বাগানে রইলো না কোন ফুল। শিশুরা ভয়ে খেলা করতে পারলো না উঠোনে। নারীরা যেতে পারলো না তাদের দৈনন্দিন কাজে। পুরুষরা ভয়ে ঘরে বন্দি থাকলো। গ্রামের সকলে মিলে রোয়াজার (গ্রামের প্রধান) নিকট আবার আপত্তি জানালো। রোয়াজা বিচার করে লালমতিকে সাত টাকা জরিমানা করলো। সে রাতে লালমতি আবার তার প্রেমিকের সাথে দেখা করে।

www.pathagar.com

লালমতি: সালো খাই তামানি খিরি নুং
আসুক খতিনো খালাই নুং
য-ত পারানি বরক রক
আনো রাং পৈচা সুরইদং

বাংলা ভাবার্থ

দিনে এতো দুষ্টুমি করো কেন? অন্যের এতো ক্ষতি করো কেন? তোমার জন্য কতো টাকা-পয়সা ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে আমার খেয়াল আছে তোমার?

হেমন্ত: আংলাই সাজাকফা বারেবার
পশু আত্মানো মানখালাই
আংলাই মুংসানো সিজায়া·
নুংবা কতকনো দুক রদি
আনি করেয়ো তংজাদি

বাংলা ভাবার্থ

আমি তো তোমায় বারবার বলেছি লক্ষ্মীটি। পশুর শরীর পেলে আমি দুনিয়ার কিছুই মনে করতে পারি না। তুমি আমার গলায় দড়ি দিয়ে রেখো। সবসময় আমার পাশে পাশে থেকো।

লালমতি: আংলাই বিরকসা সা বিরক
জনম তাংয়াগই তংখালাই
সব-বা আনো চারোনাই
ফাবুরা কাইসা তাংনাইবাই
যতনো তামাবাই চারোনাই

বাংলা ভাবার্থ

আমি তো অবলা নারী। সবসময় কাজ না করে তোমার সাথে সাথে থাকলে কে আমায় কাজ করে খাওয়াবে? বৃদ্ধ একমাত্র পিতা কিভাবে কাজ করে খাওয়াবে আমায়?

গ্রামের লোকেরা এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল। এবার তারা আর রোয়াজা বা মুরচই-এর কাছে নয়, স্বয়ং রাজার কাছে গিয়ে নালিশ জানালো। এ যাবৎ ছাগলটি কি কি ক্ষতি সাধন করেছে, সব বয়ান লিখে তারা রাজার কাছে জমা দিল। রাজা সকল স্বাক্ষী প্রমাণ বিচার করে রাজ্যের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হলেও ছাগলটাকে ধরে আনার জন্য হুকুম দিলেন। রাজার হুকুম পেয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিশাল হাতির পাল ও ঘোড়সওয়ারের দল নিয়ে উজানের দিকে কাঁচাপুর থেকে ভাটির উজিপুর পর্যন্ত ঘেরাও করে ছাগলটিকে ধরার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করা হলো এবং এই কাজে এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য হুকুম জারি করা হলো। গ্রামবাসী ও রাজার সৈন্যরা চারিদিক থেকে ঘিরে ছাগলটাকে হাতের দা, বর্শা, লাঠি ইত্যাদি দিয়ে

www.pathagar.com

আক্রমণ শুরু করলে ছাগলটি তার হীরার শিং দুটো নাড়াতে লাগলো। তাতে বসুমতি, আকাশ, বাতাস নড়ে উঠলো। লোগার পা দুটো নাড়তে শুরু করলে মেঘের গর্জনের মতো আওয়াজ হতে লাগলো। এবার ছাগলটি পাল্টা আক্রমণ করে তাকে ধরতে আসা ষোল হাজার হাতি ও হাজার হাজার ঘোড়া ধ্বংস করে দিল। যারা দা, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে এসেছিল তার পাষাণ দিয়ে তৈরি গায়ের আঘাত করতে লাগলো। এতে সকলে দিকবিদিক হারিয়ে পালাতে লাগলো। প্রাণে বেঁচে যারা পালাতে সক্ষম হলো, তারা রাজার কাছে গিয়ে তাদের দুদর্শার কথা জানালো। রাজা এবার আরো বেশি সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালানোর জন্য হুকুম দিলেন। বললেন-

রাজা: সইন্য তিলাংগৈ থাঁলাইদি
সাকা উদয়পুর দারিয়ো
অ-র সাইচিদক কাস'দি
কামান বয়াইয়ৈ সারিদি
সাকা কাঁচাপুর দারিয়ো
মিসিম বয়াইয়ৈ সারিদি
য়াকনি সিলাইবাই ককলাইদি

বাংলা ভাবার্থ

যত প্রয়োজন সৈন্যদল নিয়ে যাও। উপরে উদয়পুর। সেদিকে ষোল হাজার সৈন্য বেষ্টনি গড়ে তুলবে। কামান বসিয়ে গোলা নিক্ষেপ করবে। অন্যদিকে কাঁচপুরের দিকে আধুনিক সব মেশিন (অস্ত্র) বসিয়ে গুলি ছুঁড়বে। হাতে হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র রাখবে। দেখামাত্র গুলি করবে।

এবার রাজার সুদক্ষ সেনা নায়করা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ছাগল শিকারের অভিযানে নামলো। তারা অগ্রবর্তী সৈন্যদের পাঠিয়ে লালমতিকে খবর দিল সে যাতে তার ছাগলটাকে ছেড়ে না দেয়। তাই শুনে ছাগলে গলা জড়িয়ে ধরে লালমতি অঝোরে কাঁদতে থাকে।

লালমতি: খানাগারাদি দাদায়ই
হাবা গাংগালা মুই খালে
নুখুই দুখিয়া জুকমালে
. . .
বিয়ৈ তনানি রুংয়াবা
বারি উমায়া খুম খাকচা
নুখুই দুখিনি জুকমালাই
আংবো মানলিয়া দিন খাকচা
পশু হিনৈদে দাদায়ই
নুংলাই মকলবাই নুলাংজাক
নুংলাই খাপাংবাই সিলাংজাক

www.pathagar.com

নন অংজাকদৈ অংজাকয়া
যত মায়ানো নুংলাংখা
গোঁসাই রাজানি সামুংলাই
সইন্য এরাওগই হলই দং
রকখা অংনানি করইখা
বসর বালরগৈ মাতংয়া
মাসে বালরগৈ মাতংয়া
ননো তবইয়ৈ ফাইকালাই
যত সুতুরু বাচাজাক
তাখুক গাম করই খুকসাবাই
কাইসা সায়াফুং সাথকগো
কাইসা হিনয়াফুং হিনথকগো
রাজা হাউলদার সকফাইদং
রাজা জমাদার সকফাইদং
খামা সাইচিদক বের রদং
সাকা লাখাদক বের রদং

বাংলা ভাবার্থ

শোন আমার লক্ষ্মীটি। আমি তোমার অভাগী প্রেমিকা। আমার প্রার্থনাতে হয়তো ভুল ছিল। তাই দিনের অর্ধেকটিও তোমার পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পাইনি আমি। পশুর দেহ থাকলেও তুমি তো নিজ চোখেই সবকিছু দেখেছো। নিজের মনের থেকে সবকিছুই তুমি জানো। তোমায় আমি কী পরিমাণের ভালোবাসি। কতটুকু ত্যাগ করতে পারি। সবকিছুইতো তুমি জানো। গোঁসাই রাজা আদেশ দিয়েছেন, হাজার হাজার সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে তোমায় মেরে ফেলবেন। মাস বছর পার করে তোমার সাধনা পূরণ করার আর কোন উপায় থাকলো না। তোমায় নিয়ে যেদিকেই তাকাই দেখি শত্রুসেনারা দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাবশালী কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। তাই যে কেউ শত্রুতা করে যাচ্ছে। নানা কথা রটে বেড়াচ্ছে। রাজার সেনাধ্যক্ষরা আসছে, রাজার আইনবিদরা আসছে। রাজ্যের পূর্ব সীমানা থেকে পশ্চিম সীমানা চারিদিকে বেষ্টনি দিয়ে ফেলেছে।

লালমতির বিলাপ শেষ হতে না হতে যুদ্ধের দামা বেজে উঠলো। চারিদিক থেকে রাজার সৈন্যদল তাদেরকে ঘিরে ফেললো। তারা লালমতিকে ছাগলের গলা ছেড়ে উঠে আসার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো।

রাজসেনাপতি: পশু ককনিসে চুং ফাইয়ো
তামা দুগুনো নুং মানৈ
তামা বেজারনো নুং মানৈ

www.pathagar.com

নুংবা এরাওকনি সেলে লাং
মিসিম সারিয়ৈ রখালাই
বিরক বুথালমুং অংগনো
নুংবা বাঁচিয়ৈ থাঁসিদি

বাংলা ভাবার্থ
পশু শিকারেই এসেছি আমরা। তোমার এতে এতো আপত্তি কেন? কী এমন অভিমান তোমার? তুমি কেন ছাড়তে চাচ্ছো না এটিকে? অস্ত্রের গুলি ছুঁড়ে দিলে অবলা নারী হত্যার দায় আমার উপর চাপবে। তুমি সরে দাঁড়াও। নিজের প্রাণ বাঁচাও।

লালমতি: প্রাননো লালসা অংজাকয়া
আংবো থুইমানি দি-নফুং
কাইসা ওয়ানামা করইবা
নকনি সুবদিন অংলাংথং
আংখাই থুইনানি বুসুক নাং
পারান কম্পমান অংলাংফুং
তব কনগৈ রলিয়া

বাংলা ভাবার্থ
প্রাণের জন্য আমার কোনো লোভ নেই। আমার মরণের দিনেও কেউ কাঁদবার থাকবে না। সব শুভদিন তোমাদেরই হোক। আমার মৃত্যু যেন মুহূর্তও না লাগে। ভয়ে যতই প্রাণ কেঁপে যাক। আমি সরে দাঁড়াবো না। পারো তো গুলি চালাও।

রাজার সেনাপতিরা লালমতির বাবা মা আত্মীয় পরিজনদের গিয়ে তাঁদের মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করেন। লালমতির আত্মীয় পরিজনরা তাকে ধরে সেখান থেকে নিয়ে আসলে উত্তর পশ্চিত পূর্ব পশ্চিম চারিদিক থেকে কামানসহ নানা মারণাস্ত্র বসিয়ে গুলি চালাতে থাকলো। পাষাণে গড়া ছাগলের গায়ে গোলাগুলির আঘাত লেগে বিকট আওয়াজ হতে থাকলো। মেঘের গর্জনের মতো আওয়াজ হতে লাগলো। রাগে তার হীরার শিং দুটো নাড়ার সাথে সাথে চন্দ্রসূর্য কেঁপে উঠলো। লোহার পা দুটো নাড়া-চাড়া করার সাথে সাথে পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো। ভাটিতে উদয়পুর পর্যন্ত দাপাদাপি করলে তার পায়ের নিচে যা পড়ে, তা-ই ধ্বংস হয়ে যেতে লাগলো। উত্তরে অবস্থান নেওয়া ষোল পণ সৈন্য কাঞ্চনে গড়া কানের বাতাসে উড়ে গেল। দক্ষিণে সমবেত হওয়া সেনার দল কোন দিকে যে উড়ে গেছে তা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রাণে বেঁচে যাওয়া সৈন্যদল যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে রাজার দরবারে ফিরে গেল। তারা গিয়ে রাজাকে জানালো- গোলাগুলির আঘাতে ছাগলের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। বরং সৈন্যদের রক্তের বৃষ্টি যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বারোই গ্রাম, উদয়পুর, কুমার গ্রাম, যুগ গ্রাম সবকিছু সাফ হয়ে গেছে ছাগলটার উৎপাতে। রাজা এবার ছাগলটিকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে চারিদিকে ঢোল পেটানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। শত শত বাজারে ঢোল পেটানো হলো। কেউই ঢোল ধরে না।

www.pathagar.com

পঞ্চম খণ্ড

রাজ্যময় ঘুরে ঢোল পিটিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত ঢুলিরা রাত কাটানোর এক রোয়াজার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। কথার ফাঁকে তারা তাদের আগমনের উদ্দেশ্য রোয়াজাকে বললো এবং লালমতির ছাগলটাকে বধ করতে পারে এমন কারোর সন্ধান থাকলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু এরূপ কোনো ব্যক্তির সন্ধান রোয়াজা দিতে পারলো না। সন্ধ্যার দিকে একজন আগন্তুক রোয়াজার ঘরে এসে আশ্রয় নিলো। রাতে দুই ঢুলি আর আগন্তুক মিলে গ্রামের যুবতি রাইবতির ঘরে বেড়ানোর জন্য গেল। রাইবতির বাবা কাংখং বুড়া আগন্তুকের কথা-বার্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য মনস্থ করলো। অপরিচিত একজন যুবকের সাথে কাংখং বুড়া তাঁর মেয়ে রাইবতির বিয়ে দিতে সম্মত হওয়ায় কাংখং বুড়ার পূর্ব পরিচিত দুই ঢুলি মনে আঘাত পেলো। তাই তারা আগন্তুক যুবকের পরিচয় জানার জন্য ওঁৎ পেতে থাকলো। ত্রিপুরা সামাজিক প্রথা ও বিধি অনুসারে আগন্তুক যুবকের সাথে রাইবতির বিয়ে সম্পন্ন হলো। তারা একসাথে জুমে যেতে লাগলো। বনের নানা সবজি ও জ্বালানি কাঠ একসাথে আহরণ করতে থাকলো। ছড়ায় গিয়ে মাছ ধরতে লাগলো। একসময় আগন্তুকের অনুপস্থিতিতে ঢুলি দুইজন রাইবতিদের বাড়িতে আড়ি পাতার জন্য সংগোপনে গেল। গিয়েই তারা রাইবতি ও তার মায়ের মধ্যে কথোপকথন শুনতে পেল। রাইবতি বলছে, সে তার স্বামীকে জুমে পাখি শিকার করার সময় পাখিদের সাথে উড়ে উড়ে মেঘের আড়াল পর্যন্ত উঠে যেতে দেখেছে। আগন্তুক যুবকটি আর কেউ নয়। মন্ত্র শেখার জন্য দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া সুমন্ত। তা শুনে তারা আর সেখানে অবস্থান করলো না। ভোর সকালে তারা সে গ্রাম ছেড়ে তাদের গ্রামের দিকে রওনা হলো। তাদের আগমনের বার্তা শুনে গ্রামের সকলে তাদের কাছে ঢোল পেটানোর সংবাদ শোনার জন্য আসলো। রাজা স্বয়ং তাদের কাছে আসলেন তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও সভাসদদের নিয়ে। তখন ঢুলিরা করজোর করে বললো-

কাংখং বুরানি চামিরি
ব-সে পুন্দানো রমমানাই
ব-সে পুন্দানো তানমানাই
কারাং করইয়ৈ বিরমানো।

বাংলা ভাবার্থ

এই তল্লাটে একজনই পাঁঠা ছাগলটাকে ধরতে পারবে আর মারতে পারবে। সেই ডানা ছাড়া উড়তে পারে। সে হলো কাংখং বুড়ার জামাতা।

ষষ্ঠ খণ্ড

রাজা বিস্তারিত শোনার পর দুই ঢুলিকে আবার রাইবতিদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

রাজাঃ কামি রোয়াজা পারাগো
আরো ওয়াইসা নক থাঁসিদি
থাঁগই রোয়াজানো সাগইদি

www.pathagar.com

খানাপ সুমবারনি ফুরুংগ
কামি মাই খুলুম চাদিফুং
. . .
কাংখং বুরানো সাগইদি
ব-ন অচাইনো কাবাকদি
বিনি নুখুংনি চামিরিনো
ব-ন তানসরাই কাবাকদি

বাংলা ভাবার্থ

কামি রোয়াজা পাড়ায় আরেকবার গিয়ে দেখো তোমরা। গিয়ে রোয়াজাকে বলো, কাল সোমবারের সকালে শস্যদেবীর পূজো করতে হবে। কাংখং বুড়াকে গিয়ে অনুরোধ করো। তাকে পৌরহিত্য করার জন্য আসতে বলো। তার জামাতাকে সেখানে তানসরাই (কসাই) হওয়ার জন্য আসতে অনুরোধ করবে।

দুই ঢুলি রাজার আদেশ কামি রোয়াজার কাছে গিয়ে নিবেদন করে। কিন্তু রাইবতি সুমন্তকে তানসরাই (কসাই) হিসেবে পাঠাতে রাজি না হওয়ায় তার বাবা কাংখং বুড়া তাকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন।

কাংখং: লাচি হিনৈদে য়কনানি
কিরি হিনৈদে য়কনানি
রাজা হিনকালাই কক থাকগো
থাঁয়া হিনৈদে য়কনানি

বাংলা ভাবার্থ

লাজ শরম করে কী আর পার পাওয়া যাবে? রাজা আদেশ করেছেন, না গিয়ে কি আর পারা যায়?

বাবার অনুরোধে রাইবতি তার স্বামী সুমন্তকে কামি মাই খুলুম বা শস্যদেবীর পূজোয় কসাই হিসেবে পাঠাতে রাজী হয়।

সুমন্ত আর তার শ্বশুর কাংখং বুড়া যখন রোয়াজার বাড়িতে পৌঁছালো তখন পূজোর আয়োজন প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিন্তু রোয়াজার মেয়ে পার্বতি পড়েছে আরেক বিপদে। তার দায়িত্ব ছিল কৌশলে খাবার দিয়ে তাদের দাঁতাল শুকরটাকে ধরা। সেটি সে কোনভাবেই বাগে আনতে পারছে না। পাড়ার সুমন্ত জওয়ানরা নেমে চেষ্টা করেও শুকরটাকে ধরতে পারেনি। শেষে রোয়াজা তাঁর মেয়েকে বলেন সুমন্তকে অনুরোধ করে দাঁতাল শুকর ধরার জন্য। অনেক অনুরোধ করার পর সুমন্ত পার্বতির সাথে ধরতে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে কয়েকবার তাড়া খেয়ে ত্রস্ত শুকরটি আর খাবার খেতে আসছে না। এদিকে পূজোর বেলা বয়ে যাচ্ছে। তাই রোয়াজা আদেশ দিলেন শুকরটিকে তাড়া করে ধরার জন্য। অমনি সুমন্ত শুকরটিকে তাড়া করে কোমরে এক হাত ও কাঁধের উপর এক হাত দিয়ে ধরে পার্বতির কাছে এনে দিল। গ্রামের বারোজন শক্ত সামর্থ যুবক শুকরটি তখন বেঁধে পিছনে ছয়জন ও সামনের দিকে ছয়জন কাঁধ দিয়ে বহন করে পূজোর স্থাপনের দিকে নিয়ে গেল। পূজোর ভোজনপর্ব শুরু হলে রোয়াজা কৌশলে ছাগলের উৎপাতের কথা সকলের সামনে আলোচনা করতে লাগলো।

www.pathagar.com

রোয়াজা: রাজা সুখখাইসে রাজ্য সুখ

. . .

বাইতিং পুন্দাবো পুলাংখা
বাইতিং সিকামবো পুলাংখা
সিকাম তিলাংফুং গলখায়ই
পুন্দা চালাংফুং সাব খায়ই
পুন্দা তানমানাই তংখালাই

. . .

আনি ইঁ হাগো তংতিলাই
পুন্দা রমনানি হলকামুং
রাজ্য হা বাগৈ মানখামুং
রাজা রাং-কুথি মানখামুং
রাজা রি-কুথি মানখামুং

বাংলা ভাবার্থ

রাজা সুখী হলেই রাজ্য সুখী। কেমন পাঁঠা ছাগলের অত্যাচার শুরু হয়েছে? এ কেমন অনাচার কুকিদের? কুকিরা শেষ করে দিচ্ছে গ্রামকে গ্রাম। পাঁঠা ছাগলটা সাফ করে দিচ্ছে সমস্ত ক্ষেত খামার। কেউ কি আছে এমন যে ছাগলটাকে মারতে পারে? আমার এই দেশে যদি এমন কেউ থাকতো, তবে তাকে ছাগলটাকে ধরার জন্য পাঠাতে পারতাম। ছাগলটাকে মারতে পারলে রাজ্যের অর্ধেকটাই সে পেতো। রাজার কাছ থেকে এক কোটি রৌপ্য মুদ্রা পেতো।

কাংখং: সত্য হা বাগৈ রনাইদৈ
সত্য রি বাগৈ রনাইদৈ
সত্য রাং বাগৈ রনাইদৈ
সত্য বাক্যনো নুং রদি

বাংলা ভাবার্থ

সত্যি কি রাজ্য ভাগ করে দেওয়া হবে? সত্যি কি টাকা পয়সা দেওয়া হবে? সত্য বাক্য তুমি দিতে পারবে?

রোয়াজা: তামা পত্যনো নুং থাঁয়া
সত্য তানমানাই য়াচাকদি
বাইতিং রাজ্যনো ব রয়া?

বাংলা ভাবার্থ

তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না? ছাগলটাকে বধ করার জন্য সত্যি কেউ থাকলে রাজী হয়ে দেখো। কেন রাজ্য ভাগ দেওয়া হবে না?

www.pathagar.com

কাংখং: বাইতিং পুন্দানো তানমায়া
পুন্দা তাননানি বুসুক নাং
. . .
বাসাক পাষাননি অংলাংফুং
পাষান বাসাকনো গল খাইনো

বাংলা ভাবার্থ

কেমন ছাগল সেটা? কেন তাকে মারতে পারবো না? একটি ছাগল মারতে আর কীই বা লাগে? শরীর পাষাণের হলেও পাষাণটাকে আমার জামাতা গলিয়ে ফেলবে।

রোয়াজা: সত্য চামিরি ফারিখাই
মকল মুকফ্রেসা সময়ো
পতি নুখুংনি ওয়াদানাই
কু-ব লেবসিনি রফাইদি

বাংলা ভাবার্থ

সত্যি যদি তোমার জামাতা তা পারে, তাহলে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। এক মুহূর্তের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি ঘরের মাচাং থেকে বাঁশের নমুনা নিয়ে আসুক।

কাংখং তাঁর জামাতাকে প্রতি ঘরের মাচাং ঘর থেকে বাঁশের নমুনা কেটে আনার জন্য বললেন। তৎক্ষণাৎ চোখের পলকেই গ্রামের সকল ঘরের মাচাং থেকে বাঁশের নমুনা কেটে এনে দিল সুমন্ত। ডানা ছাড়াই তাকে উড়ে যেতে দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাকে উড়ে যেতে দেখে জ্বলজ্যান্ত সিংহের সামনে পড়ার মতো করে হা হয়ে গেল সকলের মুখ। কারোর মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। এদিকে তার শ্বশুরকে অপমান করায় সুমন্ত রেগে আগুন। তার সামনে ভালো ভালো তরকারি দিয়ে খাবার বেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সে কিছুতেই খেলো না। তখন রোয়াজার মেয়ে পার্বতি এসে তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল। গরম জলে স্নান করতে দিল এবং নতুন কাপড় পরতে দিল। পরে ভাত খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো-

পার্বতি: খতি তাঅংদি দাদায়ই
বেজার তাঅংদি দাদায়ই
সাকাং মাইখালাই নুং লাদি
অকগ মাই করই সাক বেলখা
খা-গ তৈ করই খুক রানখা

বাংলা ভাবার্থ

মনে দুঃখ নিও না লক্ষীটি আমার। ভাতের থালাটি গ্রহণ করো। পেটে অন্ন না থাকলে শরীর দুর্বল হবে। বুকে পানি না পড়লে বুক শুকিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

নিমন্ত্রণ খেতে আসা অতিথিরা ঘটনার আকস্মিকতায় কেউ ভয় পেয়ে গেল। কেউ অনেকক্ষণ ঘোরের মধ্যে থাকলো। কেউ না খেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল, কেউ অর্ধেক খেয়ে আর খেতে পারলো না। রাইবতি তার স্বামীকে অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর জন্য উস্কে দেওয়ায় তার বাবাকে দোষারোপ করতে লাগলো।

রাইবতি: পুর্বে য়াফাংগ আং সাজাক
আরাই অংগন আং সিজাক
ফায়া ফাবুরা কাইসাবো
আনি ককমুংনো খানায়া
নকগো মই ফনসা মাচাখাই
নকগো চক খাপসা মানুংখাই
সায়া ককমুংনো সালাংগ
হিঁয়া ককমুংনো হিঁলাংগ
মিঁয়া ফাইমানি চামিরি
তামা পুন্দানো রমজাকনাই
. . .
রাজা বাচাগই রমমায়া
দেশের বাচাগই রমমায়া
সাগই বুখুকবাই খানাগই
ফালা নখাসুক উরকজাক
তাবকলাই থাঁয়াগই য়কগালাক
. . .
বাইতিং পুন্দানো তাননানি
ব-ন য়াচাগই নুং ফাইলাং
য়াগো হিলতিনাই পুন্দাদৈ
ব-ন তাননানি য়াচাকবা

বাংলা ভাবার্থ

আগে থেকেই বলেছি আমি এমনটি হবে। বুড়ো বাবা আমার কোন কথাই শুনে না। একটু ভালো তরকারিতে ভাত খেলে একটু মদ পেটে পড়লে না বলা কথাও বলে ফেলে। কালই তো আসলো তার জামাতা। কেন ছাগল ধরতে পাঠাবে? রাজার হাজার সৈন্য ধরতে পারে না। দেশের কেউই ধরতে পারে না। লোকমুখে ছাগলটার অত্যাচারের কথা এতো শুনেছে। আমার আত্মারাম যে উড়ে যায়। এখনতো আর না গিয়ে রক্ষা নেই। কী মনে করে তুমি ছাগলটাকে ধরার জন্য কথা দিয়ে এলে? এটিতো সাধারণ গৃহপালিত ছাগল নয় যে তাকে সহজে ধরা যাবে। কেন কথা দিলে?

সুমন্ত: নিনি ওয়ানাথাই তামানো

www.pathagar.com

পুন্দা তাননানি থাঁলাংফুং
আনি ককমুংনো খানাদি
য়াকনি সক্তিবাই আং তাননো
রাজা মাই-মাইরাং লাগনো
রাজা রাং-কুথি লাগনো
রাজা রি-কুথি লাগনো
রাজা হা-বাগৈ লানানো

বাংলা ভাবার্থ

এতো চিন্তা করছো কেন? ছাগল আমি ধরতে যাবোই। তার আগে একটা কথা শুনে রাখো। সর্বশক্তি দিয়ে আমি ছাগলটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবো। ছাগলটাকে মেরে রাজার অর্ধেক রাজ্য ছিনিয়ে আনবো, রাজসম্পদ নিয়ে আসবো, কোটি টাকা ছিনিয়ে আনবো।

সপ্তম খণ্ড

ছাগল বধ করার মতো বীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুসংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথে রাজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি হাবিলদার ও জমাদারদের পাঠিয়ে সুমন্ত কে তাঁর রাজ্যে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রাজার দূতেরা রোয়াজা পাড়ায় গিয়ে কাংখং বুড়া ও তাঁর জামাতা সুমন্তকে সংবাদটি জানালো। রাইবতি কিছুতেই সুমন্তকে ছাড়তে নারাজ। অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে অবশেষে সুমন্ত রাইবতিকে রাজি করালো। সুমন্ত সবকিছু প্রস্তুত করে রাজদরবারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

এদিকে রাজার দূতেরা লালমতিকে গিয়ে জানিয়ে দিল যাতে সে তার ছাগলটাকে বেঁধে রাখে। সংবাদটি শুনেই লালমতি তার ছাগলের খুঁজে বনে চলে গেল। গায়েন কবি বিবরণ দেন-

খা বাই কপাললো বুসাগোই
কুসুক কুসুগই ব কাবৈ
রিসা রিখানৈ য়াক কারৈ
পুন্দা লানানি থাংগইদং
নখা সালুলুক অংলাংখা
মকল মুকতৈনি বাগইসে
লামা হেমনানি মানলিয়া
রিংখন রিংখনই থাংগইদং
যখন রিংখনমুং খানাকাই
করং তিসাগই খানাকা
খুনজুর তিসাগই খানাকা
যখন খরাংন খানাকাই
নাইখন নাইখনই ব ফাইকা

www.pathagar.com

লামা দারিয়ো মাঁলাইখা
গাতি দারিয়ো মাঁলাইখা
গাতি দারিয়ো কালাইয়ই
তৈমুং কুরনি রমজাখা
. . .
ব-ন কুরগই পাইখালাই
ব-ব তই কুগই লাজাখা
. . .
অর্দেক হর অংগ হিনকালাই
পশু বাসাকনো য়াক কারৈ
মিনষর বাসাকনো ব লাগই
থুনাই জাগাঅ সকপাইখা
ফাই নাইফাইবা কাপজাকনো
লখি তাঁ হিনই নুং কাপলাং
সানি উক্তিন মাননিয়া
সুংরুক সুংরুকসে কাপ্‌সিয়ো

বাংলা ভাবার্থ
বুক চাপড়িয়ে মাথা চাপড়িয়ে কাপড় বুনতে বুনতে বুননযন্ত্রটি এলোমেলো ফেলে রেখে কাঁদতে থাকে লালমতি। গোধুলী বেলায় ছাগলরূপী হেমন্তকে নেওয়ার জন্য ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে লালমতি। লালমতির ডাক শুনে শিং উঁচিয়ে দেখে হেমন্ত। কান খাড়া করে শুনে। লালমতির কণ্ঠস্বর শুনে হেমন্ত তার দিকে আসতে থাকে। ঘাটের কাছে দেখা হয়ে যায় তাদের। ঘাটে নেমে দু'জনে স্নান করে নেয়। আগে হেমন্তকে স্নান করিয়ে নিজেও স্নান করে নেয় লালমতি। গভীর রাতে হেমন্ত পশুর দেহ ছেড়ে নিজের রূপ নেয়। মানুষের রূপ ফিরে পেয়ে সে লালমতির কামরার দিকে এসে দেখে লালমতি কাঁদছে। কান্না দেখে হেমন্ত জিজ্ঞেস করে, কী কারণে কান্নাকাটি করছে লালমতি? লালমতি কিছুই বলতে পারে না। যতই জানতে চাওয়া হয়, ততই সে কাঁদতে থাকে।

হেমন্ত: তামা ককমুংনো খানালাং
অগ মাই করই নুং কাপবা
খা-গ তই করই নুং কাপবা
তামা ককমুংন খানাগই
বুদ্দি হারায়ই নং থাংলাং

বাংলা ভাবার্থ
কী এমন কথা শুনলে প্রিয়ে আমার? অন্ন নেই, পানি নেই তুমি কান্নাকাটি করছো? কী এমন কথা শুনলে তুমি বুদ্ধিহারা হয়ে গেছ?

www.pathagar.com

লালমতি: খানাগারাদি দাদায়ই
সাগইলাই ফলাফল করইখা
মিঁয়া সারিনি ককমুংন
রাজা হাউলাদাল সাপাইখা
রাজা জমাদার সাপাইখা
ননসে লানানি ফাইজাকনাই
. . .
তুনুই হরসাসে হর কেবেং
আইচুক তকজালা বাতাইখাই
নন তিলাংগই থাংপাইনাই
তামা হাল বেহাল অংসিনাই
. . .
খুরি সাজালা কালাংদি
সাগই না বুজক তাঅংদি
. . .
বার বিসিয়ো তপ খায়ই
নিনি যুগ পুর্ন কায়াগই
নিনি বিমানি চায়াফুং
আনি বিমানি হামতিলাই
নিনি যুগ পুর্ন কাখামুং
আনি বিমানি হাময়াগই
বারি উমায়া ববারনো
খলৈ গংগিয়ো বকফুগো
বিনি রুংলিয়া অংখানা
ইসর দুয়ারো বিফুগো
বিনি রুংলিয়া অংখানা
অ-রসে দেরাগৈ পাইলাংগ
বুদ্ধি খরাংসা সালাংদি

বাংলা ভাবার্থ

শোন প্রিয় বন্ধু আমার। বলে আর কী লাভ হবে? কাল রাতে যা হবার হয়ে গেছে। রাজার সেনাদল এসে পৌঁছেছে। রাজার আইনবিদরা এসে পৌঁছেছে। তোমাকে নিতেই তারা আসছে। আজ রাতটাই শুধু হাতে আছে। ভোরে মোরগ ডাকলে আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে নিতে আসবে তারা। কী হাল হবে কিছুই জানি না। আজ আমায় ফিরিয়ে দিও না। যাবার আগে আমার কোলে সন্তান দিয়ে যেও। বারোটি বছর তপস্যা করে তোমার যুগ পূর্ণ না হওয়ায়, আরাধনার পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় এমন দুর্দিন এলো। আমার তপস্যায়ও হয়তো ভুল ছিল। আমার তপস্যা সফল হলে তোমার যুগও পূর্ণ হতো। গঙ্গা

www.pathagar.com

মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাওয়ার সময় হয়তো কোনো ত্রুটি হয়েছিল। তাই আজ এই দর্দশা হয়েছে। কিছু দিয়ে যেতে না পারলে একটা বুদ্ধি অন্তত দিয়ে যেও।

হেমন্ত লালমতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, দোষ কারোর নয়। বিধিতে হয়তো এমনই লেখা ছিল। আনি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্র শিখে আসতে পারতাম, তাহলে আজ এই দশা হতো না। এতো তাড়াতাড়ি না এসে আমি যদি ফকিরের দেশে থেকে যেতাম, তাহলে আমার কেউ ক্ষতি করতে পারতো না এবং আমি অসীম ক্ষমতা নিয়ে দেশে ফিরতাম।
লালমতি নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভোরের মোরগটিকে একটু দেরিতে ডাকার জন্য অনুরোধ করে। যেন সকালটা একটু দেরিতে আসে-

দগই তা কুচুই তকজালা
দগই কুচুইঅ হিনকালাই
বাইলিং কুচুইবাই মাই রনাই
লংবাই কুচুইবাই তই রনাই

বাংলা ভাবার্থ
ওরে ভোরের মোরগ, দয়া করো আমায়! কাল ভোর সকালে একটু দেরিতে ডাক দিও। যদি তাড়াতাড়ি ডাক দাও তবে জেনে রেখো তোমায় আর কোনদিন খাবার খেতে হবে না। ছেঁড়া কুলোয় খাবার দেবো, ভাঙা থালায় জল দেবো।

এভাবে কখন যেন রাত কেটে যায়। সকাল হয়ে সূর্যের তাপ ধীরে ধীরে প্রখর হতে থাকে। তার সাথে সাথে রাজার সৈন্যরা লালমতির বাড়ি ঘিরে ফেলতে থাকে। অপরাহ্ন সময়ে সুমন্ত বীরবেশে আশি মণ ওজনের একটি খড়গ কাঁধে নিয়ে লালমতির উঠোনে এসে হাজির হয়। সে লালমতির উদ্দেশ্যে বলে-

সুমন্ত: খতি তাঅংদি লালমতি, নিনি পুন্দানো রফাইদি (মনে দুঃখ নিও না লালমতি। তোমার ছাগলটাকে নিয়ে এসো)।

লালমতি: আনি পুন্দানো তানমানি
নিনি নুখুইবো তানজাকথং
বিনি নুখুংনি নুং ফাইয়ই
তাংগই চানানি আসাবা
আসা বিফলো থাংলাংথং

বাংলা ভাবার্থ
আমার প্রেমিককে তুমি যেভাবে মারবে, ঠিকভাবে সেভাবে যেন তোমার স্ত্রীর মরণ হয়। দূর পরদেশ থেকে এসে তুমি যে গ্রামে সংসার পেতেছো। সাজানো সে সংসার ধ্বংস হয়ে যাক।

শাপ-শাপান্ত করার পরও লালমতির শেষ রক্ষা হয় না। সুমন্ত লালমতিকে তার সমস্ত পরিধেয় ও গয়না সামগ্রী তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। এমনকি

www.pathagar.com

পুরনো দোকান থেকে কিনে আনা আংটিও খুঁজে। লালমতি সবকিছু দিতে পারলেও আংটিটি দেবে না বলে জানায়। সুমন্ত এতে ক্ষিপ্ত হয়ে লালমতির বাড়ি তল্লাসি চালানোর জন্য রাজার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়। হাতের মাথিয়া ও গলার টাকার ছড়িসহ অন্যান্য সব পোশাক-পরিচ্ছদ ও গয়না পাওয়া গেলেও সেই আংটিটি তারা খুঁজে পায় না। রাজার সৈন্যরা কামান বসিয়ে লালমতিকে ভয় দেখায়। এতে লালমতি জানায়, প্রাণের প্রতি তার বিন্দুমাত্রও লালসা নেই। ফলে তারা বিপদে পড়ে যায়। এই আংটি পাওয়া না গেলে তো ছাগল বধ করা সম্ভব হবে না। তাই সুমন্ত দূত পাঠিয়ে রাজার পরামর্শ চাইল। সিঁয়া রাজাকে পরামর্শ দিলেন গণক পণ্ডিতদের দিয়ে গণনা করানোর জন্য। রাজা গণক পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন এবং সর্বজ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে আংটির সন্ধান বের করার জন্য বললেন। পণ্ডিতগণ নানা সূত্র দিয়ে আংটি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন। পরে তারা রাজার সৈন্যদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, লালমতির ঘরের ভিতর কি কি ধরনের আসবাব আছে। সৈন্যরা জানালো, তার ঘরে একটি রূপোর পালংক আছে। পণ্ডিতরা পালংকের পায়াতে কোন ছিদ্র আছে কিনা খুঁজতে বললেন। সৈন্যরা রূপোর পালংকের একটি পায়ায় একটি ছিদ্র খুঁজে পেল এবং সেখানে আংটিটি আবিষ্কার করলো। সেটি বের করে আনা হলো। ইত্যবসরে লালমতি তার ছাগলকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাই সুমন্ত শহর-গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। উজানের উজিপুর থেকে ভাটির কাঁচাপুর পর্যন্ত খোঁজা হলো। খোঁজা হলো কামারদের গ্রামে, কুমোরদের গ্রামে, যুগিদের গ্রামে, মালিদের গ্রামে, বামনদের গ্রামে। সব গ্রামে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে বারোইদের গ্রামে গিয়ে তার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তান্ত্রিক উপায় ছাড়া তাকে ঘায়েল করার তো উপায় নেই। তাই সুমন্ত বারোই গ্রামের তান্ত্রিকসিদ্ধ এক পরিবারে গিয়ে তাদেরকে মা-বাবা ডেকে পাষাণ গলে যাওয়ার মন্ত্র খুঁজলো। ছাগলটিকে ধরতে না পারলে সকলের বিপদ-আশঙ্কার কথাও জানাতে ভুল করলো না। এতে বারোই পরিবারও এগিয়ে এলো। তারা চারটি পানের পাতা নিয়ে মন্ত্রপুত করে সুমন্তের হাতে দিয়ে দিল। সুমন্ত লালমতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও গয়নাগুলো পরে লালমতির রূপ ধরে মন্ত্রপুত পান হাতে নিয়ে ছলনা করে ছাগলটিকে ডাকতে ডাকতে চললো-

নুখুই দুখিয়া আং ফাইয়ো
য়াকনি ফাতৈনো চাফাইদি
. . .
সাগই বুজিয়া তাঅংদি
কুতুক কাবাগই কাবই দং
তুনুই সালসাসে দাদাবাই
তাবক রাংসাসে লখিবাই
আনি বাক্যনো পালাইদি
য়াকনি ফাতৈনো চাফাইদি

www.pathagar.com

ওয়ালৈ ফাতৈনো চাখালাই
বাসাক পাষাননো পাইলিয়া
করং ইরানো নালমাঁয়া
খুন্‌জুর কানচননো বুমাঁয়া
মকল মানইনো নাইমাঁয়া
য়াকুং লুওয়ানো ককমাঁয়া
খিতং রুফাইনো নালমাঁয়া
হাগো কালাইয়োহিনখালাই
বেবুল দাক রগই চুরুইখা
বাদ্য বাজনা রিংখনখা

. . .
রুফাই চিকলনো তবইয়ই
রাংচাক বুদুকনো তবইয়ই
পুন্দা করংগ খাপাইখা
লাখা কুরুদক বাচাগই
পুন্দা তিলাংনি সচাখা

বাংলা ভাবার্থ
তোমার দুঃখিনী স্ত্রী আমি। এসেছি তোমার জন্য খাবার নিয়ে। হাতের পানটুকু খেয়ে যাও। অবুঝ হইও না তুমি। আজকের দিনটিই শুধু রয়েছে তোমার-আমার জন্য। হয়ত বা এই মুহূর্তটুকুই শুধু আমরা পাশাপাশি থাকবো। আমার এই অনুরোধটুকু রাখো। হাতের পানটুকু খেয়ে যাও। লালমতিরূপী সুমন্তের হাতের মন্ত্রপুত পান খেয়ে হেমন্তের পাষাণের মতো দেহটা যেন গলে গেল। হীরের শিংগুলো আর নাড়াচাড়া করতে পারলো না। কানগুলো অসহ্য রকমের ভারি হয়ে গেলো। চোখ দু'টো ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগলো। লেজটা যেন শক্ত হয়ে গেল। চারিদিক থেকে যুদ্ধের নানা বাদ্য বাজতে শুরু করলো। রূপার তৈরি শিকল এনে স্বর্ণের তৈরি দড়ি দিয়ে হেমন্তের শিঙে বাঁধা হলো। ষাট লাখ রাজসেনা মিলে মৃত হেমন্তের শবদেহ নিয়ে যেতে লাগলো।

এই করুণ দৃশ্য দেখে লালমতি বিলাপ করতে থাকে-

খতি তাঅংদি দাদায়ই
নুংলাই থুইমানি দিনোলাই
কুচুক তকলিংসিং তক অংগই
চুমুই তকাসুক অংফুগ
চুমুই বেসেরো নুং হাবই
চুমুই খা রগৈ চুরুইদি
নুখুই দুখিনি জকমালাই
নুংবাই তংমানি জাগানো

জাগা য়াক বগই কাবোনো
খুমুই হিলকসা নুং অংগই
বফাং খা-রগই চুরুইদি
নুংবাই হেমমানি লামানো
লামা আচগই কাবোনো।

বাংলা ভাবার্থ

মনে দুঃখ নিও না প্রিয় আমার। তোমার মরণের পরে দূর আকাশে চিল হয়ে মেঘমালা খেলা করলে মেঘের ভিতর গিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ডেকে যেও। বিরহী দুখি বধু আমি, তোমার সাথে যেখানটায় বসে আমরা প্রেমালাপ করতাম, সেসব জায়গায় হাত বুলিয়ে কাঁদবো। অথবা গেছো উল্লুকটি হয়ে জোরগলায় আমায় ডাক দিও। তোমার সাথে যেসব পথে আমরা একসাথে হেঁটেছি, সেসব পথে বসে আমি কাঁদবো।

তথ্যনির্দেশ

১. আরেমা মারমা (বয়স ২৯), রামগড়, খাগড়াছড়ি।
২. চন্দন বৈষ্ণব (বয়স ৪৮), গাছবান, খাগড়াছড়ি।
৩. বাহু চন্দ্র সাধু (বয়স ৫৫), মাটিরাঙা, খাগড়াছড়ি
৪. আগাইদেমা মহাথের (বয়স ৫৬), মাস্টার পাড়া আনন্দ বৌদ্ধ বিহার, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি।
৫. অং চাই রী মারমা (বয়স ৪৩), গায়েন, র্ওয়া-সঃ পাড়া, গুইমারা ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৬. বিদ্যুৎ জ্যোতি চাকমা (বয়স ৪২), সংস্কৃতিকর্মী ও চাকমা ভাষা বিশেষজ্ঞ, মধুপুর, খাগড়াছড়ি।
৭. প্রীতিমা চাকমা (বয়স ৫৩), চাকুরিজীবি, মিলনপুর, খাগড়াছড়ি
৮. বিভুতি ত্রিপুরা (বয়স ৬০), বংশিবাদক ও লোকসংগীত শিল্পী, খাগড়াছড়ি।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

ক. খাম/খ্রাম/ঢোল

ত্রিপুরা ও চাকমা সমাজে খাম বা ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়। এটি কাঠের তৈরি ঢোল জাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। খাম/খ্রাম ত্রিপুরাদের গড়িয়া, কেরপূজা করার সময় খাম/খ্রাম একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। এর একদিকে একটু বড় ও অন্য দিক একটু ছোট হয়। মৃত (বয়স্ক) সৎকারে চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা আদিবাসীরা এ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। চাকমা সমাজে প্রচলিত ঢোল বিষয়ক জনপ্রিয় একটি ছড়া নিচে দেওয়া হলো-

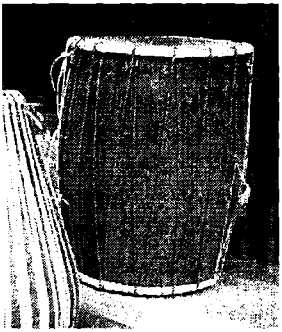

ঢোল বাজের তুমঝাঙে
নিশি রেদত্ ঘুম ভাঙে
তুমঝাঙ তুমঝাঙ তুমঝাঙে

বঙ্গানুবাদ
ঢোল বাজছে তুমঝাঙ বোলে
নিশি রাইতে ঘুম যে ভাঙে
তুমঝাঙ তুমঝাঙ তুমঝাঙ বোলে

খ. সুমুর/ বাঁশি/ বাঝি

ত্রিপুরা ও চাকমা সমাজে সুমুর বা বাঁশির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আকারের বাঁশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাঠে যখন গরু চড়ানোর সময় রাখালেরা ছোট বাঁশি ব্যবহার করে থাকে আর জুমে কাজের ফাঁকে বিশ্রামের সময় বড় বাঁশি বাজানো হয়। একই বাঁশি ত্রিপুরা লোকসংগীতে এবং গড়িয়া নৃত্য পরিবেশনের সময় ব্যবহৃত হয়। তবে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুরে বাঁশি বাজানো হয়। বাঁশি বিষয়ে চাকমা লোকসমাজে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় ছড়া নিচে উপস্থাপন করা হলো-

বাঝি বাজের রু রু রু
দিনে কালে গজ্যি জু

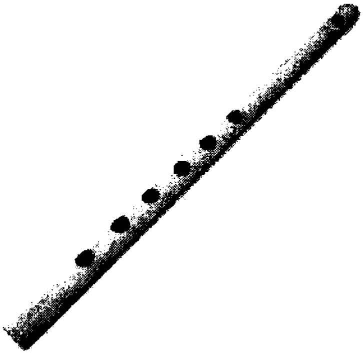

সুমুর/বাঁশি

www.pathagar.com

পাগানা দলা গড়ং সু
রু রু রু বেবেই রু রু রু
বঙ্গানুবাদ:
বাঁশি বাজছে রু রু রু
শুভ দিনের হলো শুরু
পাকানো ঢেলায় দিলাম ফুঁ
রু রু রু লক্ষীটি রু রু রু

গ. দাংদু/ হেংগরং/ খ্রেখ্রং

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সব সমাজে এই বিশেষ যন্ত্রটির ব্যবহার রয়েছে। এটি বাঁশের বা লোহার তৈরি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, যাকে ত্রিপুরা ভাষায় দাংদু, চাকমা ভাষায় হেংগরং ও মারমা ভাষায় খ্রেখ্রং বলা হয়। সচরাচর বাঁশের তৈরি দাংদু বেশি ব্যবহৃত/ প্রচলিত। মুখের মাধ্যমে বাতাশ প্রয়োগ করে শব্দ তৈরি করা হয়। যুবক যুবতীরা দাংদু বাজিয়ে রাতে তাদের অবস্থার খবর আদান প্রদান করে থাকে। যেমন- ঘরে বাবা মা এখনো জেগে আছে, তুমি একটু পরে এসো ইত্যাদি। ত্রিপুরা ভাষায় ব্যবহৃত দাংদুকে চাকমা ভাষায় খেংগরং বা হেংগরং বলা হয় এবং মারমা ভাষা খ্রেখ্রং বলা হয়। খেংগরং বা হেংগরং বিষয়ে চাকমা লোকসমাজে একটি বহুলপ্রচলিত ছড়া রয়েছে। ছড়াটি নিচে দেওয়া হলো-

হেংগরং বেই দিম দিম দিম
তরে ন দিলে কারে দিম
লগে সমাজ্যা গরি নিম
দিম দিম দিম দাদা দিম দিম দিম
বঙ্গানুবাদ
হেংগরং বাজে দিম দিম দিম
তোমায় না দিলে কাকে দিব
সঙ্গের সাথী করে নিব
দিব দাদা আমার মনটা তোমাকেই দিব

ঘ. ধুদুক

ধুদুক বাদ্যযন্ত্রটির কেবল চাকমা সমাজে ব্যবহার রয়েছে। অতীতে যুদ্ধবিগ্রহ ও আমোদ প্রমোদে ধুদুক বাজানো হতো। জুমের উঁচু পাহাড়ে জুম পাহারা দেওয়ার সময়ও জুমিয়া কৃষকরা ধুদুক বাজাতেন।

ধুদুক নাদুক তুদুক তুক
তেত্রে নাদুক তুদুক তুক
বাদৈ বদা সিদোল দুব
তুদুক তুক তুদুক তুক

www.pathagar.com

লাগত্ ন পেলে মনত্ দুখ
লাগত্ পেলে মনত্ সুখ
তুদুক তুক তুদুক তুক
বঙ্গানুবাদ
ধুদুক নাদুক তুদুক তুক
তেত্রে নাদুক তুদুক তুক
বাদুই পাখির সাদা ডিম
তুদুক তুক তুদুক তুক
দেখা হলেই মনে সুখ্
দেখা না হলে মনে দুখ্
তুদুক তুক তুদুক তুক

ঙ. শিঙে

শিঙেও যুদ্ধবিগ্রহ ও আমোদ-প্রমোদে ব্যবহার করা হতো। শিঙে কোনো আপদকালেও বাজানো হয়ে থাকে। যুদ্ধের আহবান করার সময় শিঙে বিশেষ সুরে শত্রু পক্ষের অবস্থান বাতলে দেয়।

উঁ উঁ যেত্তে উঁ উঁ যেত্তে
ও দা তুই কুদু মুই কুদু
মর দাদু মর বেদু
উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ

বঙ্গানুবাদ
উঁ উঁ বাজে উঁ উঁ বাজে
ও প্রিয় আছি কোথায় তুমি-আমি
লক্ষীটি আমার প্রিয় আমার
উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ

চ. মুরোলি বাঝি

এটি চাকমা সমাজে প্রচলিত একটি বাঁশি বিশেষ। বিশেষ করে পুরুষরা অবসর সময়ে সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে থাকার জন্য এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য মুরোলি বাঁশি বাজাতেন। বর্তমানে এটি বিলুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম।

তথ্যনির্দেশ

১. দীপন চাকমা (বয়স ৩৭), চাকুরীজীবী, মিলনপুর খাগড়াছড়ি
২. নয়ন রঞ্জন ত্রিপুরা (বয়স ৭০), হাদুক পাড়া, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকউৎসব

ক. ত্রিপুরা বিবাহ

সাধারণত ত্রিপুরাদের বিয়ের ক্ষেত্রে মা বাবারাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে থাকে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরাই নিজেদের পছন্দের পাত্র বা পাত্রী ঠিক করে এবং পরে মা বাবা এ বিয়ের ব্যাপারে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে। কোন নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে বরের পিতা কনের অভিভাবকদের নিকট তাঁদের সম্পর্কের ইচ্ছা জানানো হয়ে থাকে অথবা বরের পিতা সরাসরি এ ইচ্ছা কনের অভিভাবকের নিকট প্রকাশ করে। তাদের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর কনের বাড়ীতে যায় কনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। এরপর উভয়ের সম্মতি পেলে শুভ দিনক্ষণ দেখে প্রয়োজনীয় সামগ্রী (পিঠা, নারিকেল, পান-সুপারী, বিস্কুট, মদ) নিয়ে বরের পক্ষ থেকে কনের বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। এসময় কনের পক্ষ থেকে তাদের বিশেষ কোনো চাহিদা (দাফা, গহনা, বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য কোন উপকরণ) থাকলে উত্থাপন করে এবং আলোচনা সাপেক্ষে সবার সম্মতি থাকলে বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, এসময় কনের মা ও কনের সম্মতি নেওয়া হয়। কনের সম্মতি নেওয়ার ক্ষেত্রে বরের পক্ষ থেকে নিয়ে আসা সামগ্রী (পিঠা, নারিকেল, পান-সুপারী, বিস্কুট, মদ) ছোঁয়ার জন্য কনের অনুমতি/সম্মতি কনের বৌদি বা নানী বা দাদুর মাধ্যমে অনুমতি চাওয়া হয়। কনে বর পক্ষ হতে নিয়ে আসা উপহার সামগ্রী ছুঁয়ার অনুমতি দেওয়া মানে বিয়েতে সম্মতি বুঝানো হয়। কনের সম্মতি পাওয়ার পর পুরুষরা মদ পান করে এবং কনের পক্ষ থেকেও মদ অফার করা হয়।

ত্রিপুরা আদিবাসীরা বিয়ের সময় বর যাত্রীদের সাথে প্রয়োজনীয় পিঠা, পান-সুপারী, নারিকেল, মিষ্টি, কোমল পানীয়, গহনা, বিস্কুট, প্রয়োজনীয় মদ, গালা, বৌতাক নিয়ে কনে পক্ষের বাড়ীতে যাত্রা করে। বর যাত্রীর সাথে একজন বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি (বরের নিকট আত্মীয়) নেতৃত্ব দেন। বর যাত্রীর সাথে দুইজন বালক বালিকা থাকে যাদের বাবা মা বিধবা/পুন: বিবাহ করেছে এমন নয়। বিয়ে বাড়ীতে পৌছার সাথে সাথে কনে পক্ষের গেটে কনের পক্ষের ছোট ভাই-বোন দরজায় তাদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে দাঁড়ায় অনেক দেনদরবারের পর সমঝোতায় এসে পরে সবাইকে কনের ঘরের উঠানে বসতে দেয় এবং শরবত, মিষ্টি, চা, বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করে। পরে কনে পক্ষের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বর পক্ষের সকলকে পা ধুয়ে দেয় এবং বরযাত্রীগণ বাড়ীতে প্রবেশ করলে পরে খাবার আপ্যায়ন করা হয়। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বর পক্ষ কনে পক্ষকে পূর্বের ধার্যকৃত গহনা, নারিকেল, পান-সুপারি, পিঠা ও অন্যান্য জিনিসপত্রাদি বুঝিয়ে দেয়। এ সময় বর-কনেকে একটি কক্ষে বসতে দেওয়া হয় ও বর পক্ষের সাথে আসা দুইজন বালক-বালিকা তাদের সাথে বসে। এর পর

www.pathagar.com

খাওয়া সেরে নতুন বউকে সাজিয়ে বরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। যাত্রার প্রাক্কালে কনের নিকট আত্মীয়রা বিভিন্ন বায়না/দাবী (ব্যান্ডের তালে তালে তাকে ঘরে থেকে নিয়ে আসতে হবে, কফি পান করাতে হবে, মদ দিতে হবে, বিশেষ পান দিয়ে সুপারি খাওয়াতে হবে) নিয়ে বসে পরে। বর পক্ষের লোকেরা যথা সম্ভব তাদের বায়না পূরণ করে তবে যাত্রা আরম্ভ করে। অনেক সময় চলতি পথেও এমন বায়না করে কনে পক্ষের অনেকেই যাত্রা বিরতি করে এবং বর পক্ষ তা পূরণ করে। আগেকার দিনে বর পক্ষ ও কনে পক্ষ উভয়ে একজন করে গায়েন (গীতি কবি) নিয়োগ করত এবং গায়েনদ্বয় সারা রাস্তায় কবিগানের প্রতিযোগিতায় মেতে থাকতো। তাদের গানের সাথে বর যাত্রিরা ও-হো-হো ধ্বনি তোলে সারা রাস্তা মাতিয়ে রাখত। বর্তমানে এর প্রচলন কম দেখা যাচ্ছে।

ত্রিপুরা বিবাহে সমাজের সম্মুখে কন্যাদান কাথারক পূজা দিয়ে নতুন দম্পতির গঙ্গা প্রণাম

বরযাত্রীরা বউ নিয়ে পথে কোন গ্রামের মাঝ দিয়ে গেলে ঐ গ্রামের যুবক-যুবতিরা বরযাত্রীকে তাদের গ্রামে আপ্যায়ন করে এবং এ সময় তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়া করে। যেমন- মদ, কাঞ্জি, পান-সুপারি, অনেক সময় কিছু টাকা পয়সাও দাবি করে থাকে এবং বর পক্ষ তা সরাসরি মিটিয়ে দেয় বা কখনো আলোচনার মাধ্যমে দাবির আংশিক পূরণ করে।

বরের বাড়ীতে পৌঁছলে প্রথমে উঠানে সবার জন্য ব্যবস্থা করা হয় এবং পিঠা, চা, মিষ্টি, বিস্কুট, শরবত, ফলমূল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। কনে পক্ষের অতিথিগণকে পা ধুয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বর কনে ও তাদের সাথে থাকা দুইজন বালক-বালিকাসহ বন্ধু-বান্ধব কাথারক পূজা দেওয়ার জন্য নদীতে যায়। নদীতে ছাগল ও মুরগী কাটা হয়। একজন অচাই (পুরোহিত) এর মাধ্যমে পূজা সম্পাদন করা হয়। ছাগল ও মারগী কাটার পর উলুধ্বনিসহ পানি ছিটানো হয়। নদী থেকে পানি নিয়ে এসে বাড়ীতে চুমলাই পূজা দেওয়া হয়। চুমলাই পূজায় শূকর বলি দিতে হয়। চুমলাই পূজার মাধ্যমে কনেকে বরের নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কনের সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ, ভাল-মন্দ আজ থেকে তোমার দায়িত্বে থাকবে এমনকি কোনো কঠিন

www.pathagar.com

রোগে স্ত্রী আক্রান্ত হলেও তার দায়িত্ব নিতে রাজি আছে কিনা তা ওঝার মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়। বর হাঁ সূচক জবাব দেয়। অনুরূপভাবে বরকেও কনের নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয় ও কনে হাঁ সূচক জবাব দিলে উলু ধ্বনি দেওয়া হয় ও পানি ছিটিয়ে আনন্দ করা হয়। এর পর সকল অতিথিদেরকে ভোজনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ করা হয়। সবার খাওয়া হয়ে গেলে বর কনে ও তাদের সাথে থাকা বালক বালিকাদের ভোজন পর্ব করা হয়। তাদের জন্য আলাদা আলাদা দুটি স্থানে (কলা পাতায়) ভাত ও তরকারি দেওয়া হয় এবং দুটি করে ৪টি বাঁশের চোঙে পানি ও মদ দেওয়া হয়। ভাত ও তরকারি দেওয়ার সময় বেশি করে দেওয়া হয় যাতে, খেয়ে শেষ করতে না পারে। মদকে শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদেরকে (দুটি দল) ভাতের দলা, পানি ও মদ সাতবার করে পরিবর্তন করে খেতে হয়। এরপর যার যার প্রয়োজনমত খাবার খাওয়া হয়। খাবার পর অবিশিষ্ট খাবার মোচা করে বেঁধে রাখা হয় ও পরের দিন ভোরে যাতে কেউ না দেখে এমনভাবে কোনো অজ্ঞাত স্থানে রেখে আসা হয়। খাবার পর্ব শেষে হলে বর-কনে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে শ্রেণি বিশেষে মদ, নারিকেল, বিস্কুট দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। এসময় থালায় তুলা, চাউল রাখা হয় ও তারা তুলা দিয়ে সকল বিপদ আপদ শত্রু ইত্যাদি থেকে মুক্ত করেন এবং চাউল দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এসময় নিকট আত্মীয় বয়োজ্যেষ্ঠরা টাকা ও অন্যান্য উপহার সামগ্রীও দিয়ে থাকে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে বর্তমানে ব্যান্ড বাজানোর প্রচলন দেখা যাচ্ছে। এবং বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। তবে লক্ষণীয় যে, পূর্বে খাবার পরিবেশনের ক্ষেত্রে কলা পাতার ব্যবহার থাকলেও বর্তমানে ডেকোরেশন থেকে থালা, বাতি, জগ, গ্লাস ও চেয়ার টেবিল নেওয়ার প্রচলন হয়েছে। আর ডেকোরেশনের কাপড়ে সামিয়ানা ও গেইট সাজানো হচ্ছে। অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বর্তমানে সামাজিকভাবে বা মন্দির বা বৌদ্ধ বিহারে কিছু হাঁড়ি-পাতিল, থালা, জগ, গামলা, সামিয়ানার কাপড় কিনে রাখা হয় এবং সেখান থেকে ভাড়ায় এসব নিজিস নেওয়া হয়। বর্তমানে বিয়ের অনুষ্ঠানে বর্তমানে ভিডিও করা একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

খ. মারমা বিবাহ

বিবাহ হচ্ছে সমাজ,সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। মারমা সমাজের এ সামাজিক চুক্তিতে কোন লিখিত কাগজপত্র সংরক্ষণের রেওয়াজ নেই। মারমা সমাজের প্রচলিত বিয়ের ধরন বা প্রকারভেদ সর্ম্পকে বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করা হলো।

বিয়ের ধরন ও প্রকারভেদ:

- এক বিয়ে;
- বহুস্ত্রী বিয়ে;

www.pathagar.com

- মামাতো -ভাই বোনের বিয়ে;
- দ্বি- স্ত্রীত্ব বিয়ে;
- গোত্র অভ্যন্তরে ও গোত্র বহির্ভূত বিয়ে;
- বিনিময় বিয়ে;
- আনুষ্ঠানিক /ছিনতাই বিয়ে;
- অনানুষ্ঠানিক বিয়ে।
- **এক বিয়ে:** একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যুগলবন্ধনকে এক বিয়ে বলা যায়। এক বিয়ে অথার্ৎ একজন পুরুষ ও একজন মহিলা জীবনসঙ্গী হিসেবে একবারই বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে দেয়।এ বিয়ে মারমা সমাজে অধিক প্রচলিত।
- **বহুস্ত্রী বিয়ে:** একজন পুরুষের সাথে একাধিক মহিলার বিয়েকে বহু-স্ত্রী বিয়ে বলা হয়। মারমা সমাজে বহু-স্ত্রী বিয়ের প্রচলন খুবই কম।
- **মামাতোভাই-বোনের বিয়ে:** ব্যক্তির মা'র ভাইয়ের সন্তান বা পিতার বোনের সন্তানের সাথে বিয়ে। এ সম্পর্কের বিয়ে মারমা সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু চাচাত ভাই বা বোন এবং খালাত ভাই বা বোনের মধ্যকার বিয়ে মারমা সমাজে স্বীকৃত নয়।
- **দ্বি-স্ত্রীত্ব বিয়ে:** দ্বি-স্ত্রীত্ব বিয়ে হলো কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর বা জীবদ্দশায় স্ত্রীর ছোট বোনদের মধ্য হতে এক বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ। মারমা সমাজে এ ধরনের বিয়ে প্রচলিত আছে এবং তা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত।
- **গোত্র অভ্যন্তরে ও গোত্র বহির্ভূত বিয়ে:** নিজ সমাজ বা গোত্রের ভেতর বিয়ে করাকে গোত্র অভ্যন্তরে বিয়ে বুঝায়। মারমা সমাজে এই বিয়ে ব্যবস্থা সবচেয়ে স্বীকৃত।

  আর গোত্র বহির্ভূত অর্থ হলো নিজ সমাজ বা গোত্রের বাইরে বিয়েকে বুঝায়। মারমা সমাজে সচরাচর গোত্র বহির্ভূত বিয়ে হতে দেখা যায় না; তবে অপরিচিতও নয়। এই ধরনের বিবাহকে সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবে কম উৎসাহ প্রদান করা হয়।
- **বিনিময় বিয়ে:** যে বিয়ে বর তার ভগ্নির সাথে তার শ্যালকের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজকে বিনিময় বিয়ে বলে। মারমা সমাজে এ ধরনের বিয়ে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।
- **আনুষ্ঠানিক বিয়ে:** পারিবারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিয়ে ঠিক করার প্রথাকে আনুষ্ঠানিক বিয়ে বলে। এ ক্ষেত্রে ভাবী বর-কনে কোন রাশির জাতক-জাতিকা এবং বিয়ের শুভলগ্ন ইত্যাদি দেখার জন্য গণকের কাছে গণনা করা হয়ে থাকে। গণক উপস্থিত দুই পক্ষের সামনে জাতক-জাতিকার জন্মের দিনক্ষণ সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করে দেখা হয় প্রস্তাবিত বিয়ে সুখের হবে কিনা। সাধারণত: শনিবার যাদের জন্ম তাদের সাথে মঙ্গলবার, বৃহস্পতি ও বুধবার, রবিবারের সাথে মঙ্গল ও শুক্রবার, সোমবারের সাথে বৃহস্পতি ও শুক্রবার, বুধবারের সাথে শনি,বৃহস্পতি ও সোমবার,বৃহস্পতিবারের সাথে মঙ্গল, বুধ,শনি ও মঙ্গলবার যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সাথে বিয়েকে শুভবার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। উপরিউক্ত তালিকা অনুসরণ করে বিবাহ করলে সংসার সুখের হয় বলে মারমা

www.pathagar.com

সমাজে লোকবিশ্বাস আছে।তাই মারমারা নিজ স্বার্থে বিয়েতে নিজ জন্মসাল ও জন্মবার গোপন করে না।

- **অনানুষ্ঠানিক /ছিনতাই বিয়ে:** পাত্র-পাত্রী, পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক দুই পক্ষের মতে বা এক পক্ষের অমতে এ বিয়ে হয়ে থাকে। এ বেলায় সাধারণত পাত্র-পাত্রীর জন্মক্ষণ দেখার সুযোগ থাকে না। এ ধরনের বিয়েতে পাত্র বা পাত্রের অভিভাবক ভাবী পাত্রীকে তুলে নিয়ে পাত্রের বাড়ির আঙ্গিনায় উলুধ্বনি দিয়ে বাড়িতে উঠায় এরপর ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যান্য বিধি মেনে বৈধ্যতা আনে। এ বিয়ে মারমা সমাজে প্রচলিত আছে।

অত্যাবশ্যকীয় আনুষ্ঠানিকতা

বিয়ে বাড়ির প্রবেশদ্বারে পাতাসহ সজীব দু'টি কলাগাছ দু'পাশে পোতা হয় এবং ঠিক তার পাশে 'রিজাং-ও' (পানি পূর্ণ কলস যা সাদা সুতো দিয়ে পেচাঁনো হয়ে থাকে)। এই কলস-এর মুখ কচি আম পাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়। সামর্থানুযায়ী মারমারা বিয়ে বাড়ি সুন্দর করে সাজায়।

কনেকে আনার জন্য বর পক্ষের বাবা আথবা মা, নিকট আত্মীয়,বন্ধু-বান্ধব সাধারণত যায়। তবে বিশেষভাবে মা-বাবা না থাকলে একজন মুরব্বীর নেতৃত্বে বিয়ের পর নিরবিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী স্বামী-স্ত্রী যাদের কোনদিন ছাড়াছাড়ি হয়নি, যুবক-যুবতিসহ বেজোড় সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কনেকে আনার জন্য কনের বাড়িতে যাত্রা করে। কনে আনতে যাওয়ার সময় পাত্র পক্ষ কনের জন্য ঐতিহ্যবাহী মারমা বিয়ে পোশাক ও অলংকার অন্যান্য সাজ সামগ্রী নিয়ে যায়।এসকল সামগ্রী বরপক্ষ হতে দেওয়া হয়। কনের বাড়িতে পৌঁছার পর কনে পক্ষ বর পক্ষকে প্রথমে মিষ্টি মুখ করায়,আহারাদি সারার পর নির্ধারিত শুভক্ষণে কনের বাড়ি থেকে নামিয়ে বরের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে। এসময় কনের মাথায় ছাতা দিয়ে কনেকে ছায়া দিতে দেখা যায়। বিয়ের বাড়ির ফটতে পৌঁছার পর কনেকে মঙ্গল ঘটের পানি ছিটিয়ে বরণ করে। এর সাথে উলুধ্বনি দেওয়া হয়। নিয়মনুসারে বরকে ডানদিকে এবং কনেকে বামদিকে বসিয়ে আহুত ভিক্ষুসংঘের মাধ্যমে পঞ্চশীল প্রদান ও মঙ্গলসূত্র পাঠ করা হয়। এসময় বর কনেসহ সকলের উদ্দেশ্যে মঙ্গলঘটের পানি ছিটানো হয়। মঙ্গলসূত্র পাঠের সময় সাদা সুতা দিয়ে সাত পাকে বাধাঁ বালা দু'টি বাশেঁর লম্বা কঞ্চিতে রাখা হয়।

এরপর 'লাক্ছং/আখা ছেরা'(বৈদ্য বিশেষ) দ্বারা হাত মেলানোর কাজ সম্পাদন করা হয়। এ সময় আসনে একটি থালায় ভাত ও সিদ্ধ করা দুটি মাথাসহ মোরগ এবং বাশেঁর নলে মদ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। বরের পাশে এক বা একাধিক যুবতি এবং কনের পাশেও সম সংখ্যক যুবক বসানো হয়। প্রথমে বরের হাতের পৃষ্ঠকে নিচে রেখে কনের হাতের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়। 'লাক্ছং/আখা ছেরা' মোরগের জিহ্বার সংলগ্ন অংশ থেকে টেনে বর ও কনের পক্ষের মা-বাবা,বর-কনে ও উপস্থিত সবাইকে দেখানো হয়। এ অংশ যদি বাম দিকে হেলে থাকে তাহলে মনে করা হয় যে, বর কনের আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলেমিশে জীবিকা নিবাহ করবে, সাথে সর্বদিক উন্নতি করবে। ডান দিকে হেললে মনে করা হয় উল্টোফল পাবে। এরপর থালায় রাখা ভাত ও সিদ্ধ করা

www.pathagar.com

দুটি মোরগী সামান্য অংশ দিয়ে প্রথমে বর কনেকে পরে কনে বরকে খাইয়ে দেয়।এর তাৎপর্য হচ্ছে– একপাত্রে খাওয়া একত্রে বসবাসের প্রতীক,পরস্পরকে খাওয়ানো একে অপরকে দেখাশোনার প্রতীক।এ খাবারের অবশিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করা হয়। এ কাজ শেষ হলে বর কনের পাশে বসা যুবক-যুবতীদের 'লাক্ছং/আখা ছেরাা' বাশেঁর নলে রাখা মদ দিয়ে থাকে। যাদের মদ্য পানের অভ্যাস নেই তারা আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে বর কনেকে সম্মান জানায়।

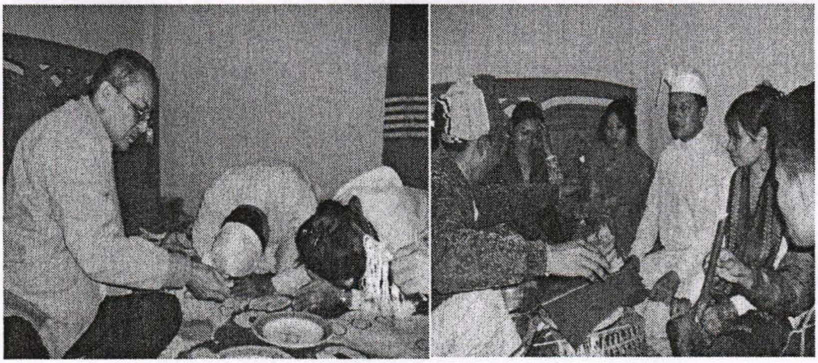

মারমা বিবাহে নবদম্পতিকে জ্যেষ্ঠজনদের আর্শীবাদ

বিয়ের আসনে বর-কনের সামনে সাদা সুতা দিয়ে সাত পাকে বাঁধা বালা দু'টি বাঁশের লম্বা কঞ্চি রক্ষিত খই রাখা হয়। এরপর আশীর্বাদ নেওয়ার পালা শুরু হয়। প্রথমে বরের বাবা-মা, চাচা-চাচী এভাবে শুরু করে আত্নীয়স্বজন ও আমন্ত্রিত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ আশীর্বাদ দিয়ে থাকে। আশীর্বাদ দাতা প্রথমে বর-কনের সামনে রাখা সাদা সুতার বালা নিয়ে বর-কনের হাতে পরিয়ে দেয় বর-কনে আশীর্বাদ দাতাকে প্রণাম করলে আশীর্বাদ দাতা খই পাত্র থেকে খই নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আর্শীবাদ চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত বর-কনে প্রণাম অবস্থায় মাথা নিচু করে রাখে। এসময় আর্শীরবাদ দাতাগণ বর-কনেকে আশীর্বাদ সূচক উপহার দিয়ে থাকেন।

হাতের মণিবন্ধে প্যাঁচানো সুতো কুণ্ডলী বাসর রাতে সারারাত বর-কনেকে রাখতে হয় এবং সে রাতেই নব-দম্পতির বাসর হয়।

বিয়ের পরের দিন ভোরে হাত মেলানোর সময় অবশিষ্ট সংরক্ষিত খাবার নদী বা পুকুরে বর কনে ফেলে আসে। এর অর্থ জল-স্থলের সকল জীবকে মৈত্রী প্রর্দশন । এরপর বাড়ির প্রবেশদ্বারে বিয়ের উদ্দেশ্যে পোতানো কলা গাছ উঠিয়ে অন্যত্র লাগাতে হয়। এ গাছ দুটো পাশাপাশি এবং বরের কর্তৃক লাগানো গাছ ডান দিক এবং কনে কর্তৃক লাগানো গাছ বাম দিকে হতে হয়। এর ফলন যদি ভালো হয় তাহলে ধরে নেয়া হয় যে নতুন দম্পতি ভবিষ্যত জীবনে উন্নতি করবে। আর এ কলা গাছ না বাঁচলে বা ফল ভালো না হলে ধরে নেয়া হয় যে নতুন দম্পতি তাদের ভবিষ্যত জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।

www.pathagar.com

গ. চাকমা বিবাহ

চাকমা সমাজের বিবাহ প্রথা একটি মৌলিক রীতিনীতির স্বাক্ষর বহন করে। কালের বিবর্তনে এতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রথা অনুসারে পাত্রপক্ষকে তিন বার পাত্রীর বাড়িতে যেতে হয় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজনে। এসময় উপহার হিসেবে পিঠা, মিষ্টি, বিস্কুট, নারিকেল ও অন্যান্য সুখাদ্য জিনিস নিয়ে যাওয়া হয় এবং কাপড় চোপরও নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিবাহের দিন ঠিক করা হয়। এসময় বরের পিতা কনের পিতার জন্য মদ নিয়ে যায়, কনের জন্য গহনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র কোন বিশেষ দাবি রয়েছে কিনা তা ঠিক করা হয়।

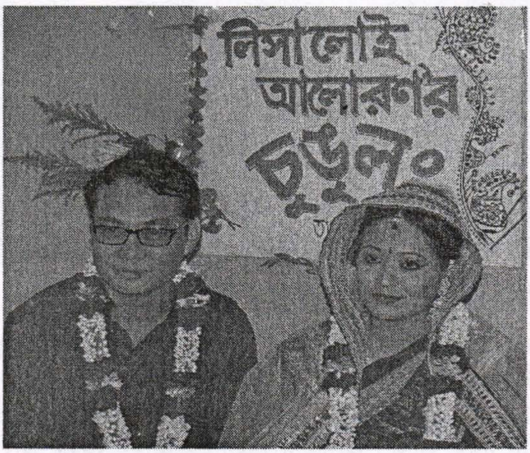

দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেলে বরযাত্রী বিহারে গিয়ে প্রার্থনা পূর্বক শোভাযাত্রা আরম্ভ করে। এসময় বরের পিতৃস্থানীয় বয়স্ক লোককে বরযাত্রী দলের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বরযাত্রীদের কনে বাড়ীতে গিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তা ও অন্যান্য সমন্বয়ের কাজটি করেন। বরযাত্রীদের সাথে কনের জন্য প্রয়োজনীয় পোষাক (পিনন খাদি) আলোচনামতে সোন ও রূপার গহনা, দু চুয়ানী মদ, বিস্কুট ইত্যাদি একটি ফুল বারেং এর ভিতর করে নিয়ে যায় তবে বর এসময় নিজ বাড়ীতে থাকে। কনের বাড়িতে পৌঁছলে কনে পক্ষ প্রথমে বরযাত্রীদের শরবত, চা বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করে। তারপর অন্যান্য আমন্ত্রিত মেহমানদের সাথে সবাইকে তাদের সাধ্যমত খাবার পরিবেশন করে। বাড়িতে বউকে নামানোর সময় হলে কনের মাতা বা নিকট আত্মীয় মূল দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। এসময় দরজার দুপাশে দুটি কলা গাছ ও দুটি পানি ভর্তি মাটির কলস স্থাপন করা হয় ও কলস দুটি সুতা দিয়ে বন্ধ করা থাকে। কনের নিকট আত্মীয়রা কনেকে থালায় বীজযুক্ত তুলা ও চাউল রেখে তা দিয়ে কনের মাথায় থ থ শব্দ করে ছুঁয়ে ভবিষ্যত মঙ্গলের ও সুখী সংসারের আর্শীবাদ করে। আর্শীবাদ শেষে বউ নামানোর অনুমতি নিয়ে দরজা খুলে সুতা নাল কেটে বরযাত্রী

www.pathagar.com

বরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কনে নিয়ে বরযাত্রী বরের বাড়ীতে পৌঁছলে সবাইকে মিষ্টি, বিস্কুট, চা ইত্যাদি দিয়ে প্রথমে আপ্যায়ন করা হয়। বরের বাড়ীতে যেসব অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করে থাকে তার একটি তালিকা-

- আগ' পানিকুম তুলানা
- পানপাদা ভাজেই দেনা
- বউ তুলানা
- জামেই-বউ জোড়া বানি দেনা
- চামলাং পূজা দেনা

আগ' পানিকুম তুলানা- বিকেল গড়ালে ছয়জন যুবতী একজন মহিলা বরের আত্মীয় (কাকী বা মামী) মাটির পাত্রে বাতি জ্বালিয়ে নদীতে গিয়ে জল নিয়ে আসে। এখান থেকে দুটি জল ভর্তি কলস দরজার দুই পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়। কলসী দুটি সাদা (সাতনালী) সুতা দিয়ে সাত পাঁকে বাঁধা হয় ও দুটি কলা গাছ লাগানো হয়। কনে এই সুতা ছিড়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে। সুতা ছেড়ার মানে কনে তার বংশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন বোঝানো হয় এবং বরের বংশে প্রবেশের অর্থ বোঝানো হয়।

পান পাদা ভাজেই দেনা- কনে বাড়ীতে প্রবেশ করার পর বর দুটি পান পাতা কনের মাথায় ছুঁয়ে দেন।

বউ তুলানা- বরযাত্রীরা কনে নিয়ে বরের বাড়ীতে পৌঁছলে শরবত, মিষ্টি, বিস্কুট, চা ইত্যাদি দিয়ে প্রথমে আপ্যায়ন করা হয়। পরে বরের নিকট আত্মীয় একজন মহিলা (বরের বৌদি/ বোন/ মামী/ কাকী) বউকে জড়িয়ে ধরে বাড়িতে তোলে। কনের হাতে একটি সাদা সুতা ধরিয়ে দেওয়া হয় সুতার অপর প্রান্ত বরের মা ধরে আগে আগে করে নিয়ে যাওয়া হয় ও নির্দিষ্ট কক্ষে (ফুল ঘর) নিয়ে বসানো হয়।

জামেই-বউ জোড়া বানি দেনা- বিবাহ আসরে বরের বাম পাশে কনেকে বসানো হয়। জোড়াবাঁধার কাজটি সম্পাদন করেন একজন ওঝা। ওঝা জোড়া বাঁধার জন্য কনের পক্ষের আগত অভিভাবকের নিকট অনুমতি নেন। তারপর অন্যান্য উপস্থিতির নিকটও তাদের প্রতি কারো কোনো অভিযোগ বা কারো কোনো দাবি আছে কিনা তা জেনে নেন তারপর সবার নিকট কোন দাবি বা অভিযোগ না থাকা সাপেক্ষে মন্ত্র পাঠ করে তাদের জোড়া বেঁধে দেন।

চুমলাং পূজা- ওঝা জোড়া বাঁধার সময় চুমলাং পূজা দেন। এ চুমলাং পূজার জন্য কনেকে নদী থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়। ঐ জল দিয়ে ওঝা চুমলাং পূজা সমাপন করে। নব দম্পতি পূজায় চুমলাং পূজার দেবতাকে প্রণাম করেন। এর পর উপস্থিত আত্মীয়দের প্রণাম করা হয় ও সবার নিকট থেকে আর্শীবাদ নেওয়া হয়। তখন বীজসহ তুলা ও চাউল একটি থালায় নিয়ে তুলা ও চাউল নব দম্পতির মাথায় ছুঁয়ে থু থু শব্দ করে আশীর্বাদ করা হয়।

ঘ. হাল পালানি

আল পালনি অনুষ্ঠান সাধারণত আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে পালন করা হয়। তবে কখনো কখনো ৮ তারিখেও পালন করে থাকে। এদিনে কৃষক মাঠে কোন রকম হাল চাষ করে

www.pathagar.com

না। এমনকি মাটিতে কোন দাগ ঘা দিতে হয় এমন যে কোনো ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। পৃথিবীকে মা হিসেবে ধরে নিয়ে এ দিনে তার কোনো ক্ষতি থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এ দিনে কৃষকের ঘরে পিঠা পায়েস আয়োজন করা হয় এবং একে অপরের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। পুরুষরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মদ পান করে।

ঙ. লক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মী ধনের দেবতা। ঘরে ধনের কামনায় লক্ষ্মীপূজা অধিকাংশ (সনাতন ধর্মাবলম্বী) ত্রিপুরা জনগোষ্ঠি পালন করে থাকে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধিকাংশ ত্রিপুরা অধ্যুষিত গ্রাম সমূহের প্রতিটি বাড়ীতে এ পূজা অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। জুমের ফসল ঘরে তোলার পর শরতের পূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ দূর্গা পূজার পরবর্তী পূর্ণিমার রাতে এ পূজা দেওয়া হয়। ত্রিপুরা গ্রাম গুলোতে এদিন ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে। সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীগণ লক্ষ্মীকে পূজা দেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা সন্ধায় ঘরে ঘরে পূজা খাওয়ার লাইন ধরে, এ পূজা সাধারণত ঘরের মেয়েরা দিয়ে থাকে।

চ. প্রবারণা পূর্ণিমা

আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিন মাস বর্ষাবাস শুরু হয়, আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন তা শেষ হয়। এই তিন মাস ভিক্ষুগণ ধ্যানে মগ্ন থাকেন।'প্রবারণা' শব্দের অর্থ আশার তৃপ্তি,অভিলাষ পূরণ বা ধ্যান শিক্ষার সমাপ্তি। এই বর্ষাবাস প্রথা অনুযায়ী ভিক্ষু সংঘের বর্ষাবাসরত কোন ভিক্ষুকে দিনান্তে নিজ নিজ বিহারে উপস্থিত থাকতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে বর্ষাবাস ব্রত ভঙ্গ হয়। উল্লেখ্য, কোনো বিহারের ভিক্ষু বর্ষাবাস অধিষ্ঠান না করলে সে বিহারে কঠিন চীবর দান দানোৎসব হতে পারে না। আবার ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনায় জানা যায়- এই বর্ষাবাসব্রত পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক কিছুটা শিথিল করে গিয়েছেন। কোন ভিক্ষু তার বর্ষাবাস চলাকালে 'ওয়া ফাং' করে তিন দিনের জন্য যে কোনো জরুরি ধর্মসভায় কিংবা নিকট আত্মীয়ের কাল-ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। তবে এজন্য তাকে আমন্ত্রিত (ফাং) হতে হয়। এটি বিনয় পিটকের বিধান বলে ভিক্ষু সংঘের অভিমত।

বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকাদের জীবনে প্রভাব: তিন মাস বর্ষাবাস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য প্রযোজ্য হলেও তা প্রভাব ফেলে সাধারণ বৌদ্ধদের জীবন-যাপনে। অনেক দায়ক-দায়িকা এ তিনমাস নিরামিষ খাওয়া থেকে বিরত থাকে। আবার যারা নিয়মিত মদ, সিগারেট অর্থাৎ নেশা জাতীয় দ্রব্য পান বা ব্যবহার করেন তারা অনেকে এ তিন মাস এসব থেকে দূরে থাকার ব্রত পালন করেন। অনেকে ভিক্ষুদের এ বর্ষাবাস সময় উপবাস পালন করে। এ সময় বৌদ্ধদের বিবাহ একরকম নিষিদ্ধ থাকে। মারমা জনজাতি এ বর্ষাবাস সময় নতুন ঘর নির্মাণ বা নতুন ঘরে প্রবেশ করে না।

উৎসব: আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন শেষ হয় তিন মাসের এ ব্রত পালন। এ দিনে মন্দিরে উৎসব চলে। ভোরে দায়ক-দায়িকাবৃন্দ ভিক্ষুদের জন্য ছোয়েং (খাবার) নিয়ে

www.pathagar.com

মন্দিরে আসে। পুষ্প পূজা, পিঠা, পানি, প্রদীপ, বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন সন্ধ্যায় মন্দির, গ্রাম থেকে ফানুস ওড়ানো হয়। এই প্রবারণা পূর্ণিমার পরবর্তী একমাস পর্যন্ত বর্ষাবাস ব্রত পালনকারী মন্দিরগুলোতে পর্যায়ক্রমে কঠিন চীবর দান উৎসব পালন করা হয়। উল্লেখ্য, ফানুস উড়ানোর সময়ও প্রবারণা পূর্ণিমার পরবর্তী একমাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকে।

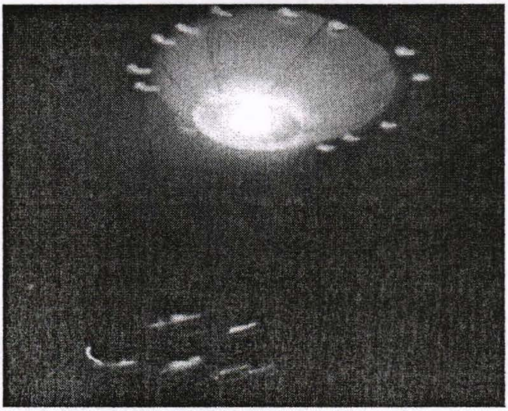

সকলের শান্তি কামনায় ওড়ানো হয় ফানুসবাতি

ছ. কামি মাই খুলুম

জুমের ধানের শীষে সোনালী রং ধারণ করা শুরু করলে মাইলোকমা পূজা "মাই বা লানাই" দিয়ে থাকে। এ পূজার জন্য ৫টি মোরগ বা মুরগী, মদ, খই, চাউল, পিঠা, জুমের আখ, ধূপবাতি, রিসা বা খাদি, কাবাং/নখাই বা কাল্লোং বাধ্যতামূলক। অচাই (পুরোহিত) এ পূজা সম্পাদন করে থাকে। জুমের নতুন ধান ঘরে তোলে খাওয়ার আগে নতুন চাউলের ভাতে মদ তৈরি করে পরলোকগত পিতা মাতা বা পিতামহ মাতামহ ও পিতামহী মাতামহীগণের নামে উৎসর্গ করে গ্রামের বয়োজেষ্ঠ্যদের আপ্যায়ন করা হয়।

অনেকে নবান্ন উৎসবও করে থাকে। এ উৎসবে নতুন ধানের ভাত পরলোকগত পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করা হয়। এমনকি গৃহপালিত পশুপাখি, আসবাবপত্রসহ যাবতীয় গৃহস্থালী দ্রব্যের নিকট নতুন ধানের ভাত উৎসর্গ করা হয়। এ উৎসবে মাত্র একটি মোরগের প্রয়োজন হয়।

নিম্নে মাইলোকমা স্তুতি দেওয়া হল-

ও আমা মাইলোকমা (৩ বার)
উত্তরনি-দক্ষিননি, পূর্বনি-পশ্চিমনি
হা ওয়ানজৈনি, হা সিকামনি

www.pathagar.com

পাতালনি-স্বর্গনি ফাইয়ৈ
কবং জাগা-অ কিসিং
কিসিং জাগা-অ কবং
আচুকফাইদি, বাচাফাইদি
তাংগৈ রখা তৈয়ৈ রখা...... ।

জুমে ধান বপনের সময় নারীরা মাথার চুল খোলা রাখে না। কারণ চুল খোলা রাখলে ধান বপনের গর্ত খোলা হয়ে অরক্ষিত হবে এতে বন মোরগ ধান খেয়ে ফেলবে আর ঘর লেপ করা যাবে না। কারণ এতে ধান বপনের গর্ত বন্ধ হয়ে যাবে ও ধান সঠিকভাবে গজাবে না।

জুমের ফসল যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা বন্য জন্তু জানোয়ারের দ্বারা ক্ষতি না হয় তার জন্য পরলোকগত পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করে মানত রাখে এর জন্য একটি মলি (মদ তৈরির জন্য ইস্ট) সংরক্ষণ করে রাখে।

জ. মারমাদের নববর্ষের উৎসব : সাংগ্রাই

বাংলাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নানা উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসবসমূহ প্রধানত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়। উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে জাতির নিজস্ব আত্ম-মর্যাদা ও আত্ম-নির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমা জনগোষ্ঠিরও বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাংগ্রাই একটি প্রধান সামাজিক উৎসবরূপে পরিগণিত।

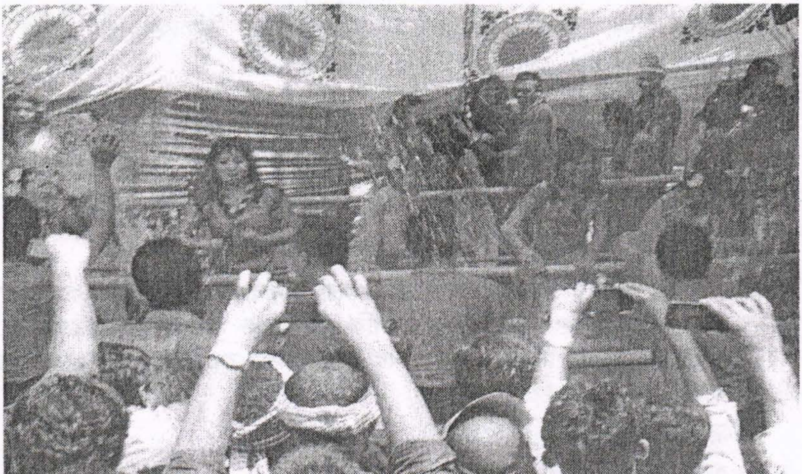

www.pathagar.com

সাংগ্রাই কী ও কেন?

বাংলা চৈত্রসংক্রান্তি অর্থ বিষুব সংক্রান্তি। সংক্রান্তি সংস্কৃত শব্দ। এ সংক্রান্তিই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে মারমা সমাজে সাংগ্রাই এর রূপ নিয়েছে। মারমাদের বর্ষপঞ্জি 'ম্রাইমা সাক্রই' এর শেষ ও প্রথম মাসের যুগসন্ধিক্ষণই হল 'সাংগ্রাই'। সাংগ্রাই মানে পুরাতন বর্ষের বিদায় ও নববর্ষের আগমন বুঝায়। এখানে বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণের মধ্যে পৃথক করার কোনো অবকাশ নেই। তাই দু'বর্ষের মধ্যে যোগাযোগ,সন্ধি বা মিলনও অভিহিত করা যায়। এ সাক্রই ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে গঃজাঃ মাং (গঃজাঃ রাজা) কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং তৎকালীন আরাকানি রাজসভায় বাঙ্গালি অমাত্য ও সাহিত্যিকদের বদৌলতে চট্টগ্রামে মঘীসন বা মঘাব্দ রূপে পরিচিতি পায়। সাক্রই অর্থ সন। বুদ্ধাব্দ,খ্রিস্টাব্দ, হিজরি, ত্রিপুরাব্দ,বঙ্গাব্দের অনুরূপ এ ম্রাইমা সাক্রই (মঘাব্দ)। এ সন চন্দ্রমাস ভিত্তিক হওয়ায় মাসসমূহও চন্দ্রকে কেন্দ্র করেই নামকরণকৃত। যেমন- তাইংখুঙলা, কছুংলা ইত্যাদি। মারমা ভাষায় লা অর্থ চাঁদ। মাসসমূহে লাগুওয়ে (কৃষ্ণপৰ), লাছাইং (শুক্লপৰ) ও পূর্ণিমা তিথির গণনা করতে হওয়ায় বাংলাসনের পাশাপাশি হলেও পয়লা বৈশাখের সাথে সাংগ্রাই পালনের ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের হয়ে থাকে। স্মরণাতীতকালব্যাপী মারমারা নিজস্ব বৎসর গণনা ও জীবনধারাকে প্রেরণা যোগাতে সাংগ্রাই পালন করে উৎসবাকারে।
রিকাজাঃ (পানি খেলা)

উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা

সাংগ্রাই এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা কবে শুরু হয়েছিল, তার সময়কাল বা ইতিহাস অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় না। মারমারা সংগ্রাই তিনদিনব্যাপী পালন করে। প্রথমদিন পাঁইছোয়াইক (ফুল সংগ্রহ), দ্বিতীয় দিন সাংগ্রাই আক্যা (মূলসাংগ্রাই) ও তৃতীয়দিন আপ্যাইং (প্রস্থান)। প্রথমদিন সাধারণত বাংলা চৈত্রমাসের শেষদিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যুষে বিভিন্ন উৎস থেকে ফুল সংগ্রহ করে ঘর-দুয়ার সজ্জিত করা, বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে ও খ্যংশাংমা (নদী/খাল দেবী) কে অর্পণ করা হয়। গবাদি পশুর গলায়ও পরানো হয়। পড়শিদের ঘরে ঘরে শস্য দানা ছিটিয়ে, গৃহপালিত প্রাণিদের প্রতি মমতা প্রর্দশন করে। বয়স্কদের অনেকেই তিনদিনের জন্য গৃহত্যাগ করে অষ্টশীল (৮টি পালনীয় শর্ত) গ্রহণ করতে বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান নেন। মূল সাংগ্রাই পালনের প্রস্তুতির জন্য নানা খাবারের আয়োজন, ঢেঁকিতে চাল গুড়া করা চলতে থাকে। এদিন যুবক-যুবতীরা ঐতিহ্যবাহী ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আরম্ভ করে দেয়। আবার কিছু যুবতী দলবেঁধে পাড়ার বয়স্কদের স্নান করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়দিনে সকাল থেকেই ঢেঁকিতে গুড়া করা বিন্নি চালের নানারকম পিঠা তৈরি করা হয়। যেমন-গ্যাংমুঃ, কদঅ্যুঃমুঃ, ফাউকাইৎমুঃ,ছিঃহ্নমুঃ,ছাইস্ভংমুঃ,ওথুমুঃ, রবমুঃ ইত্যাদি। মুঃ অর্থ পিঠা। কাউন চালের পায়েস তৈরি, ৩৬ প্রকারের বিভিন্ন শাক. ফল-মুলের দ্বারা হাংসরভং/ ফাসয়ং (পাঁচন) রান্না করা হয়। এ পাঁচন ছাড়া মারমাদের সাংগ্রাই আপ্যায়নে পূর্ণতাই আসে না। এ সব খাবার থেকে প্রথমে বিহারে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে দান এবং পরে প্রতিবেশী বয়স্কদের দানের পর আগত অতিথিদের পরম মমতায় আপ্যায়ন করা হয়।

www.pathagar.com

এ দিনে বিনা দাওয়াতে একে অপরের ঘরে বেড়ানোর রেওয়াজ আছে। সবাই দিনব্যাপী অতিথি আপ্যায়ন, বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন ও আনন্দ বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই কাটে। তৃতীয় দিন সমাপনী দিবস হিসেবে আনন্দ প্রকাশের শেষ মুহূর্ত। অসমাপ্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিন। তবে সব কিছু ছাপিয়ে রিকাজাঃ (পানি খেলা)-ই প্রধান আকর্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। জলভর্তি নৌকা সদৃশ্য বড় পাত্রে সম সংখ্যক তরুণ-তরুণী দু'দলে বিভক্ত হয়ে মগসদৃশ্য পাত্র দ্বারা পারস্পরিক জলসিঞ্চনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। একপাশে বিচারকেরা থাকেন ও তিনদিকে দর্শকেরা হাততালির মাধ্যমে উৎসাহ যোগায়। এ দিকে যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে পথচারীদের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমেও মৈত্রী ও ভালোবাসা বিনিময় করে। রাত্রে 'পাংখুং' গীতিনাট্যের মঞ্চায়ন হয়। যেমন- মনরিঃ,সাইতাথানু, থামরা, উঃদীনা, ওয়েসাইন্দ্রা ইত্যাদি। এগুলো রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক রচিত নাট্যবিশেষ। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা রাতভর পিনপতন নিরবতায় 'পাংখুং' উপভোগ করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

সাংগ্রাই উপলক্ষে জ্যোতিষী কর্তৃক প্রণীত সাংগ্রাইজাঃ (বাৎসরিক ভবিষৎবাণী) মায়ানমার থেকে প্রকাশিত হয় যুগে যুগে। সেখানে কৃষি, ব্যবসা, শুভ-অশুভ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সার্বিক পরিস্থিতির পূর্বাভাস থাকে। এ সাংগ্রাইজাঃ এর আলোকে মারমারা কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। রিফুঁচাং (পথিকের জন্য কলসভর্তি পানি রাখার স্থান), চেরাইক্ (পান্থশালা), রাস্তাঘাট, জাদি (স্মৃতিস্তম্ভ), ক্যাং সকলে মিলে সংস্কার ও পরিস্কার করে। গৃহনিমার্ণের কাজ সাংগ্রাই এর পূর্বেই সমাপ্ত করে প্রতীকী হিসেবে গৃহে উঠতে হয়। ঐ সময়ে প্রাণিহত্যা বা মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকা, পড়শিদের উঠানে শস্যদানা ছিটিয়ে, পোষা প্রাণির গলায় ফুল ঝুলিয়ে দিয়ে ত্যাগ ও মহিমা প্রকাশ করে। অপরদিকে দঅ্কাজাঃ /খএ্রাং (ঘিলা খেলা) এর আয়োজন, পাঁচন আপ্যায়নের দ্বারা পড়শিদের সাথে বন্ধন দৃঢ় করা, কাপ্যা (সামাজিক লোকগীতি), চাগায়াং (জুম ভিত্তিক লোকগীতি), রুদ্দু (কাহিনিভিত্তিক লোকগীতি), খ্রেখং-প্রিঃ আহ্মুঃ ইত্যাদি আয়োজনের দ্বারা অতীতের সুখ-দুখের স্মৃতিগুলো খুঁজে ফেরা হয়। পাংখুং নাট্য

www.pathagar.com

মঞ্চায়ন করে অতীতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন দিনের প্রত্যাশা জাগাতে অনুপ্রাণিত হয়। এখানে সামাজিক দ্রোহ, সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি চাওয়ার নিশানাও বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের সাংগ্রাই উৎসব জুম,পাহাড় ও বনকেন্দ্রিক। বন পাহাড়ে ফুল, ঘিলা, বাঁশ-বেত বিভিন্ন ফল-মূল পাওয়া যায় বিধায় তাদের জীবনধারায় এমন কৃত্যের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পরে।

পর্যবেক্ষণ সাংগ্রাই র‍্যালি

বৌদ্ধধর্মের সাথে সাংগ্রাই এর কোন রকমের সংশ্লিষ্টতা নেই। তা সত্তেও সাংগ্রাই উৎসবের সময়ে বুদ্ধের বেদীতে ফুল পূজা, বুদ্ধ পূজা, বুদ্ধস্নান, ভিক্ষুদের পিণ্ডদান, উপোস পালন, শীল গ্রহণ ও সভা আয়োজন করে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। তাছাড়া অধুনা মারমাদের জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিকতার ঘেরাটোপে জীবনের গতিও বেড়ে গেছে। তাই পিঠা তৈরি, ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নন্দন সংস্কৃতির চর্চা তেমন আর হয় না। দঅ্কাজা/খঞাং (ঘিলা খেলা) এর আয়োজনও ক্ষীয়মান, কেবল ছাপিয়ে উঠে রিকাজাঃ (পানি খেলা) এর প্রণোদনা। নিজেদের অবস্থানকে জানান দিতে সীমিত পর্যায়ে নিজস্ব পোষাকে র‍্যালি বা পদযাত্রা এবং সেমিনারের আয়োজন করার নতুন অনুষঙ্গ সংযোজিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. অংসুই মারমা (বয়স ৫৯), গ্রাম: পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২. উক্যচিং চৌধুরী (বয়স ৪৭), মাস্টার পাড়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি
৩. নয়ন রঞ্জন ত্রিপুরা (বয়স ৭০), হাদুক পাড়া, খাগড়াছড়ি
৪. নয়ন রঞ্জন ত্রিপুরা (বয়স ৭০), হাদুক পাড়া, খাগড়াছড়ি
৫. প্রীতিমা চাকমা (বয়স ৫৩), চাকুরিজীবি ও সংস্কৃতিকর্মী, মিলনপুর, খাগড়াছড়ি
৬. শশীভূষন ত্রিপুরা (বয়স ৫০), জোরমরম হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়ি
৭. খোকন বিকাশ ত্রিপুরা (বয়স ৩৫), গোলাবাড়ি, খাগড়াছড়ি
৮. আগাইদেমা মহাথের (বয়স ৪৭), মাস্টার পাড়া আনন্দ বৌদ্ধ বিহার রামগড়, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

ক. চাখৈ/ চাখ্রৈ

এ খাদ্য প্রধানত ত্রিপুরা আদিবাসীদের একপ্রকার রেসিপি। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সবজিকে ছাইয়ের পানি/ খারের পানির মাধ্যমে রান্না করা হয়। এ খাদ্যের স্বাদ মিষ্টিভাবাপন্ন। বিশেষ করে কোনো ধরনের সবজি একটু বেশি পরিপক্ক হয়ে গেলে চাখৈ/ চাখ্রৈ রেসিপির মাধ্যমে রান্না করা হয় এতে খাদ্য সুস্বাদু হয়। তরকারি সিদ্ধ হয়ে গেলে চাউলের গুড়া ছিটিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে তারপর নামানো হয়। রান্না ঠাণ্ডা হলে ভাতের সাথে পরিবেশন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ রেসিপি কিছু মাংসের বেলায়ও প্রযোজ্য। বিশেষ করে শুকরের মাংস এ রেসিপিতে রান্না করে খাওয়া হয়। বাঁশ কুড়ল, মূলা, কলা গাছ, বরবতি শিম ইত্যাদি সব্জি চাখৈ/ চাখ্রৈ করে খাওয়া হয়।

খ. বাংসুৎ/ মিড়ুক্যেয়্যে

এ খাদ্য প্রধানত ত্রিপুরা আদিবাসীদের একপ্রকার রেসিপি ও প্রিয় খাদ্য। বাঁশ কুড়ল (বাঁশের কচি চারা) (মেওয়া/মইওয়া/মৈয়া- ত্রিপুরা) কুটে পরিষ্কার করে ধুয়ার পর ২-৩ দিনের জন্য পরিমাণমত পানিতে একটি পরিষ্কার পাত্রে চুবিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখা হয়। এতে টক স্বাদ চলে আসে। টক হলে তাতে পরিমাণ মত তেল দিয়ে রান্না করা হয় এবং রান্না হয়ে গেলে চাউলের গুড়া ছিটিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে তারপর নামানো হয়।

গ. গুদক/ গুদ্যেয়্যে

এটি প্রায় সব আদিবাসীদের একটি প্রিয় রেসিপি। তরকারি কাঁচা মরিচ দিয়ে বাঁশের চোঙে রান্না করা হয়। এতে শুটকি, পেঁয়াজ, জুমের মসলা জাতীয় পাতা যেমন সাবারাং/ বানা, ফুজি/ খুমচানি ব্যবহার করা হয়। রান্না হয়ে গেলে চুঙের ভিতর একটি সরু লাঠি দিয়ে পেস্ট করাা হয়। এতে এক ধরনের ফ্লেভার আসে। কিছু কিছু মাংসও এ পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। যেমন শুকরের মাংস, মুরগীর মাংস ইত্যাদি।

বাঁশের চুঙায় গুদক রান্না

www.pathagar.com

ঘ. মৈক্র/ আপ্রেং/ উচ্ছ্যে

এটি ত্রিপুরা ও মারমা আদিবাসীরা বেশি পচ্ছন্দ করে। বিশেষ করে টাটকা সব্জি ও শাক এ পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। সব্জি (তাজা) পরিস্কার করে ধুয়ে চুলায় পরিমাণ মতো পানি, লবণ, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। পানি সেদ্ধ হলে তবে তরকারি দেওয়া হয় ও ঢাকনা দিয়ে রাখা হয়। তরকারি সেদ্ধ হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা হয়। এ পদ্ধতিতে রান্নায় তেল ব্যবহার করা হয় না।

ঙ. মৈ প্রেংজাক

ছোট মাছ, মুরগীর মাংস, কচুর ডাঁটা, ও মাশরুম এ পদ্ধতিতেও খাওয়া হয়। বাঁশের চোঙ্গায় পেঁয়াজ ও লবণ দিয়ে সিদ্ধ করার নামই হচ্ছে মৈ প্রেংজাক। প্রেংজাক তরকারিতে সচরাচর মরিচের ব্যবহার খুবই নগন্য, অনেক ক্ষেত্রে মরিচ দেওয়া হয়না। ছোট শিশুদের খাবারের জন্য প্রেংজাক পদ্ধতিতে রান্না করা হয়।

চ. মুজাক/ হেবাং

ছোট মাছ, মাশরুম, শুটকি ইত্যাদি মুজাক পদ্ধতিতে রান্না করা যায়। তরকারি পরিষ্কার করে ধুয়ে লবণ, পেঁয়াজ দিয়ে কলা পাতা ৩-৪ স্তর করে কাঁচা হলুদ বেটে তা মাখিয়ে মোচা করে বেঁধে কাঠ কয়লার আগুনে দিয়ে সরাসরি রান্নার নাম মোজাক। মোজাক মানে মোচা করে বেঁধে আগুনে রান্না করা। এ পদ্ধতিতে রান্না করা তরকারি খুব সুস্বাদু হয়।

কলাপাতায় মুজাক রান্না

www.pathagar.com

ছ. হাংজাক/ শিক্যে

মাঝারি আকারের মাছ, মাংস হাংজাক পদ্ধতিতে খাওয়া যায়। আগুন জালিয়ে মাছ বা মাংস কাঠিতে গেঁথে প্রয়োজনমত গুড়া মরিচ, লবণ ইত্যাদি দিয়ে ছেঁকা হয়। তারপর গরম গরম পরিবেশন করা হয়।

জ. লাকসু/ হোর্বো

কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, লবণ দিয়ে একধরনের ভর্তা তৈরি করার নাম লাকসু। কাঁচা মরিচ ও চাপা শুটকি আগুনে পুড়ে বেটে পেস্ট বানানো হয়। পেঁপে, মূলা, শিমুল গাছের শুকনো ফুল ইত্যাদি লাকসু করে খাওয়া হয়। সুরি মাছের শুটকি, হাঙ্গর মাছের শুটকি ইত্যাদিও লাকসু করে খাওয়া হয়। আবার মুরগী সেদ্ধ করেও লাকসু খাওয়া হয়।

ঝ. মাইমি ও আওয়ান পুংজাক/ বিনিহগা

বিনি চাউল পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নারিকেল চিনি ও কলা দিয়ে কলা বা লাইরু (বনের একধরনের পাতা) পাতা দিয়ে ছোট ছোট মোচা করে গরম পানির ভাপে সিদ্ধ করা হয়। এর নাম মাইমি পুংজাক। বিনি চাউল গুড়া করে অনুরূপ পদ্ধতিতে খাওয়ার নাম আওয়ান পুংজাক।

ঞ. মাইমি প্রেংজাক

বিনি চাউল পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নারিকেল, গুড়, কলা দিয়ে বাঁশের চুঙ্গায় ভরে রান্না করার নাম মাইমি প্রেংজাক।

ট. সান্যে পিঠা (চাকমা)

আতপ চালের আধা গুড়া করে ভাঙতে হবে। তারপর এই চাউলের গুড়া দুইহাতের মুঠোকরে গোল গোল দলা করতে হবে শুকনা অবস্থায়। এরপর গরম পানি চুলায় বসাতে হবে। গরম পানির পাত্রের উপরে ভাপে ঝালি বসিয়ে গোল গোল দলা গুলি সিদ্ধ করতে হবে প্রায় ১ ঘন্টা। এরপর গোল দলাগুলি কুলার উপর ঢেলে দিয়ে দলাগুলি ভাঙতে হবে এবং ১০ মিনিট পর ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে গরম গরম মাখতে হবে প্রায় ৩০-৩৫ মিনিট। এরপর নারিকেল কুড়িয়ে ও কিছু কিছু গুটা গুটা করে মাখতে হবে। এরপর দুই হাতের তালুর সাহায্যে প্রামান সাইজে রম্বস আকৃতির পিঠা তৈরি করতে হবে। এই রম্বস আকৃতির পিঠার ভিতর খেজুরের গুড় দিতে হবে।

এই তৈরি পিঠা আবারো গরম পানির ভাপে ১ ঘন্টা সিদ্ধ করতে হবে।

পরিমাণ: প্রতি কেজি আতপ চাউলে নারিকেল ১টি, গুড় ২০০ গ্রাম।

ঠ. বিন্নি হগা পিঠা (চাকমা ও ত্রিপুরা)

বিন্নি চাউল ১ কেজি, পাকা কলা (বাংলা) ২০টি, নারিকেল ২টি, কলা পাতা ৩-৪টি। লবণ পরিমাণমত।

www.pathagar.com

প্রস্তুত প্রনালী: চাউল ৩ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভালমতো চাউলগুলি ধুয়ে পানি ঝড়ে ফেলতে হবে। এরপর বড় একটা গামলায় চাউল, কলা, নারিকেল ছোট করে কুটে, লবণ দিয়ে একসাথে মাখতে হবে। এরপর কলা পাতায় মোচাকৃতি করে মুড়িয়ে বাঁশের শলাকা তৈরি করে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। বানানো সম্পন্ন হলে গরম পানি ভাপে সিদ্ধ করতে হবে।

ড. বরা পিঠা (চাকমা) উপকরণ

চাউল কেজি, পাকা কলা ১০টি, নারিকেল ১টি (ছোট কুচি করে কাটা), সয়াবিন তৈল আধা লিটার। লবণ পরিমান মত।

প্রস্তুত প্রণালী: বিন্নি চাউল ৩ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে এরপর ভালমতো চাউলগুলি ধুয়ে পানি ঝড়ে ফেলতে হবে। ঢেঁকি/ ব্লেন্ডারের সাহায্যে মিহি করে গুড়া করতে হবে। এরপর যাবতীয় উপকরণ একসাথে একটি বড় গামলায় নিয়ে মাখতে হবে। দুই হাতের তালুর সাহায্যে গোল-চ্যাপ্টা আকৃতি করে ডুবো তেলে ভাজতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. মনপ্রিয়া ত্রিপুরা (বয়স ৪৭), হাদুকপাড়া, খাগড়াছড়ি
২. আরেমা মারমা (বয়স ২৯), রামগড়, খাগড়াছড়ি)
৩. ম্রাসাং মারমা (বয়স ৪৮), গর্জন টিলা পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৪. অনুরূপা চাকমা (বয়স ৩৪), মহাজন পাড়া, খাগড়াছড়ি
৫. রাজুশ্রী ত্রিপুরা (বয়স ৩২), খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকনৃত্য

ক. ত্রিপুরা লোকনৃত্য : গরিয়া

গরিয়া একটি সমবেত নৃত্য। পুরনো বছরের বিদায় ও নতুন বছরের আগমনকে ঘিরে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। গরিয়া নৃত্য প্রেম, আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধির নৃত্য। নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে গরিয়া দেবের স্তুতি করার লক্ষ্যে এই নৃত্য পরিবেশিত। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, গরিয়া দেব তুষ্ট হলে পরিবার ও সমাজে সুখ সমৃদ্ধি আসে। গরিয়ার নৃত্যের সাধারণ আচার অনুসারে এই নৃত্যে নারীদের অংশগ্রহণ থাকে না। কালক্রমে আধুনিক সভ্যতার বিকাশের ফলে বর্তমানে নারী-পুরুষ সমবেত অংশগ্রহণে এই নৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে।

গরিয়া নৃত্যে অবশ্যপালনীয় কিছু রীতি নীতি: গরিয়া নৃত্যে অংশগ্রহণকারীদেরকে খেরেবাই বলা হয়। এই নৃত্যে অংশগ্রহণকারী কেউ একবার এই নৃত্যে অংশ নিলে তাকে পরপর তিনবার বা তিনবছর ধরে অংশ নিতে হয়। কেউ যদি কোনো কারণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা প্রার্থনামূলক মানত করে গরিয়া দেবের পূজা করতে হয়। এই নৃত্যে অংশ নিতে হলে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করতে হয়। অশুচি মনে এই নৃত্যে অংশ নেওয়া মানা। সংকল্পবদ্ধ গরিয়া নৃত্যশিল্পীরা একমাস ধরে তালিমে অংশ নেন। কাউকে পায়ে ধরে প্রণাম করা, ভাল বিছানায় ঘুম যাওয়া, মন ও পরিধেয় অশুচি হয় এমন কাজে অংশ না নেওয়া ইত্যাদি নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হয়। এই নৃত্যে সাধারণত ২২ জন নৃত্যশিল্পী অংশগ্রহণ করে থাকে, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে অধিকসংখ্যক শিল্পীও অংশ নিয়ে থাকে। গরিয়ার শূল সকল গৃহস্থের উঠোনে গাড়ানো যায় না। কেবল মাত্র মাল্যধারী ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

উঠোনে তা গাড়ানো হবে। অন্যদের বেলায় শূলটি মাটিতে না স্পর্শ না করিয়ে খড়্গের উপর রাখা হয়।

গরিয়া নৃত্যের তাল ও মুদ্রা: গরিয়া নৃত্যে মোট বাইশটি তাল ও মুদ্রা থাকে। এই ২২ টি মুদ্রায় মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত সকল ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি মুদ্রা ৩ বার করে প্রদর্শন করা হয়। ঢোলের বোল দিয়ে এক একটি মুদ্রার নির্দেশনা দেওয়া হয়। একজন অচাই ও একজন দেওরাই এই নৃত্য পরিচালনা করে। গরিয়া নৃত্যের মুদ্রাগুলো হল-

১. উঠোন পরিষ্কার করা (খলা ফালনাই)
২. পোষাক পরিধান করা (চাংখা খানাই)
৩. পাখির নৃত্য (তকসা বালনাই)
৪. ধান ঝাড়া (মাই সিপনাই)
৫. মথুরা পাখির লড়াই (তকুরু তানলাইনাই)
৬. তুলা ধুনো দেওয়া (তুলা ককনাই)
৭. তুলা আহরণ (খুল খলনাই)
৮. কাপড় কাচা (রি সুনাই)
৯. জুমে ধান রূপন (হু-গ মাই কাইনাই)
১০. জুমের ধান কাটা (হুকনি মাই রানাই)
১১. জুমের ধান ঝাড়ানো (মং বুনাই)
১২. ছড়ার মাছ ধরা (আসরাই হাকর খুরনাই)
১৩. নারীদের আহবান (বিরক রিংনাই)
১৪. কচ্ছপের চলন কেরাং হেমনাই)
১৫. হরিণীর লম্ফ (মসৈ বালনাই)
১৬. লুই দিয়ে মাছ ধরা (লুসি খুলনাই)
১৭. হাতে হাত ধরা (য়াকবাই য়াক রমনাই)
১৮. শুকরের স্নান (ওয়াক তৈ কুনাই)
১৯. দেব-দেবীর প্রণাম (মাতাই খুলুমনাই)
২০. হাতির গোসল (মায়ুং তৈ কুনাই)
২১. নাউই পাখির উড়ে যাওয়া (নাউই বিলনাই)
২২. হাতে তালি দেওয়া (য়াফা খরপনাই)

গরিয়া নৃত্যের আবাহনী: গরিয়া নৃত্যের দল 'খেরেবাই' কোনো গৃহস্থের উঠোনে ঢুকার সাথে সাথে নির্দিষ্ট কিছু বুলি আউড়িয়ে গরিয়া দেবের আগমনীবার্তা ঘোষণা করে। খেরেবাই দলের সর্বাগ্রে থাকেন ত্রিশূলের মতো লাঠির মাথায় স্থাপিত গরিয়া দেবের মূর্তি বহনকারী অচাই, তাঁর পিছনে দেওরাই। অচাইয়ের আওড়ানো বুলি অনুসরণ করে খেরেবাইরা বুলি আওড়িয়ে যায়। নিচে গরিয়া আবাহনীর বাংলারূপ তুলে ধরা হল-

www.pathagar.com

ফাইখালে ফাইখালে
গরিয়া ফাইখালে
থুংলাইনাই থুংলাইনাই
থুংনানি কাইসা মাথাকয়া
গরিয়া মাসানাই
গরিয়া মাসায়াখাই
বরক-রবক বারেয়া
হাময়া-চায়া কাকনাইয়া

ওরে খেরেবাই-
হা লেলনাই হা লেলনাই
গরিয়া হা লেলনাই
হায়া হাদিস্ বেরাইয়ই
হাপং হাতাই ঋাসগই
মৈংদুক মৈখ্রেং কাসাগই
গরিয়া ফাইখালে

মাথাকনিখাই মাথাকদি
কা-সনিখাই কা-সদি
গরিয়া ফাইখা নিনি ন-গ
খলা নক ফাললাইদি
হর-তৈ তনলাইদি
গরিয়া ফাইখা নিনি ন-গ

ফাইখালে ফাইখালে
গরিয়া ফাইখালে
গরিয়া মাসানাই
গরিয়া আচকনাই
গরিয়া-ন পুজিখাই
গরিয়া-ন খুলুমখাই
মাই করইখাই মাই মাননাই
বিয়াল যত চাংসকনাই
বাসা করইখাই বাসা মাননাই
খুল করইখাই খুল মাননাই
রাং মাননাই কাবাং কাবাং
রাংচাক মাননাই বচং বচং
গরিয়া-ন খুলুমখাই

আইলামরে আইলামরে
আইলামরে গরিয়া
খেল খেলায় খেল খেলায়
খেল খেলাইতে মানা নাই
গরিয়া নাচতে চায়
গরিয়া না আসিলে
ধনজন বাড়ে না
রোগ-ব্যাধি ছাড়ে না

ওরে খেরেবাই-
দেশ বেড়ায় দেশ বেড়ায়
গরিয়া দেশ বেড়ায়
দেশে দেশে বেড়াইয়া
টিলা টঙ্কর পার হইয়া
পাহাড় মুড়া উঠিয়া
গরিয়া আইল চলিয়া

ওরে মানা থাকিলে মানা কর
বাধা থাকিলে বাধা কর
গরিয়া আইল তোমার ঘর
ঘর উঠান সাফ কর
আগুন পানি তৈয়ার কর
গরিয়া আইল তোমার ঘর

আইলামরে আইলামরে
আইলামরে গরিয়া
গরিয়া নাচতে চায়
গরিয়া বসতে চায়
গরিয়াকে পূজিলে
গরিয়াকে ভজিলে
ধন না থাকিলে ধন পায়
দুঃখ দশা ছাড়িয়া যায়
জন না থাকিলে জন বাড়ে
যশ না থাকিলে যশ বাড়ে
অর্থ হবে কাড়ি কাড়ি
সোনা হবে দাড়ি দাড়ি
গরিয়াকে পূজিলে

www.pathagar.com

গরিয়া-ন গসেখাই
হাময়া চায়া কাগই থাংনাই
ফান-কল বারেনাই
আ-গরজা কেকল-গ খিতাপ কলই মাসা---

গরিয়াকে মানিলে
পাপ তাপ মোচন হয়
বল বীর্য বৃদ্ধি পায়
বোয়াল মাছ পাল্টি খায় তাল মিলাইয়া নাচো----

গরিয়া নৃত্যের কিছু গান: নৃত্য চলাকালে অচাই এবং দেওরাই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন গান বুলি আওড়িয়ে থাকেন। এই বুলি ও গানগুলো জীবনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিধায় এখানে শ্রুতিমধুর সুরের সাথে দর্শনার্থী যুবতি নারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে নানা অশ্রাব্য বুলি অথবা হাস্যরসাত্মক গানও হয়। গরিয়া নৃত্যে ব্যবহৃত একটি গানের নমুনা নিচে উপস্থাপন করা হল-

রদি রদি বাইয়ারক
খেরেবাইনি চেরকরক
লাচি কিরি তাঅংদি
লাচি কিরি তাঅংদি
লাচি কিরি অংখালাই
তকমা খিকর মাচানাই

এসো এসো বন্ধুরা
গরিয়ার বন্ধুরা
লজ্জা শরম করতে নেই
নাচতে নেমে লজ্জা পেলে
নিকৃষ্টতম উপাধি পাবে
অখাদ্য খেতে হবে

মাচায়াগই চুং ফাইয়া
মানুংয়াগই চুং ফাইয়া
মাসানিসে চুং ফাইঅ
গরিয়াসে চুং ফাইঅ

ভিক্ষার জন্য আসিনি
খাদ্যের খুঁজে আসিনি
নাচার জন্যই এসেছি
গরিয়ার কাজে এসেছি

খেরেবাইনি চেরকরক
চিনি আমা মাইলুকমা
চিনি আমা খুলুমা
গরিয়া রাজা বেরাইঅ
গরিয়া রাজা বেরাইখাই
মাইবাই খুলবাই মানবাইনাই।

খেরেবাইয়ের বন্ধুরা
শস্যের দেবী আমাদের মা
কার্পাসের দেবী আমাদের মা
গরিয়া রাজা দেশ বেড়ায়
গরিয়া রাজা দেশ বেড়ালে
ধন-যশ হবে সবার ঘরে।

নাচতে নাচতে নৃতানুষ্ঠানে উপস্থিত যুবতি দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে হাস্যরসাত্মক গান হয়। গানগুলো অনেক সময় সাধারণ সুশীল শব্দপ্রয়োগের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রেমময় নানা প্রস্তাবের পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে মানব-মানবীর আদিম প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নানা উপমা। সেরকম কয়েকটি গানের উদাহরণ নিচে উপস্থাপন করা হল-

তৈসা বিসিংনি হলং, তৈসানি বিসিংনি হলং

www.pathagar.com

চিনি কামিনি সিক্কারকনি তলাঅ গলং গলং
নৃত্য দেখতে আসা মেয়েদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এখানে গরিয়ার নৃত্যশিল্পীরা বলছে-
গভীর ছড়ায় থাকে যেমন পিচ্ছিল সব পাথর
এই গ্রামের মেয়েদের যে হুস নেই, নিচে নেই কাপড়

অথবা
পুনসালাই আদার ওয়ালয়া, পুনসালাই আদার ওয়ালয়া
চিনি কামিনি সিক্কারকলাই পতসে খাতৈ খায়া

যুবতি মেয়েদের উদ্দেশ্যে নৃত্যশিল্পীরা বলছে-
ছাগল ছানাটার যেমন খাদ্য খাওয়ার সাধ্য নেই
তেমনি আমাদের মেয়েদের বিয়ে করার যৌবন নেই

গরিয়া প্রার্থনা : উঠোনে ২২ টি মুদ্রা বা তাল প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে গরিয়া নৃত্য পরিবেশন শেষে শুরু হয় গৃহস্থের বায়না। গৃহস্থের বায়না অনুসারে নানা মুদ্রার বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করতে হয় গরিয়া শিল্পীদের। এই মুদ্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১. কাঠবিড়ালির গাছে আরোহন (মান্দার বফাং কামানি)
২. জোড়া কাঠ পার হওয়া (র-ম বালমানি)
৩. যুবক-যুবতির প্রেম ও বিবাহ
৪. স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া
৫. বানর দম্পতির সংসার

এই বিশেষ নৃত্যশেষে গৃহস্থ তার সাধ্য অনুসারে পানীয়, খাবার-দাবার, পশু-পাখি ও অর্থ-শস্য দিয়ে গরিয়া দেবের পূজা করেন। এই সময়ে অচাই গৃহস্থের একটি রিত্রাক (পাহাড়ি তুলা দিয়ে তৈরি চাদর)-এর এক প্রান্ত গৃহস্থের হাতে ধরিয়ে অন্য প্রান্ত দুইজন খেরেবাইয়ের হাতে দিয়ে চাদরের উপর ধন ও যশের প্রতীক তুলা ও ধান ছিটিয়ে কিছু বুলি উচ্চারণ করেন, যা অন্য খেরেবাইরা অনুসরণ করে। বুলিগুলো হল-

অ গরিয়ানি চেরকরক	ও গরিয়ার জওয়ানরা
ইঁ ন-গ তামা?	এ ঘর কি?
কুপ্লুং	ভরপুর
খুল-সিপিং?	তিল-সুতা?
কুপ্লুং	ঘরভরা
মসক-মিসি?	গরু মহিষ?
কুপ্লুং	ঘরভরা
রাংচাক-রুফাই?	সোনা রূপা?
কুপ্লুং।	ঘরভরা।

www.pathagar.com

গরিয়ার বিদায়: গৃহস্থের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে অচাই বিদায়ের বার্তা ঘোষণা করেন এভাবে-

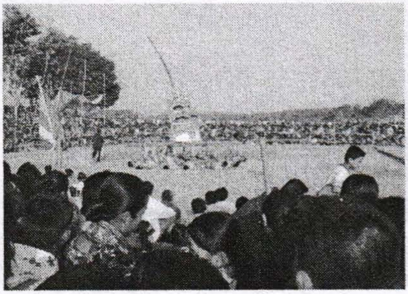
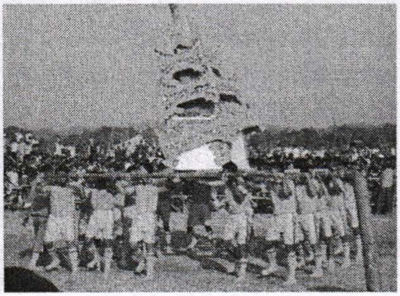

ফাইলাইদি ফাইলাইদি
ওরে খেরেবাই
গরিয়া বাচানাই
গরিয়া বেরাইনাই
গরিয়া মাসানাই
হায়া হাদিসি বেরাইনাই
ওরে গরিয়া..

আইসরে আইসরে
ওরে খেরেবাই
গরিয়া উঠতে চায়
গরিয়া বেড়াইতে চায়
গরিয়া নাচতে চায়
দেশে দেশে ঘুরতে চায়
ওরে গরিয়া..

এভাবে গরিয়ার দল ধীরে ধীরে এক গৃহস্থের উঠোন ত্যাগ করে অন্য উঠোনে গিয়ে উপস্থিত হয়। আবার শুরু হয় একই কায়দায় গরিয়া নৃত্য অন্য উঠোনে।

গরিয়া নৃত্যে ব্যবহৃত উপকরণাদি: গরিয়া নৃত্যের জন্য নিম্নে উল্লিখিত উপকরণাদি অত্যাবশ্যক–

১. গরিয়ার প্রতীক একটি লাঠির মাথায় লৌহনির্মিত বর্শাফলক। ত্রিপুরাদের দফা বা গোত্র অনুসারে এই মূর্তির নানারূপ রয়েছে। কেউ পূর্ণাঙ্গ গরিয়া তথা হাত-পাসহ গরিয়া মূর্তি বহন করে। কেউ কেউ শুধু মাথার প্রতীক বর্ষাফলক বহন করে। কেবলমাত্র জমাতিয়া দফা অষ্টধাতু সম্বলিত দুই হাত সম্প্রসারিত গরিয়া বহন করে। অন্যান্য দফাদের মধ্যে কেউবা কেবলমাত্র শূল বা বর্শাফলক, কেউবা কেবল বাঁশের দণ্ড বহন করে।
২. শূল বা ফলকের গলায় বাঁধার জন্য একটি রিসা বা ত্রিপুরা নারীদের ব্যবহার্য খাদি বা বক্ষবন্ধনী।
৩. উক্ত বক্ষবন্ধনীতে বাঁধা থাকে চাউল, দূর্বা, তুলা ও রৌপ্য মুদ্রা।
৪. প্রত্যেক নৃত্যশিল্পীর হাতে থাকে একটি রিসা এবং দুইটি বাঁশের কঞ্চি।
৫. অচাইয়ের হাতে থাকে একটি খড়্গ।
৬. খাম/ খ্রাম যার পরিমাপ ৫ পোয়া হাত।

খ. ত্রিপুরা লোকনৃত্য : কের

প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবার অথবা মঙ্গলবারে ত্রিপুরা জুমিয়া গ্রামগুলোতে কের পূজা আয়োজন করা হয়। পুরো গ্রামকে বেষ্টনিতে গণ্ডিবদ্ধ করে এই কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার প্রথম দিনের শেষ পর্বে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে

www.pathagar.com

শুরু নৃত্যের পালা। তৈমানি অচাই, তৈমানি তানসরাই, বারিনি অচাই, বারিনি তানসরাই, মাইলুকমানি অচাই, মাইলুকমানি তানসরাই একে একে সকলের নৃত্যের পর নাচতে হয় পাড়ার রোয়াজা ও অচাই বুড়ার।

নৃত্যের মূল উপকরণ : দামা (খড়গ) ও ঢোল

নৃত্যের মুদ্রা : কের পূজা নৃত্যে মোট ১৪টি মুদ্রা থাকে। ১৪ দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এসব মুদ্রা পরিবেশন করা হয়।

কের পূজা দুইদিন ধরে আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন গ্রামের সকলে মিলে এই পূজায় অংশগ্রহণ করে। গ্রামবাসীর স্বার্বিক মঙ্গল কামনায় এই দিন চৌদ্দ দেবীর পূজা করা হয় ।

দ্বিতীয় দিন মূলত পূজা করা হয় গাজী ও কালু দুই ভাইকে। কথিত আছে এই দুইভাইকে বনের হিংস্র জীবজন্তু মান্য করে চলে। তাই বছরের শুরুতে তাদের পূজা করা হলে সারা বছর গ্রামবাসী অশুভ শক্তি বা বনের জীবজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

পালনীয় নিয়ম : এটি একটি সামাজিক আচারের অংশ। তাই কের পূজায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলা খুবই কড়াকড়ি। এই পূজা চলাকালে পুরো গ্রাম বেষ্টনিতে বদ্ধ থাকে।

কের পূজার জন্য সাজানো পূজা সামগ্রীর একাংশ

পূজার পূর্বরাতে গ্রামবাসীদের সমবেত প্রার্থনা

www.pathagar.com

তৈবুংমা বা গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে চলমান সরোবরে বিশেষ পূজো

এই সময়কালে বাইরের কেউ সেই বেষ্টনির মধ্যে প্রবেশ করা অথবা গ্রামের কেউ বেষ্টনির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। অন্যথায় সামাজিক দণ্ড তাকে মানতেই হবে। এই বিধি নিষেধের আবার প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। প্রথম দিনের পালনীয় বিধিনিষেধগুলো হলো– পূজো আচারের শুরু অর্থাৎ পূর্ব দিনের মধ্যরাত্রিতে গ্রামবাসী মিলে রিচুয়াল করার মাধ্যমে পূজো উৎসর্গ করার পর থেকে পূজোর দিনের মধ্যাহ্নভোজের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ পূজো আচার শেষ করে গ্রামবাসীরা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ চলতে থাকবে। দ্বিতীয় দিনের বিধিনিষেধগুলো হলো- প্রথম পূজোর দিনের মধ্যরাত্রি হতে পরবর্তী পূজোর দিনের সন্ধ্যা অর্থাৎ রাতের তারাগুলো আকাশে দৃশ্যমান না হওয়া পর্যন্ত বিধিনিষেধগুলো পালনীয়।

গঙ্গা পূজোর বেদি

বিধিনিষেধগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

১. বেষ্টনির বাইরের লোকদের (গ্রামের লোক হলেও) বেষ্টনির ভেতরে প্রবেশ না করা
২. বেষ্টনির ভেতরের লোকদের (বহিরাগত হলেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের চাঁদা দিয়ে যে কেউ এই পূজার অংশীদার হয়ে যেতে পারেন) বেষ্টনির বাইরে না যাওয়া

www.pathagar.com

৩. হৈ হুল্লোড় না করা
৪. গান বাজনা না করা
৫. খেলাধূলা না করা
৬. জঙ্গলে প্রবেশ না করা (লোক বিশ্বাস অনুসারে এই সময় জঙ্গল অরক্ষিত থাকে, তাই যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে)
৭. নখ, চুল ইত্যাদি না কাটা
৮. মদ্যপান না করা

গ. মারমা লোকনৃত্য : সইঙ-আকাহ্

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শবদাহের গান ও নাচ বিশেষ। গানের চেয়ে নাচের প্রাধান্য বেশি থাকে। তবে এটি শোকসংগীত বা শোকনৃত্য নয়। মারমা সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘের প্রধানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শবদাহের সময় সইঙ-আকাহ্ আয়োজন করা হয়। রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শবদাহের সময়ও এ আয়োজন দেখা যায়। সইঙ-বাঁশ, কাঠ ও রঙ্গিন কাগজ দিয়ে মারমা ঐতিহ্য অনুসরণে বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে বানানো দোলনা বিশেষ। একজন দলপতি নেতৃত্বে ১২ থেকে ১৮ জনের একটি দল এই নৃত্য ও গীত পরিবেশন করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দোলনা না ভাঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত নৃত্য চলতে থাকে। আসলে দলটির লক্ষ্যেই থাকে নৃত্যে দোলনাটি ভাঙ্গার। উৎসবমুখর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে এ সইঙ আকাহ্ চলতে থাকে।

মৃত ব্যক্তির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রর্দশনপূর্বক এই সইঙ আকাহ্ আয়োজন করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. তথ্যদাতা: নয়ন রঞ্জন ত্রিপুরা (বয়স ৭০), হাদুক পাড়া, খাগড়াছড়ি
২. আগাইদেমা মহাথের (বয়স ৫৬), মাস্টারপাড়া আনন্দ বৌদ্ধবিহার, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৩. হজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (বয়স ৬২), অচাই, বিনয় কার্বারী পাড়া, জোরমরম, খাগড়াছড়ি
৪. নয়ন রঞ্জন ত্রিপুরা (বয়স ৭০), হাদুকপাড়া, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

ক. ত্রিপুরা লোকক্রীড়া

প্রমোদ প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা পরিচয়ের জন্যই ত্রিপুরাদের ক্রীড়াচর্চার চল দেখা যায়। অধিকাংশ খেলার বিভিন্ন তাৎপর্য দেখা যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে খেলার প্রচলন দেখা যায়, ঘরের বাইরে ও ঘরের ভেতরে এ দু'ধরনের খেলার প্রচলন রয়েছে। যেসব খেলা বাইরে খেল হয় তা হল-

১. সুকৈ (ঘিলা): ঘিলা নামক এক ধরনের গাছের বীজ দিয়ে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে খেলা হয়। বৈসু উৎসবকে ঘিরে এ খেলা খেলে থাকে। খেলা পরিচালনার জন্য রেফারি বাধ্যতামূলক নয়। একাধিক খেলোয়ার নিয়ে দল বেঁধে এটি খেলা হয়।
২. চু (লাটিম): চু কাঠের তৈরি লাটিম আকৃতির খেলা। চু সাধারণত খেলোয়াড়রা নিজেরাই তৈরি করে।
৩. দাং (দাগুলি): এটি বাংলার দাংগুলি খেলা।
৪. গুদু (হা ডু ডু): এটি বাংলার হা ডু ডু খেলা।
৫. কেশক রলাইনাই: এ খেলা শিশুরাই খেলে। এখানে কোন দলে নয় এককভাবে সকলেই সকলের প্রতিযোগি। প্রথমে যে কেউ একটি আঙ্গুলকে নির্ধারণ করে কে পঁচা। যে প্রথমে সেই পঁচা আঙ্গুল ধরবে, সেই পঁচা। সে যদি অন্যদের কাউকে একটা সীমার মধ্যে ছুঁতে পারে তা হলে যাকে ছুঁয়ে দিল সে পঁচবে।
৬. বাঁশ ঠেলা: এ খেলা দড়ি টানা খেলার ঠিক উল্টো ধরনের। এ খেলায় একটি শক্ত বাঁশ নেওয়া হয় ও মাঝ বরাবর একটি দাগ টানা হয়। দু'প্রান্তে দুটি দলে সমান সংখ্যক সদস্য অন্য প্রান্তের লোককে সীমা রেখা পার করে ঠেলে দিতে পারলেই জিতে গেল।

খ. চাকমা লোকক্রীড়া

দলা হারা, দড়ি টানাটানি হারা, দুমুরো দুমুরি হারা, গুদু হারা, পেইক হারা, পোর হারা, ভোঙোরো হারা, কেইম হারা, আদু হুবোহুবি হারা, ইদেমেলামেলি হারা, নাদেং হারা, ইজিবিজি হারা, পল্লাপল্লি হারা, পাক্কোন হারা, পাশা হারা, পাগলী না ছাগলী হারা, পত্তি হারা, ফাল্লাফাল্লি হারা, বদাবদি হারা, বাঘ হারা, বাজ ঠেলাঠেলি হারা, মালা হারা, মাজ হারা, মুলকুড হারা, গুগুর গু কুগুরো গু হারা, রাজা হারা, কচ্চাকোচ্চি হারা, কবাজাং হারা, করই হারা, শামুক হারা, কুমোর হারা, হাত্তোল পাগানা হারা, চারভাঙা হারা, হুত্তোহুত্তি হারা, বিলেই হারা, ঘিলা হারা, দাং হারা।

www.pathagar.com

গুদু হারা

অনেকটা হা-ডু-ডু খেলার মতো দেখতে এই খেলাটি চাকমা সমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি খেলা। এটিকে অনেকে 'গুরু হারা'ও বলেন। বিভিন্ন সমাজিক উৎসব-পার্বণাদিকে চাকমা যুবসমাজ এই বিশেষ খেলার আয়োজন করে থাকে। আগেকার দিনে এলাকার মহাজনরা নিজের পকেটের অর্থ খরচ করে বছরের কোনো এক অবসর সময়ে এই গুদু হারার আয়োজন করতেন। খেলার নিয়ম-কানুন খুবই সহজ। তাই এই খেলায় হারজিত নির্ণয়ের জন্য রেফারির তেমন কোনো বেগ পেতে হয় না। তবুও বিরোধপূর্ণ দুই গ্রুপের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতাটি হয়, তখন উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। তাই তা সামাল দেওয়ার জন্য বেশির ভাগ সময়ে রেফারি হিসেবে সমাজের সকলের মান্য একজনকে বেছে নেওয়া হয়। রেফারি অনেক সময় গণতান্ত্রিকভাবে রায় দেওয়ার স্বার্থে খেলার মাঠে উপস্থিতিদের মধ্য হতে এক বা দুইজনকে তাঁর সহকারি হিসেবে সাথে রাখেন।

খেলোয়াড়: খেলাটি নারী-পুরুষ উভয়েই খেলতে পারে। তবে শালীনতার স্বার্থে নারী-পুরুষ একসাথে খেলার বিধান নেই।

খেলোয়াড় সংখ্যা: খেলাটি দুই দলে খেলতে হয়। তাই উভয় দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকতে হয়। এক একটি দলে সাধারণত ৭ থেকে ১০ জন খেলোয়াড় অংশ নেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। তবে প্রীতি ম্যাচগুলোতে খেলোয়াড় সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না।

খেলার নিয়ম: গুদু খেলার মাঠকে মাঝ বরাবর দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। মাঠের মাঝ বরাবর একটি সরল রেখা এঁকে দেওয়া হয়, যেটা দুই দলের সীমারেখা। সীমারেখার দুই প্রান্তে দুই খেলোয়াড়রা অবস্থান করেন। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অথবা পাতা বা পয়সা দিয়ে টস করে কোন দল আগে খেলবে, তা নির্ধারণ করা হয়। যে দল প্রথম শুরু করে, সে দলের একজন প্রথমে উত্তেজনাকর নানা ছড়া আওড়িয়ে প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষাব্যূহের মধ্যে ঢুকে তাদের এক বা ততোধিক সদস্যকে ছুঁয়ে দিয়ে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। ছুঁয়ে এসে যদি সেই খেলোয়াড় মাঠের মাঝখানে চিহ্নিত সীমারেখা অতিক্রম করে তাদের দলের সীমানায় প্রবেশ করতে পারে, তাহলে সে যেসব সদস্যকে ছুঁয়ে দিয়ে এসেছে তারা সকলে মারা যায় এবং তাদেরকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের চেষ্টা থাকে তাদেরকে স্পর্শ করতে আসা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ধরে রাখার, যাতে সে মাঠের মাঝখানের চিহ্নিত সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে। খেলোয়াড়টি যদি কোনমতেই মাঠের মাঝখানের চিহ্নিত সীমারেখা স্পর্শ করতে না পারে, তাহলে সে মারা যায় এবং তাকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধমে প্রতিপক্ষের কোন সদস্যকে মারতে পারলে নিজ দলের একজন করে খেলোয়াড় প্রাণ ফিরে পেতে থাকে। এভাবে যতক্ষণ না প্রতিপক্ষের সব খেলোয়াড় মারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত খেলাটি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

www.pathagar.com

গুদু হারায় ব্যবহৃত ছন্দঃ গুদু হারায় সাধারণত 'গুদু গুদু গুদু গুদু' করে খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। এক দমের মধ্যে প্রতিপক্ষকে ছুঁয়ে দিয়ে দ্রুত নিজ দলের প্রতিরক্ষা-সীমায় ফিরে আসতে হয়। 'গুদু গুদু গুদু' বলতে বলতে যদি খেলোয়াড়টির দমে হঠাৎ ছেদ পড়ে আর সেই সময় অথবা তারপর সীমরেখায় পৌঁছার আগে যদি প্রতিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে ফেলে, তাহলেও সে মারা যায়। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা মজার একটি কায়দা ব্যবহার করে। চাকমা ভাষায় আক্রমণাত্মক বিভিন্ন ছড়া বলতে বলতে খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষের দিকে তেড়ে যায়। এতে সে মানসিক শক্তি পায় এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারে। চাকমা লোকসমাজে গুদু খেলার সময় ব্যবহৃত এরূপ কিছু বহুল প্রচলিত ছড়া নিচে উপস্থাপন করা হলো। ছড়াটি চাকমা ভাষায় যেভাবে অর্থবহ, সাহস উদ্রেককারী ও উত্তেজনাকর, বাংলায় অনুবাদ করার পর তেমনটি অক্ষুণ্ন নাও থাকতে পারে। তবুও আগ্রহীমহলের জানবার সুবিধার্থে অনুবাদসহ দেওয়া হলো।

১

তাগল মাধা সিম সিম	দায়ের মাথাটা ছুঁচালো
হুত্তোর বাচ্চা শুগুরো বাচ্চা ধরি চ.. ..	কুত্তার বাচ্চা শুয়োরের বাচ্চা ধরে দেখ
ছাড়ি নিম ছাড়ি নিম	ছাড়িয়ে নেবোই নেবো

২

৯ আড়ি চোলত ৬ আড়ি ধান	৯ আড়ি চালে ৬ আড়ি ধান
দেগে চ বলির কাম	দেখাও দেখি বলি কাম
বলির কাম বলির কাম	বলির কাম বলির কাম

৩

ইচ্চি বদা কিল্যি ছঅ	আজকের ডিম কালকের ছা
কন্না ধরিবো ধরি চঅ	কে ধরবি ধরে দেখা
ধরি চঅ ধরি চঅ	ধরে দেখা ধরে দেখা

৪

ভুদোর রাজা রঙে ভুদ	ভূতের রাজা রূপেও ভূত
ধরি চঅ বাবর পুত	ধরে দেখো কে বাপের পুত
বাবর পুত বাবর পুত	বাপের পুত বাপের পুত

৫

আজার ধানঅ তুজ্ নেই	হাজার ধানে তুছ নেই
মরে ধরিবার বলি নেই	আমায় ধরার বলি নেই
বলি নেই বলি নেই	বলি নেই বলি নেই

www.pathagar.com

৬
গুজ্ দি লামঙর মুজোঙত্
কন্না ধরিবো ধরি চঅ
ধরি চঅ ধরি চঅ

কুঁচা দিয়ে নামলাম সামনে
ধরে দেখো কে ধরবে
কে ধরবে কে ধরবে

৭
গুদু গুদু বোলেলুঙ
মারেজ হাদা ফুদেলুঙ
ফুদেলুঙ ফুদেলুঙ ফুদেলুঙ

গুদু গুদু ডাকলাম
পায়ে কাঁটা ফুটালাম
ফুটালাম ফুটালাম ফুটালাম

৮
সুমো ভিদিরে মোজো দোই
ম হুগুরুন গেলাক হোই
গেলাক হোই গেলা হোই?

চুঙার ভিতর মোষের দই
আমার কুকুরগুলো গেল কই
গেল কই গেল কই?

৯
গাদঅ ভিদিরে হাঙারা
সেদাম থেলে ধরি চা আঙারা
আঙারা আঙারা আঙারা

গর্তের ভিতর কাঁকড়া
পুরুষত্ব থাকলে ধরে দেখা
ধরে দেখা ধরে দেখা

১০
ঘর তুলিলুঙ উগুদো বের
ন পেবা উজু ধরিবার ছেড়
ধরিবার ছেড় ধরিবার ছেড়

ঘর তুললাম উল্টো বেড়ায়
আমায় ধরবার মুরোদ কোথায়
মুরোদ কোথায় মুরোদ কোথায়

১১
গামারি গাজঅ তক্তা
ম হুগুরবো পক্তা
পক্তা পক্তা পক্তা

গামারি গাছের তক্তা
আমার কুকুরটা কি মোটা
কি মোটা কি মোটা

১২
গরম পানিয়ান জুরে গেল
মরে দরে কুদু দেই গেল
দেই গেল দেই গেল দেই গেল

গরম পানিটি ঠান্ডা হলো
আমার ভয়ে সব পালিয়ে গেলো
পালিয়ে গেলো পালিয়ে গেলো

১৩
গাঝঅ মাদাত তিবিরিং গুই
ম হুগুরোন গেলাক কই
গেলাক কই গেলাক কই

গাছের মাথায় একলা গুই
আমার কুকুরগুলো গেলো কই
গেলো কই গেলো কই

১৪
সুগুরি দাদিত্ কুমুরো
মুই এজঙর দুমুরো
দুমুরো দুমুরো দুমুরো

মিষ্টি কুমড়ার লতায় চাল কুমড়া
আসছি আমি পারলে পালা
পালা পালা পালা

www.pathagar.com

সুকৈ বা ঘিলে খেলার কিছু মুদ্রা

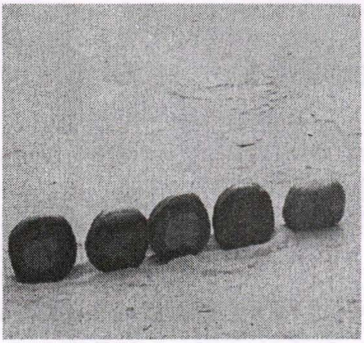

ঘিলা বীজ- এটি লতায় ধরে এমন এক জংলি ফল

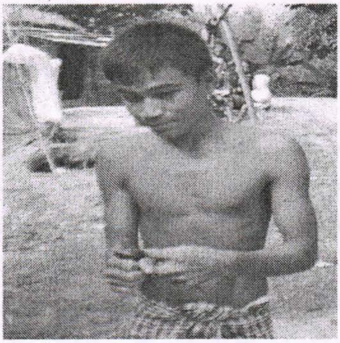

মুঠো হাতের উপর রেখে ঘিলা নিক্ষেপ

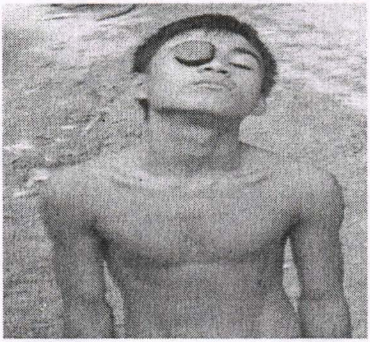

চোখে রেখে ঘিলা নিক্ষেপ

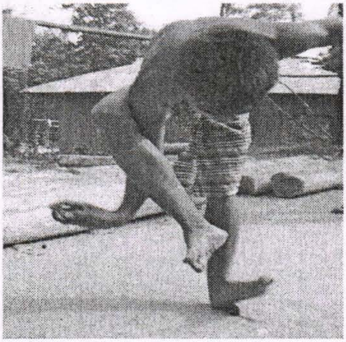

পায়ের নিচে দিয়ে ঘিলাটি ফেলে দেওয়ার চেষ্টা

সারি করে বসানো সুকৈ বা ঘিলা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা

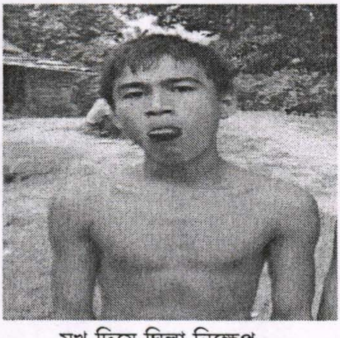

মুখ দিয়ে ঘিলা নিক্ষেপ

তথ্যনির্দেশ

১. ছ মোহন ত্রিপুরা (বয়স ৮৬), জোরমরম, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

পাহাড় সংস্কৃতির মানুষ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই সাজানো। অধিকাংশ ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠির প্রধান পেশাই হচ্ছে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা যেমন জুম চাষ। আর বৈচিত্র্যপূর্ণ এ জুম চাষের জন্য ভিন্ন সংস্কৃতির জন্য বিভিন্ন পেশাজীবির সৃষ্টি যেমন- অচাই, বৈদ্য ইত্যাদি।

অতীতে প্রাকৃতিক সম্পদ এখানকার মানুষ নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবহার করত। কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির যাঁতাকলে পতিত হয়ে বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বাঁশ-গাছ, শাকসব্জি ও ছড়া নদী থেকে মাছ শিকার করে বিক্রির চল শুরু হয়েছে।

ক. অচাই (পুরোহিত)

ত্রিপুরা সমাজে অচাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বিভিন্ন সামাজিক পার্বণে অচাই এর গুরুত্ব রয়েছে। কয়েকটি গ্রামের মধ্যে কম পক্ষে একজন করে অচাই দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের বিভিন্ন লোকপূজার জন্য একজন অচাই অপরিহার্য।

একজন অচাই বা পুরোহিত, যিনি নানা পূজা সম্পন্ন করে থাকেন

www.pathagar.com

খ. বৈদ্য

বৈদ্য মারমা সমাজে ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী শ্রেণি। এরা গ্রামে ছোটখাত অসুখ বিসুখ ছাড়ায়। পার্বত্য অঞ্চলে অধুনিক চিকিৎসা আর্বিভাবের পূর্বে চিকিৎসার এক মাত্র অবলম্বন ছিল এ শ্রেণি। বর্তমানেও আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি বৈদালি চিকিৎসার ভাল চল আছে। বৈদালি বিদ্যার আলাদা পুস্তক আছে। যা মারমা হরফে সংরক্ষিত। এ পুস্তক বৈদ্যরা খুব গোপনে সংরক্ষণ করে থাকে। সাধারণত বংশানুক্রমে এ পুস্তক হস্ত ান্তর হয়।আবার ক্ষেত্র বিশেষে গুরু বিশ্বস্ততা অর্জনে শিষ্য এর উত্তরাধিকারী হয়। বৈদালি কাজে সম্মানি গৃহস্থের আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত। অনেক ক্ষেত্রে গৃহস্থ খুশি মনে যা দেন তা গ্রহণ করে ।

বৈদ্যের প্রকারভেদঃ বৈদ্য-পেশায় সেবার ধরন অনুসারে এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১। গু-য়েং বৈদ্যঃ মারমা সমাজে এ শ্রেণির পরিচিতি গু-য়েং ছেড়া নামে। গু-য়েং-অর্থ বিশেষ এক ধরনের নিয়ম-নীতি আর ছেড়া অর্থ-গুরু বা ওস্তাদ। এ শ্রেণির বৈদ্যরা কোন ব্যক্তিকে অবশ্য পালনীয় বিশেষ নিয়ম-নীতির আলোকে গায়ে ওলকি এঁকে শিষ্য সংগ্রহ করে থাকেন। গুটি কয়েক শিষ্যদের কেবল মাত্র আংশিক বৈদালি বিদ্য অর্জনের সুযোগ হয়। অবশ্য পালনীয় বিশেষ নিয়ম-নীতি যেমন-বৌদ্ধ ধর্মের গৃহীদের পালনীয় পাঁচটি শীল (মিথ্যা কথা না বলা, মদ্য পান না করা, প্রাণি হত্যা না করা,ব্যাভিচার না করা, কাম সংযত রাখা)গরু মাংস না খাওয়া, চলা-ফেরার সংযত রাখা, ইত্যাদি। এ সব নিয়ম-নীতি পালনের মধ্য দিয়ে গু -য়েং বৈদ্য নিজেকে পবিত্র করে এবং বৈদালি কাজের পূর্বে নিজেকে সর্ম্পূণরূপে ভগবান বৌদ্ধের কাছে সমর্পণ করে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে রোগ নিরাময়, অপদেবতার/ অশুভ আত্মার প্রভাব মুক্ত করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বনাজি ঔষধ দিয়ে থাকে। মূলত এ শ্রেণি বৈদ্য বৌদ্ধ ধর্মে আর্দশকে মূল আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করে।

২। ঔষধি বৈদ্যঃ ঔষধি বৈদ্য কোন রোগ নির্ণয় করে সে অনুসারে বনজ গাছ গাছালির মূল, পাতা, ফল ফুলের মাধ্যমে পথ্য তৈরি করে চিকিৎসা করে থাকে। তবে রোগ বিশেষে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে ঔষধ সরবরাহ করে। বাঙালি সমাজের কবিরাজদের সাথে এর তুলনা করা যায়।

৩। ঝাড়-ফুঁক বৈদ্যঃ এ শ্রেণি বৈদ্য কেবল মাত্র ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে রোগ সারানো, শরীর বন্ধ করে বিপদ মুক্ত করা, অপদেবতার/ অশুভ আত্মার প্রভাব মুক্ত করে এবং তাবিজ প্রদান করে থাকে। এ বৈদ্যগণ প্রকৃতি দেবতা (বৃক্ষ দেবতা, নদী-পুকুর দেবতা, সূর্য দেবতা, বৃষ্টি দেবতা, হওয়া দেবতা) ইত্যাদির তুষ্টির উদ্দেশ্যে রোগের ধরন অনুসারে পশু,পাখি,হাঁস মুরগী বলি দিয়ে থাকে।

গ. গ্রাম্য নাপিত

সাধারণ সংজ্ঞায় হয়তো তাদেরকে নাপিত বলা ঠিক নাও হতে পারে। তাদের নেই কোন স্থায়ী পেশাগত অবস্থান, নেই নির্দিষ্ট দোকানপাত, নেই বসার নির্ধারিত স্থান। গ্রামের পাহাড়ি সমাজে খণ্ডকালীন পেশা হিসেবে চুল কাটা পেশাকে অনেকে গ্রহণ করেছে। পূর্বে বাজারমুখী হয়ে থাকতো চুল কাটার জন্য এখন প্রায় গ্রামে গ্রামে দু-একজনের দেখা মেলে যে তারা চুল কাটতে জানে।

www.pathagar.com

তবে এখানকার আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা যেহেতু পেশাদার হিসেবে চুল কাটা কাজকে বেছে নেয় নি। তাই তাদের নির্দিষ্ট কোন দোকান থাকে না। সাধারণত জুমের কাজের শেষে বিকেলে গ্রামের বড় কোন গাছের ছায়ায় চেয়ার বা টুল ব্যবহার করে চুল কাটা হয়। এখানে কাস্টমার হিসেবে বয়োবৃদ্ধ ও শিশুরা বেশি থাকে। উঠতি বয়সের যুব-কিশোর ব্যক্তিরা সাধারণত বাজারে গিয়ে চুল কেটে নেয়। তবে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা বাজারে গিয়ে চুল কাটার চেয়ে গ্রামে বিকেল বেলায় চুল কাটাতে বেশি সাশ্রয়ী মনে করেন। গ্রামে এ পেশার লোকেরা যে কোন দিন বিকেল বেলায় চুল কাটার কাজ করে থাকেন। তাদের সাথে যোগাযোগ করে চুল কাটতে হয়। আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা যেহেতু পেশাদার হিসেবে চুল কাটা কাজকে বেছে নেয় নি। তাই তাদের নিদিষ্ট্য কোনো দোকান থাকে না। সাধারণত জুমের কাজের শেষে বিকেলে গ্রামের বড় কোনো গাছের ছায়ায় চেয়ার বা টুল ব্যবহার করে চুল কাটা হয়। এখানে কাস্টমার হিসেবে বয়োবৃদ্ধ ও শিশুরা বেশি থাকে। উঠতি বয়সের যুব-কিশোর ব্যক্তিরা সাধারণত বাজারে গিয়ে চুল কেটে নেয়। তবে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা বাজারে গিয়ে চুল কাটার চেয়ে গ্রামে বিকেল বেলায় চুল কাটাতে বেশি সাশ্রয়ী মনে করেন। গ্রামে এ পেশার লোকেরা যে কোনদিন বিকেল বেলায় চুল কাটার কাজ করে থাকেন। তাদের সাথে যোগাযোগ করে চুল কাটতে হয়। নোয়াপাড়া, ভাইবোনছড়া মুখ, মুনিগ্রাম এলাকা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ছোট মনি চাকমা চুল কাটার কাজ করছেন।

ঘ. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

কালের বিবর্তনে ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে এখন প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছে। যেমন গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট দোকান গড়ে উঠেছে। এবং পেশা হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসা একটি সফল উদ্যোগ। নোয়াপাড়া, ভাইবোনছড়া মুখ, মুনিগ্রাম এলাকা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সুকমল চাকমা এমনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর দোকানে গ্রামের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মালামাল রাখেন। যেহেতু গ্রাম পর্যায়ে বিদুৎ চলে এসেছে তিনি এজন্য ডিস টিভি স্থাপন করেছেন। এতে তাঁর ব্যবসার প্রসার হয়েছে। এসব মুদি দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, মসল্লা সামগ্রী, বিস্কুট, চা, ঠান্ডা পানীয়, নারকেল তেল, বলপেন, শ্যাম্পু, সাবান, চকলেট, বিড়ি-সিগারেট, পান-সুপারি, লবণ, মরিচ, খাবার স্যালাইন, খাতা ইত্যাদিসহ এমন জিনিষ পত্রাদি রাখা হয়, যা কেনার

www.pathagar.com

জন্য গ্রামবাসীকে সাধারণত দূরের বাজারে যেতে হয়। অনেকে এই ব্যবসার সাথে সম্পূরক হিসেবে নিজের মোবাইল সেট ব্যবহার করে টাকা রিচার্জের ব্যবস্থাও করে।

ঙ. মৌসুমী ব্যবসায়ী

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন জঙ্গলে নানা জাতের মৌসুমী শাক সবজি পাওয়া যায়। পূর্বে এসব শাকসবজি বেচা-বিক্রি হতো না বললেই চলে। কেবল পারিবারিক প্রয়োজনে পাহাড়ি গ্রামবসীরা এসব বনজ সম্পদ আহরণ করতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে এই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি বেসরকারি চাকরি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা পেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব শাকসবজি সরাসরি সংগ্রহ করতে না পারায় এখন নির্ভর করতে হচ্ছে অন্যের উপর। তাই সমাজের খুব ছোট্ট একটি অংশ বিশেষ করে নারীরা অনেকেই এখন এসব বনজ শাক সবজি আহরণ করে হাট বাজারে বিক্রি করছেন। তাদের মধ্য হতে আবার অনেকে নিজে সরাসরি বন জঙ্গল থেকে এসব শাক সবজি সংগ্রহ না করে অন্যদের কাছ থেকে অথবা এক বাজার বা হাট থেকে কিনে অন্য হাটবাজারে বিক্রি করেন। অন্যদিকে খেতে ফলানো বিভিন্ন শাক সবজিও এসব নারীর বিকিকিনি করেন। পাহাড়ি নারীদের বিকিকিনির এই মৌসুমী ব্যবসার পসরায় যেসব শাক সবজি বিক্রি হয় তার মধ্যে রয়েছে- ঢেঁকি শাক, বনজ নানা জাতের আলু ও কচু, এসব আলু-কচুর থোর, লতা ও পাতা, তারা, বাঁশ কোড়ল, কলার থোর, কলার মোচা, গাছের মাশরুম, মাটির মাশরুম, বনজ মসল্লা পাতা, থানকুনি ইত্যাদি বনজ শাক সবজি এবং খেতে ফলানো মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি কুমড়ার শাক ও ডাঁটা, চাল কুমড়া, শসা, শসার শাক ও ডাঁটা, লাউ ও লাউয়ের শাক ও ডাঁটা, করলা ও করলা শাক, বেগুন, জুমের বেগুন, মারফা, বিনি চাউল, কাউন, কাকরল, কচু, আলু, পুঁই শাক, পুঁইয়ের বিচি, টক পাতা, জুমের নানা জাতের মসল্লার পাতা ও বিচি, কাঁচা মরিচ, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

চ. জুমচাষী বা জুমিয়া

পার্বত্য জনপদের প্রধান জীবিকার উৎস জুম। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধিকাংশ জনগণ এখনও এককভাবে জুমকৃষির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। জুমচাষীদের দৈনন্দিন জীবন শুরু হয় মোরগ-ডাকা ভোর থেকে। খুব ভোরে দল বেঁধে গ্রামের যুবক-যুবতিরা জুমের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাই এই জুমকে ঘিরে পার্বত্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে নানা গান, ছড়া ও কিংবদন্তি। ত্রিপুরাদের 'হুগঅ থাংনি ফাইদি নক/ ববইরক/ হুগঅ থাংনি ফাইদি নক' অথবা 'তুই তুই সৈচা মেরাংসা/ হুগঅ থাংনি ফাই/ আতারকনো রিংঐ তবইদি/ আবৈরকনো রিংঐ তবইদি/ য়াগল খিলনি ফাই' এবং চাকমাদের ' যেই যেই যেই যেই যেই জুমত যেবং/ জুমত যেইনেই গচ্ছ্যা সুদা তুলিবং/ গচ্ছ্যা সুদা বেজিনি টেংগা কামেবং' জাতীয় গান মুখে মুখেই রচিত হয়েছে পহাড়ি সমাজে।

জুমচাষের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ দেখা যায়। তবে জঙ্গল কাটার সময় পুরুষরা বেশি শ্রম দিয়ে থাকে এবং অন্যান্য সময়গুলোতে উভয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। এই চাষব্যবস্থার শুরু হয় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে কড়া রোদ পড়ার সাথে সাথে। এই সময়ে জঙ্গল কেটে শুকানো হয়। চৈত্রের শেষে শুকনো জঙ্গল আগুনে পুড়ানো হয়। বৈশাখ মাসে পুড়ে যাওয়া জঙ্গল সাফ করে ফসল রোপনের কাজ শুরু হয়। আষাঢ়-শ্রাবন মাস পর্যন্ত ঘনঘন আগাছা পরিষ্কার ও জুম ফসলের পরিচর্যা চলে। ভাদ্র মাস জুমচাষীদের ব্যস্ততম মাস। তাই জুমিয়া পাহাড়ি সমাজে 'আমার ভাদ্র মাস চলছে' বলতে 'দম ফেলার সময় না পাওয়া ব্যস্ততা' বোঝায়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে শুকর, চুলাই মদ ইত্যাদি দিয়ে শস্যদেবীর পূজো করে ফসল কাটা শুরু হয়। শস্য আহরণ পর্ব কার্তিক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এই চাষব্যবস্থাকে বিষয় সংশ্লিষ্ট লেখক ও গবেষকরা বাংলায় 'ঝুম', 'স্থানান্তরিক কৃষি', 'স্থানান্তরী বা ৰেত্রান্তরী কৃষি', 'পালাক্রম চাষ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। জুম চাষ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরা বলেছেন, "বর্তমান বিশ্বে কৃষির যে রূপগুলো বেশীরভাগ মানুষের পরিচিত, সেগুলোর অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কর্ষণ ও সেচ ব্যবস্থা। তবে এই দুইটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াই অন্য এক শ্রেণীর কৃষি ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলসমূহে লৰ্য করা যায়, যেগুলো ইংরেজীতে Shiftng cultivation, slash and burn, extensive agriculture, horticulture, swidden agriculture, bush-fallow agriculture, forest farming প্রভৃতি নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই এই নামগুলো প্রায় সমার্থক বা পরস্পরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে উল্লিখিত বিভিন্ন নামে পরিচিত কৃষিব্যবস্থাগুলো কোনো সমরূপ প্রপঞ্চ নয়। প্রত্যয়গত সমস্যা ও নেতিবাচক ব্যঞ্জনার কারণে slash and burn কথাটি নৃবিজ্ঞানসহ সংশ্লিষ্ট একাধিক জ্ঞানকাণ্ডে বর্তমানে সাধারণভাবে পরিহার করা হয় একটি সাধারণ শ্রেণিবাচক পদ হিসাবে Shifting cultivation কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, তবে অনেকের বিবেচনায় এটিও সমস্যাজনক। এই প্রেক্ষিতে একটি টেকনিক্যাল টার্ম হিসাবে swidden agriculture কথাটি চালু রয়েছে। বাংলায়

www.pathagar.com

সর্বজনগ্রাহ্য অনুরূপ কোন পদ চালু নেই, তবে 'পালাক্রম চাষ' কথাটি কেউ কেউ এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন।"

অতীতে জুম চাষ থেকে একটি জুমিয়া পরিবারের বছরের চাহিদা মিটে যেতো। জুমে নানা জাতের ধান, নানা জাতের বিনি ধান, কাউন, তিল, তুলা, নানা জাতের শাক সবজি যেমন- মারফা (শসা জাতীয়), হলুদ, আদা, মসল্লা জাতীয় পাতা, আখ, মরিচ, কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, কাকরল, করলা, নানা জাতের কচু ও আলু, পুঁই শাক ইত্যাদি ফলন হয়।

জুমকে ঘিরে জুমিয়া সমাজে রয়েছে নানা লোকবিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ। জুম শুরুর প্রাক্কালে গ্রামের সকলে মিলে সামাজিক সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় কে কোন পাহাড়ে জুম করবে। পরস্পরের মতামতের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হয়। পাড়ার মুরব্বি ও পাড়া প্রধান 'কার্বারি' এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বে থাকেন। সিদ্ধান্তের সাথে সাথে চিহ্নিত জুমখেতের কাছাকাছি কোন একটা বড়ো গাছের পাশে কয়েকটি কচি গাছ ও মাটির ঢেলা দিয়ে প্রত্যেকে যার যার জুমখেতের মালিকানা ঘোষণা করে থাকে। একজনের ঘোষিত জুমখেতে অন্য কোন গ্রামবাসী জুমচাষ করে না। জুমের কাজ শুরু হয়ে গেলে গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে নজর রাখে পাড়ার অতি দুর্বল কোনো পরিবার বিশেষ করে নারীপ্রধান বা বয়স্ক কোনো পরিবার জুমচাষের মৌসুম ঠিকভাবে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে কি না। কেউ যদি মৌসুমের মধ্যেই ফসল রোপন করতে না পারে, তাহলে সারা বছরই সেই পরিবারকে না খেয়ে বা অভাবে থাকতে হবে। তাই গ্রামবাসীরা তাদের কাজের ফাঁকে সেরূপ দুর্বল পরিবারগুলোকে সবাই মিলে সহযোগিতা করে এগিয়ে নেয়। এই প্রকিয়াটি চাকমা সমাজে এই 'মালেইয়া' এবং ত্রিপুরা সমাজে 'চুবালাইনাই বা চুবাচু' নামে পরিচিত। অনেক সময় জুমের মাঝখানে বা জুমের এক কোণে দোষযুক্ত জুম ঘোষণা দিয়ে গাছ-বাঁশ ও ঝোপঝাড় সংরক্ষণ করা হয়। এই জুমদোষ প্রকারান্তরে পরিবেশ রৰায় সহায়তা করে। জুম চাষের ক্ষেত্রে বড়ো গাছপালা কাটা হয় না। তাই পাখিরা সহজে এতে বসতে পারে। ফলে অতীতে জুমচাষে কোনরূপ বালাইনাশক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

লোক কারুশিল্পী প্রবীর ভূষণ দেওয়ানের সাক্ষাৎকার:

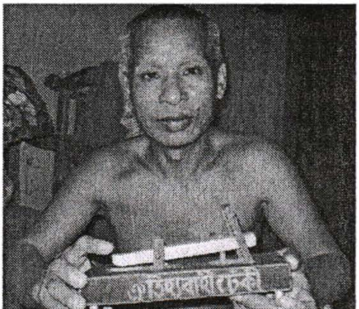

www.pathagar.com

প্রবীর ভূষণ দেওয়ানের বয়স ৫৫ বছর। চাকুরি করেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা মাঠ পরিদর্শক হিসেবে। হাতে যতটুকু সময় পান সে সময়টুকু তিনি কারুকার্য বানিয়ে ব্যয় করেন। আধুনিক কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই তিনি নিজ হাতে কেবল করাত, হাতুড়ি আর বাটালি দিয়েই কারুকার্য তৈরি করেন রকমারি জিনিস। মৃত ব্রজমোহন দেওয়ান ও জোৎস্না বালা দেওয়ানের ছেলে প্রবীর দেওয়ান। দিঘীনালা উপজেলার বোয়লখালী ইউনিয়নের কামাকুছড়া গ্রামে তাঁর বাড়ী। তাঁর সংসারে রয়েছে স্ত্রী ও দুই ছেলে। কারুকার্য বিষয়ে তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি সম্পূর্ণ ধারণা ও কল্পনায় এসব শিল্পকর্ম চালিয়ে যান প্রবীর দেওয়ান। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তথ্য সংগ্রাহক পপেন ত্রিপুরা।

সংগ্রাহক: আপনি কী কী জিনিস বানান?

প্রবীর ভূষণ দেওয়ান: আমি সাধারণত ঘর সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই বানাই। তার মধ্যে রয়েছে- নানা সাইজের ফুলদানি, ফ্রেম, ঢেঁকি, কলমদানি, চড়কা, চড়কি, গীটার, দোতারা, একতারা, নৌকা, ইত্যাদি।

সংগ্রাহক: আপনি কি যে কোন জিনিস অর্ডার দিলে সে অনুযায়ী বানাতে পারেন?

প্রবীর ভূষণ দেওয়ান: হ্যাঁ। আমি আমার সাধ্যমতো সবকিছুই বানাতে চেষ্টা করি। আমি যে কোনো মানচিত্র কাঠের উপর খোদাই করে দিতে পারি। কাঠের উপর অক্ষর খোদাই করে ছোট বড়ো যে কোন সাইজের সাইনবোর্ডও বানাতে পারি।

সংগ্রাহক: আপনি কার কাছ থেকে এই বিশেষ সৃজনশীল কাজটি শিখেছেন?

প্রবীর ভূষণ দেওয়ান: না। এই কারুকার্য বানানোর কাজে আমার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। ছোটকাল থেকেই বিভিন্ন কারুকার্য দেখে দেখে আমি বানাতে শিখেছি। সম্পূর্ণ নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমি এই কাজটি করি।

সংগ্রাহক: আপনার এই সৃজনশীল কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর জন্য আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

প্রবীর ভূষণ দেওয়ান: হ্যাঁ। আমি স্বপ্ন দেখি আমার পরবর্তী প্রজন্মের লোকজন এই কাজটি শিখবে। কারুকার্য শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা আমার আছে। কিন্তু সাধ্য না থাকায় আমি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারছি না।

তথ্যনির্দেশ

১. মং ছু রী মারমা (বয়স ৬১), গ্রাম: দারোগা পাড়া, উপজেলা: রামগড়, জেলা: খাগড়াছড়ি।

২. কহফা বৈদ্য (বয়স ৮১), সিন্দুকছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি

৩. ভাগ্যফিতা আচাই (বয়স ৭৪), দলিয়া, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

আদিকালে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠি বনজ গাছগাছড়ার ঔষধিগুণ ও লোক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাদের চিকিৎসা করত। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার সাথে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে। তথাপি এখনও অনেকে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি নানান লোকচিকিৎসার মাধমেও অসুখ বিসুখ ছাড়াতে চেষ্টা করে। বর্তমানে যেসব লোক চিকিৎসা প্রচলিত তার ধারণা নিম্নে দেওয়া হল-

১. বনজ ঔষধ: বনজ ঔষধি
২. দেবতা পূজা
৩. তাবিজ
৪. মন্ত্র
৫. বিবিধ

১. বনজ ঔষধি ব্যবহার: প্রায় সব ধরনের রোগের জন্য বনজ ঔষধের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন হাড় ভাঙ্গা, জণ্ডিস, কাটা গেলে, পোড়া গেলে, আমাশায়, জ্বর, কাশি, পেটে পাথর, মহিলাদের সন্তান না হওয়া, যে কোন ধরনের এলার্জি ফোঁড়া, দাঁতের সমস্যা, অনিদ্রা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি।

২. দেবতা পূজা: বিশেষ করে নিয়মিত জ্বর হলে দেবতা পূজা দেওয়া হয়। অনেক সময় ঔষধ সেবনের পরেও যখন জ্বর ভাল হবে না সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা দিয়ে রোগের উপশম হবার চেষ্টা করা হয়। আবার জুমের মৌসুমে কোন জ্বর হলে জুমে বিভিন্ন ধরনের পূজা দেওয়া হয়। যেমন-

কোন স্থানে গোসল করার পর নিয়মিত অল্প অল্প জ্বর আসলে গোসল করার স্থানে একটি মোরগ/ মুরগী কেটে পূজা দেওয়া হয়।

গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলে এবং এর জন্য জ্বর হলে ঐ জাগায়ও একটি মোরগ/ মুরগী কেটে পূজা দেওয়া হয়।

কোন স্থানে গিয়ে যদি ভয় পায় এবং এতে জ্বর হয় তবে ঐ জায়গায় মুরগী (কাল) কেটে পূজা দেওয়া হয়।

নিয়মিত মাথা ঘোরা থাকলে বায়ু পূজা দিতে হয়।

ক্ষুধা মন্দা ও স্বাস্থ্যহানি জনিত রোগে পূজা দেওয়া হয়।

কোন শিশু জন্ম নিলে যদি তার নিয়মিত জ্বর থাকে এবং ভাল না হয় তাহলে "আয়ু কাথতরনি" পূজা দিতে হয়।

কখনো কখনো ছেলে মেয়ের অসুখ বিসুখ লেগে থাকলে মানত করা হয় ও পরে মানত অনুসারে পূজা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মেয়েদের বিয়ের পর সন্তান না হলে বা সন্তান না বাঁচলে পূজা দিতে হয়।

৩. তাবিজ: তাবিজ ব্যবহার করে অনেক রোগের চিকিৎসা করা হয়। মাথা ঘুরা, জ্বর না থামা, ভুতের আসর হলে, মন্ত্রের মাধ্যমে কেউ বান করলে তাবিজ দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাবিজে গাছ/ গাছড়ার শিকড় কিছু মন্ত্র লিখে দিতে হয় এবং এরপর মন্ত্র দিয়ে শুদ্ধ করতে হয়।

গা বন্ধ করার জন্য তাবিজ দেওয়া হয়। কোন অপদেবতা বা কারো কু-দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্য গা-বন্ধ তাবিজ ব্যবহার করা হয়।

তাবিজের কিছু নমুনা দেওয়া হল-

১। আসর চিকিৎসার তাবিজের নমুনা

২। গাবন্ধ দেওয়ার তাবিজের নমুনা

৩। জ্বর সারানোর জন্য তাবিজের নমুনা

৪. মন্ত্র: বনজ ঔষধের মতই মন্ত্র দিয়ে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়। কাউকে ক্ষতি করতেও মন্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। আবার কোন অপদেবতা তাড়ানোর জন্য (বাড়ীতে বা জুমের) মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। কেউ যাদুমন্ত্র দিয়ে কাউকে ক্ষতির জন্য কিছু করলে তার প্রতিকার হিসেবে পাল্টা মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কারো মন বস করার জন্যও মন্ত্র রয়েছে। তেমিন কাউকে বিচ্ছেদ করার জন্যও মন্ত্র

www.pathagar.com

আছে। ফোঁড়া হলে বা কোন পোকামাকড় কামড়ালে বিষ ঝাড়ার মন্ত্র রয়েছে। এ মন্ত্রের মাধ্যমে বিষ নানানো হয়। বিষ নামানোর মন্ত্র-

"ওঁ চয়ং চুগ্রি চুসি .... চাক স্রা চাক। বিশ্বের উৎপত্তি মুখেতে লবণ দিলে বিশ্ব ভস্ম হয়ে যায়।"

একদিন পর পর জ্বর হলে লবণ পুড়ে মন্ত্র পড়ে সেই লবণ যেখানে সাধারণত গোসল করা হয় সেস্থানে ছিটিয়ে দিতে হয়। এ মন্ত্র হচ্ছে-

"ওঁ চেকে পাইং থাইং.......................... পাইং থাইং অমুক .... লঙ্কা যা।"

জন্ডিস রোগ সারানোর মন্ত্র

"ওঁ খুলং .... সূহা।"

পোলিও ঝাড়ার মন্ত্র

"ওঁ রং রং দোং দোং.................. ওঁ সূহা।"

পেটে কেউ শত্রুতা বশত মাংস প্রবেশ করালে এর থেকে ছাড়ানোর মন্ত্র

"ওঁ লুমিচা..... ওঁ চুহা অমুক.......... রক্ষা কর .... মহাদেব জন্তা শ্রী ভুমে পড়ে।"

চর্ম রোগের জন্য কাঁচা হলুদ বেটে দিয়ে যে মন্ত্র ব্যবহার করা হয়

"ওঁ শ্রি শ্রি .... রোং আজকে মঙ্গল বার.......................... বিশ্ব মারং"

"এ কুল ও কুল .... কুল, আকাশের ফ্রাংগি ...... পড়িয়া গেল ...... ওঁ সুয়া।"

জ্বর নামানোর জন্য মন্ত্র

"ওঁ শুন শুর .... ঘরনি .... যখন জনিল
সে জয় দুহায় বর্মা কাঁপে ...... অমুক লাম জ্বর লাম।"

উপরিউক্ত মন্ত্র প্রয়োগ ও অন্যান্য ঔষধ সেবনে রোগী সুস্থ না হলে আর একটি মন্ত্র দিয়ে 'রক্ষ্যা সুতা' গলায় বেঁধে করে দিতে হয়। সুতায় মন্ত্র পড়ে গিট বাঁধতে হয়। প্রতিবার গিট বাঁধার পর ৭ বার মন্ত্র পাঠ করতে হয় এভাবে ৭টি গিট বাঁধতে হয়। রক্ষ্যা সুতা বাঁধার মন্ত্র নিম্ন রূপ

"ওঁ উত্তর পাড়া .... গর্জং দরগারা ..... বান সুতা বান।"

তথ্যনির্দেশ

১. কহফা বৈদ্য (বয়স ৮১), সিন্দুকছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

ধাঁধা

মারমা সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধা (পাইং-আহ্ওয়াক্)

১. ম্ফ্রেই বইং প্রেরে নাএ র্গেং, ম্ফোয়াই পইং ফ্রুরে নাএ প্ছো?
(না ঢেলেও ভরে দেবতার পুকুর, পরিষ্কার না করেও সাদা হয় দেবতার বস্ত্র)।
- ঊংসি (নারিকেল)।

২. চিংব্রি চিঙব্রা প্যাইরো লারে রামা ঙাহ্ক, ফাংগা মো উ থৈই্কা উ রো রামা ঙাহ্ক?
(এদিক-ওদিক তাকিয়ে উড়ে গরুড় পাখি, মুখ দিয়ে ডিম পাড়ে)
- নাহপিউ-বাং (কলাগাছ)

৩. পাইং হিরে পাইং ম্পেং?
(ফুল আছে কিন্তু খোঁপায় দেয় না)
- সাএ (ছন)

৪. সফো তাইকে ছিঃ, সফো মেতাইকে ফিঃ?
(খেতে জানলে ঔষধ, খেতে না জানলে বিষ)
- আরাও (মদ)

৫. ক্রেরো মাব্রাং হ্নইপক্, হ্লাইংরো মোমুইং হ্নইপক?
(দৃশ্যত হয় না দুই নল, স্পর্শে আসে না দুই নল)
- নখং (নাক)

৬. নাইসিসিমা খ্রিথুং আচাহ্ -মিহি?
(দেবীর সাদা সুতা গোলকে সুতা নাই)
- বিঃউ (ডিম)

৭. ফ্রিরো মেপ্রে তউংখং?
(কোন গর্ত ভরাট করেও ভরে না?)
- ওয়েং (পেট)

৮. ম্যাঃচি ত্যারা ঠি থাহ্মা?
(মাথার তালুর উপর একশ চোখ)
- নাইংদ্রাসি (আনারস)

৯. গংখাং এলেলউমা খ্উ য়াখ্যাই?
(অর্ধ আকাশে পাঁচটি বাতি ঝুলছে)
- দব্রুউসি (চালতা)

www.pathagar.com

১০. ঠিমা রুইরং প্রাংমা ক্যচরইক্?
(ভিতরে স্বর্ণালি বাহিরে কংক্রিট)
- প্‌নেংসি (কাঁঠাল)

১১. প্রাংগা রুইরং ঠিমা ক্যচরইক্?
(ভিতরে কংক্রিট বাহিরে স্বর্ণালি)
- গয়াসি (পেয়ারা)

১২. মাংগ্রী প্-ছো রি মচোয়ে
(মহারাজার বস্ত্র জলে ভিজে না)
- পেংব্রি-র্‌ও (কচু পাতা)

ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধাঁ (খুম হুইমানি)

১. রাজানি বিহিক ওয়াইসানি বারা আচাইয়া- থাইলিফাং
রাজার স্ত্রী একবারের বেশি সন্তান ধারণ করেন না- কলাগাছ

২. বফাং বুচু-গ তুয়ারি খরসা- নারকালা
গাছের ডালে একটি পুকুর- নারিকেল

৩. রাজানি লাথা-ন রমমায়া- চিবুক
রাজার লাঠি ধরা যায় না- সাপ

৪. চেরক চালাকনৈ লামা সেকলাইঅ- য়াথৈ কংনৈ
দুই ছেলে পথ কাড়াকাড়ি করে- দুইটি পা

৫. কামাজাক মানদৈ রুতুগৈ মানৈ-ব তবইয়া- লামা
হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েও ফিরিয়ে আনা হয় না- রাস্তা

৬. বমা বুররক্ বাসা তর্ররক্- খুল বুমানি
মা যত পিটায় সন্তান তত ফুলে- তুলা ধুনো দেওয়া

৭. চাগই-ব খুরিসা চায়াগই-ব খুরিসা- সাকুমু
খেলেও এক বাতি না খেলেও এক বাতি- খোলসযুক্ত শামুক তরকারি

৮. বমা তৈকুঅ বাসা হর তংগ- চকমা
মা স্নান করে সন্তান আগুনে পোহায়- মদ চুয়ানোর যন্ত্র, যা নিচের পাত্রে আগুন জ্বালিয়ে উপরের পাত্রে অনবরত পানি ঢালতে হয়

৯. বমা চাররক্ বাসা খিররক্- চর্খি
মা যত খায় সন্তান তত ত্যাগ করে- চড়কিতে তুলো ছাটাই করা, যেখানে সামনের দিকে কাঁচা তুলো দিলে তা পিছন দিয়ে কেবলই তুলোর বীজ নিঃসরণ হয়

১০. রাজানি রিমতৈ কান্‌ররক্ কানৈ পাইয়া- লামা
রাজার ধুতি পরিধান করে শেষ করা যায় না- রাস্তা

www.pathagar.com

১১. চারাই কাইসা আচাইমানি বাসা-গ মকল মামাং- অমতৈ
নবজাতকের সারা শরীরে শুধুই চোখ গজেছে- আনারস

চাকমা সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধা (বা'না)

১. উরি উরি যায় ধরি ন পায়- বুয়ের
উড়ে উড়ে যায় ধরা না যায়- বাতাস
২. সরত্ আগুন বাচ্যে কোলকাদাত্ ডাক পর্য্যে- ধাবা
আগুন লেগেছে কোথায় ডাক পড়েছে অন্য জায়গায়- হুক্কা
৩. লুদি তান্ন্যে মোন্ গুজুরে- খেংগরং
লতায় ধরে টানতে পাহাড় গর্জে ওঠে- খেংগরং নামের রশি দিয়ে বাঁধা একটি চাকমা বাদ্য বিশেষ
৪. মা কানে পোয়া দাঙর অয়- চরকা
মা কান্নাকাটি করে সন্তান বড় হয়ে ওঠে- চড়কা
৫. আন্দার ঘরত্ বান্দুজ্যে নাজে, ন নজেচ্ হলে বেজ নাজে- জিল
অন্ধকার ঘরে বানর নাচে, না নাচতে বললে আরো বেশি নাচে- জিহ্‌বা
৬. দি বেইয়্যে লরালরি- ঠেং
দুই ভাইয়ের প্রতিযোগিতা- দুই পায়ে হাঁটা
৭. গাজর মাদাত্ চিগন সাপ, বদা পারে ঝাক ঝাক- বেতগুল
গাছের মাথায় ছোট্ট সাপ, ডিম পাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে- বেতফল
৮. জেদা লক্কে এক, মলে দুই- ঝিনুক
জ্যান্ত অবস্থায় একটি, মরে গেলে দুইটি- ঝিনুক
৯. তলে ঝাপ উগুরে ঝাপ, মধ্যে ইক্কু রাঙা সাপ- জিল
নিচে ঢাকনা উপরে ঢাকনা, মধ্যে একটি লাল সাপ- জিহ্বা
১০. খায়দে গুলাবোর বদু নেই- বদা
খাবার ফলের বোঁটা নেই- ডিম
১১. কালা পোরোত্ মালা ভাজে- চান
কালো পুকুরে মালা ভাসে- চাঁদ
১২. হিলত বিলত পানি নেই, গাঝর আগাত কুয়া- ডাব বা নারিকেল
পাহাড় বিলে পানি নেই, গাছের আগায় কুয়া- ডাব বা নারিকেল
১৩. আগা কাবিলে গড়া মরে- ছরাত বান দেনা
আগা কাটলে গোড়া মরে- ছড়ায় বাঁধ দেওয়া
১৪. চাল আগে তলা নেই পঁঝা থবার জাগা নেই- ছাদি
চাল আছে তলা নাই বোঝা রাখার জায়গা নাই- ছাতা
১৫. এক হাত গাচ্ছো ফুল ফুদে পাচ্চো- হাত
এক হাত লম্বা গাছ ফুল ফুটে পাঁচটি- হাত
১৬. হলদ্যে ফুল চন্দনর মালা ধরিৎ ন পারে বেতাগী কাঁদা- মৌবা
হলদে ফুল চন্দনের মালা কাঁটার কারণে ধরা যায় না- মৌচাক

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

চাকমা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন (দাগঅ কদা)

১. আমন বুদ্ধি লই তরে, পরর বুদ্ধি লই মরে
নিজ বুদ্ধিতে কার্যসিদ্ধি, পরের বুদ্ধিতে মরণদশা

২. ইক্ক হ্লে কারাহ্ কারি, দিবা হ্লে আরাআরি, তিন্ন হ্লে আঘাআঘি
যে কোনো জিনিস একটি হলে সকলের কাছে সমাদৃত হয়, দুইটি হলে কাকে ছেড়ে কাকে নেবে অবস্থা হয়, কিন্তু অতিরিক্ত যে কোন কিছুই বিরক্তির কারণ হয়

৩. জাদে জাদ তগায়, কাঙারায় গাত তগায়
জাতে স্বজাতি খুঁজে, কাঁকড়ায় গর্ত খুঁজে

৪. বিল ধানে বান্দুজ্যে রাজা
বিলের ধানে বানর রাজা বা পরের ধনে পোদ্দারি

৫. যেত্তমান দোব কালা সেত্তমান ঝর ন আনে
যতবড় কালোমেঘ সে পরিমাণে বৃষ্টি হয় না বা যত গর্জে তত বর্ষে না

৬. হ্ইদ পুনত্ কুগুর বুগানা
হাতির পেছনে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা বা অরণ্যে রোদন

৭. লাদা খোক পাদা খোক ভাত্তুন পারা ন অয়, পরেয়্যা মারে মা দাগিলেও আমন মা পারা ন অয় যতই উপাদেয় খাদ্য হোক ভাতের মতো হয় না, অন্যের মা যতই ভালো হোক নিজের মায়ের মতো হয় না

৮. ভোজ' আঝায় মোগ গেল, মোগ' আঝায় ভোজ গেল
বৌদির আশায় স্ত্রীকে হারালো, স্ত্রীর আশায় বৌদিকে হারালো (লোভী ব্যক্তির কোন আশাই সফল হয় না)

৯. এগানার সেদাম নেই, পরানে মাগে এদো দই
এক আনার সামর্থ্য নেই, খেতে চায় হাতির দই

১০. এত্য এলে তে গাছ তগাতগি
হাতিটা আসলেই উঁচু গাছের সন্ধান শুরু হয় বা চূড়ান্ত সময়ে হুড়োহুড়ি

১১. মুঅ গুণে বেঙ মরে
মুখের দোষেই ব্যাঙ মরে বা বোবার শত্রু নেই

১২. ভাদ মদ্যে গিরিং, মাজ মদ্যে চিরিং
ভাতের মধ্যে গিরিং ধানের ভাতই সেরা, মাছের মধ্যেও চিংড়িই সেরা

www.pathagar.com

১৩. বড় গাঙও চায় পারা, রাঙা খাদিও ধয় পারা
কর্ণফুলিও দেখা, লাল খাদিও ধোয়া বা রথ দেখা, কলাও বেচা

১৪. চিগন বারেংগ লারি চারি
ছোট ঝুড়ি নানা কাজে ব্যবহৃত হয় অথবা বয়সে ছোটজনেরা সকল কাজে লাগে

১৫. দিঙ্গি সরগত গেলেও বারা বানে
ঢেঁকিটা স্বর্গে গেলেও ধান বানে অথবা করিৎকর্মা মানুষ সর্বত্রই কাজ করে

১৬. যে দিনত্ যে কাল, উরিং-এ চুমি গেল্ বাগ' গাল্
কখনও কখনও এমন সময়ও আসে হরিণটা চুমু দেয় বাঘের গালে অথবা অসাধ্য সাধন

১৭. নিজ আন্দাজ পাগলেও বুঝে
নিজের ভাল পাগলেও বুঝতে পারে

১৮. খেই ন জান্নে মরি পায় বোই ন জান্নে লরি পায়
খেতে না জানলে মরতে হয় বসতে না জানলে নড়তে হয়

১৯. যা নাঙে নেই মেজবান্যে ঘরত গেলেও নেই
যার জন্য নাই তার ভাগে নিমন্ত্রণ বাড়িতেও খাবার নাই

২০. গাজ চিনে বাগলে মানুছ চিনে আক্কলে
বাকল দেখে গাছ চেনা যায় এবং আচরণ দেখে মানুষ চেনা যায়

মারমা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন

১. লু খিঃ লাব ওয়ক্ মুইং জেইতে
পরের ধনে পোদ্দারী

২. আউয়িঃগা ম্রাং হ্লায়ং থাং, আপামা রক্ মোত্তয়ে
দূর থেকে দেখলে সুন্দর কাছে এলে ছাই

৩. ঈংসা নোওয়া তেলাং ম্রাক্ ম্যাচা
গরু ঘাটের ঘাস খায় না

৪. চাগাহ্ ম্যায়াগে রাইং, ওয়েলুখং ফ্রিগে মোজোয়াইং
বাচাল লোক নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনে

৫. হ্রিক মেয়া থাউ্ নক্ মেয়া মকং, কো জ্যাঈ থাউ সুউ্ জ্যাঈ মকং
প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা দ্বিতীয় স্ত্রী স্বজাতি অপেক্ষা ভিন্ন জাতি ভালো হয়

৬. হ্রিক্-গা নোওয়া লারা-দো, নক্-কা নোওয়া লইতে
যেমন গুরু তেমন শিষ্য

www.pathagar.com

৭. মুছুঈ থাকাব শোওয়া হ্রেরে
গোঁফের চেয়ে দাঁত লম্বা

৮. কো লাব ম্যাতেং আবাগ্রীমা লুথুউ্ সেং
যত গর্জে তত বর্ষে না

৯. ম্ প্রেরে উখ্যাউ আসেং থউ্তে
খালি কলস বাজে বেশি

১০. ফিয়াক্তে পাইংথিং পিয়াংরে পাইথিং
যে রক্ষক সেই ভক্ষক

১১. দাঃগো ফিয়াতে ওয়াঃনা, লুঃগো ফিয়াতে আঃরাক্ না
দা-এর ধার নষ্ট হয় বাঁশে,সৎ ব্যাক্তি নষ্ট হয় মদে

১২. কেয়াঃগো ক্রুককে কেয়াঃ খুনাংমা ক্যায়রে
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়

১৩. নারে থাউ্ নাইরে সেরে
খাজনা থেকে বাজনা বেশি

১৪. লুঃমা কংসুঃনা পংখিমুই, ক্রাসে আখ্রিমা ছাইংখুই মুই
সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

১৫. আপ্রই সুগো মাঃমুং গে, আপ্রই কো মুং
পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়

১৬. কেয়াঃরে মেমা লাং মারা, লাহ্ওে মেমা সাঃ মারা
অহংকার পতনের মূল

ত্রিপুরা সমজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন (সাজাকমা কক)

১. ককলাই বুখু-গ চাকয়া, য়াপাইলাই সাকাংগ থাংয়া
মুখে কথার শেষ নেই, সামনে যাওয়ার সাহস নেই

২. সিনজরসালাই থৈদুক, আমিংসালাই থুংদুক
ইঁদুরটার মরিমরি অবস্থা, বিড়ালটা খেলছে তাকে নিয়ে

৩. তাল করইখাই নখা মাচাংয়া
চাঁদহীন আকাশের কোন শ্রী নেই

৪. আমাদে চানাই আফাদে চানাই থাইবাই নাতিংতাং
অপর্যাপ্ত হলে কোন জিনিসই সুষম বন্টন সম্ভব নয়

৫. উরিখুংঅ থা বলতৈ হাই
উইয়ের ঢিবিতে কচু চাষের মতো মূর্খতা বা উলু বনে মুক্তো ছড়ানো

www.pathagar.com

৬. উলবাই সাকাংবাই মকল
সামনে পেছনে চোখওয়ালা মানুষ বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ

৭. খা চুংখাই রাজানি বাসানো মাননো
মন দিলে রাজকন্যাকেও পাওয়া যায় বা দৃঢ় সংকল্প থাকলে যে কোন কার্য সিদ্ধি হয়

৮. কক কাবাং সামুং চুকয়া
বেশি কথায় কাজ হয় না

৯. কক খানাথক সানাই বাংগ সামুং নাইথক তাংনাই বাংয়া
ভাল কথা বলার লোকের অভাব নেই কিন্তু ভাল কাজ করার কেউ নেই

১০. কক কাখা-ন সুরুংনা নাংয়া
তিতা কথা শিখতে হয় না বা কটু কথা শিখতে হয় না

১১. চায়া তংদি, লাগাই তালাদি
না খেয়ে থাকো, তবুও ঋণগ্রস্ত হইও না বা ঋণের বোঝার চেয়ে উপোস ভালো

১২. জত্ত ক্মানাই, কুবুই ক্মায়া
সবকিছুই নষ্ট হবে, সত্য কখনও নষ্ট হবে না

১৩. চানাই তকথুচা, বাজাকনায় রজং
খেটে মরে এক ব্যক্তি, ফল ভোগ করে অন্যজনে

১৪. আমা-ন পায়া, পুমা-ন পায়
কাউকে না পারলে সবচেয়ে দুর্বলজনের উপর চড়াও হওয়া

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

মানত

নিজের মনের বাসনা পূরণ, রোগমুক্তি, বিপদ-আপদ হতে উত্তরণ নানা কারণে পার্বত্য লোকসমাজে মানত প্রথার প্রচলন রয়েছে। মানতকে ত্রিপুরারা 'মানাসি', মারমারা 'কুঃউ' এবং চাকমারা 'মানস' বলে থাকে। জাতিসত্তার নিজস্ব সামাজিক বিশ্বাস, রীতি-নীতি, প্রথা ও ধর্মমতে মানত নানা ধরনের হয়ে থাকে। এই তিন জাতিসত্তার মানত পালনের বিষয়াদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

মারমা মানত

'কুঃউ' মারমা শব্দের বাংলা মানত। 'মানত' অনান্য জাতি গোষ্ঠির ন্যায় মারমা সমাজেও নিজস্ব রূপে প্রচলিত। কোন বিপদ থেকে উদ্ধার/ মুক্তি, হারানো জিনিসের সন্ধান লাভ, রোগ মুক্তি, সম্পাদিত কাজের ভালো ফলাফলের আশায়, দুঃস্বপ্নের ফলে সম্ভাব্য বিপদ থেকে উদ্ধার ইত্যাদির বিশ্বাসের আলোকে মারমা সমাজে মানত প্রচলিত। মানতকারী মানত করার সময় ঠিক করে যে সে কি ভাবে নিজেকে মানত মুক্ত করবে। যাকে স্বাক্ষী রেখে/ভিত্তি করে মানত করা হয় তার সন্তুষ্টির জন্য মানত-এর ধরন হলো-

পশু, পাখি, হাঁস, মুরগি, ডিম বলি এবং মন্দিরে শত বা হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন,প্রবজ্জা গ্রহণ, ছোওয়েং (ধর্মীয় গুরুদের খাবার দান), প্রাণি অবমুক্তকরণের রেওয়াজ আছে। মারমা সমাজে প্রচলিত মানত প্রথা বিশ্লেষণ করলে দুই প্রকারের মানত পাওয়া যায়। যথা- ১) বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক ও ২) প্রাচীন দেব-দেবী ভিত্তিক।

১। **বৌদ্ধ ধর্ম ভিত্তিক:** মারমারা বৌদ্ধ ধর্মানুসারী হওয়ায় অধিকাংশ মারমা গৌতম বুদ্ধকে স্বাক্ষী রেখে/ ভিত্তি করে মানত করে। এ রকম মানতে প্রাণি (পশু, পাখি, হাঁস, মুরগি, ডিম) বলি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। বিপদ মুক্তি বা প্রাপ্তির বাসনায় গৌতম বুদ্ধের তুষ্টি ও মানত মুক্তির জন্য যা করা হয়, তা হলো- মানতকারী নিজে বা তার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে মন্দিরে প্রবজ্জা গ্রহণ, মন্দিরে ১০০ বা ১০০০ বাতি প্রজ্জ্বলন, ছোওয়েং (ধর্মীয় গুরুদের খাবার দান) শত বা হাজার পুষ্প দান, প্রাণি অবমুক্তকরণ, উপবাস পালন ইত্যাদি।

বিধি: মানতদানকারীকে মানতদানকালের পূর্বে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হয়, মানতকালে বুদ্ধ প্রার্থণা এবং মানত করা কারণ আপন মনে স্মরণ, কোনভাবে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রাণ বলি দেওয়া যাবে না। মানতের জন্য বিশেষ কোনো সময় বা বার নির্বাচনের বিধি নেই। কোন বিশেষ মন্ত্র পাঠ নেই।

২। **দেবতা ভিত্তিক:** গৌতম বুদ্ধকে স্বাক্ষী রেখে/ ভিত্তি করে মানত করার পাশাপাশি মারমারা বিভিন্ন দেব-দেবী (সূর্য, নদী, ছড়া, শনি, বৃষ্টি, বৃক্ষ ইত্যাদি)কে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে বিপদ মুক্তি বা প্রাপ্তির বাসনায় মানত করে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়াও প্রাচীন প্রথায় দেব-দেবী তুষ্টি ও মানত পূরণের জন্য যা করা হয়, তা হলো- প্রাণ (পশু, পাখি, হাঁস, মুরগি,ডিম) বলি, শনি পূজা ইত্যাদি, যা এখন প্রায় দেখা যায় না বললেও চলে।

বিধিঃ মানতদানকারীকে মানতদানকালের পূর্বে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরিধানকরতে হয়, মানতকালে যে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলি বা পূজা দেওয়া হবে তাঁকে প্রার্থনা এবং মানত করা কারণ আপন মনে স্বরণ। এ ধরনের মানতদানে শুধুমাত্র শনি ও মঙ্গল বারকে বেছে নেওয়া হয়। কোনো বিশেষ মন্ত্র পাঠের প্রচলন নেই।

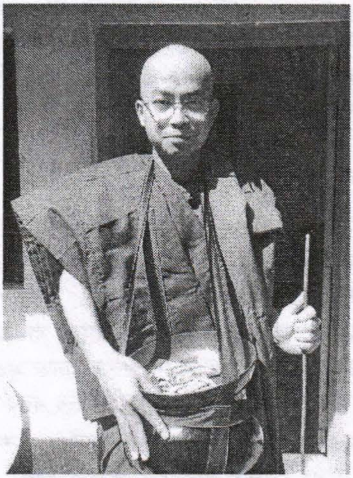

মানত অনুসারে মারমা যুবকের প্রবজ্জা (ক্ষণকালীন ভিক্ষু জীবন) গ্রহণ

মারমা মতে মৃতদেহ সৎকার ও অন্যান্য

মারমা সমাজে কারোর মৃত্যু হলে মৃত্যুর প্রকৃতি,বয়সভেদে,ধর্মীয় ও সামজিকতার মূল্যবোধের কারণে মৃতদেহ সৎকারে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কেউ মারা গেলে প্রথমে মৃতদেহকে প্রথানুযায়ী স্নান করিয়ে মৃতদেহকে নতুন কাপড় পড়ানো হয়। এরপর উত্তর দিকে মাথা রেখে খাটে শুইয়ে মৃতদেহের বুক অবধি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পারিবারিক সদস্যগণ তারপর মন্দিরে গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ফাং করে। ভিক্ষু মৃতের গৃহে উপস্থিত থেকে উপস্থিত লোকজনদের ও মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় ধর্ম দেশনা দিয়ে থাকেন। এসময় উপস্থিত অনেকে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। সামর্থ্য ও মৃতব্যক্তির আত্নীয় স্বজনের উপস্থিত নিশ্চিত করার জন্য ১ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত মৃতদেহ রাখার চল আছে।

তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় মৃতদেহের পাশে বসে 'সি-চাহ্ 'পাঠ করতে হয়। সি-চাহ্-এর আবার প্রকারভেদ আছে যেমন: নিবানাসু,হারিদামা,মংছেন ইত্যাদি। এগুলো মূলত- বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ, বুদ্ধের নীতি, জীবনী বিষয়ক গাঁথা। শ্মশানে

www.pathagar.com

নেয়ার আগ পর্যন্ত পালাক্রমে সি-চাহ্ পাঠ করা হয়। পাঠ হলেও এতে বিশেষ সুর আছে। তবে বর্তমান মারমা সমাজে (রামগড়, তথ্য সংগ্রহের স্থান) সি-চাহ্ পাঠের সামাজিক বাধ্যবাদকতা নেই। সি-চাহ্ পাঠের ফাঁকে ফাঁকে 'চেহ্' নামক বাদ্য বাজানো হয়।

মৃতদেহ শ্মশানে বহনের জন্য কাঠ,বাঁশ ও রং কাগজ দিয়ে মারমা ঐতিহ্য অনুসরণে বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে কফিন বানানো হয়। এসবে সবাই স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে

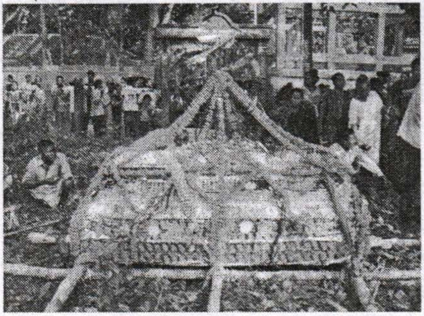

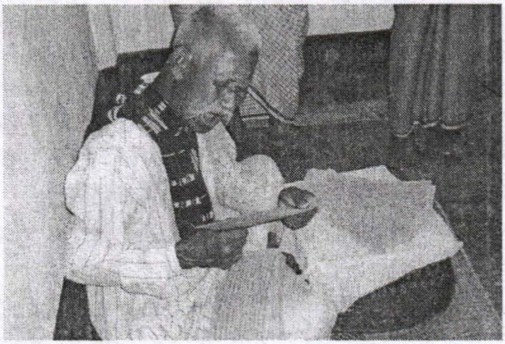

থাকেন। সমাজে ধনপতির মৃতদেহ শ্মশানে বহন কালে মৃতব্যক্তির বাড়ি থেকে শ্মশান অবধি রাস্তায় পয়সা ছিটিয়ে মৃতদেহ বহনের রীতি প্রচলন আছে। এটি মৃত ব্যক্তির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন। সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা ব্যক্তিদের মৃতের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনেরা সাধ্যানুযায়ী চা-বিস্কিট,পান, সিগারেট,শরবত ও জিলাপি দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। মারমা নৃ-গোষ্ঠী সৎকারে অংশগ্রহণকে তিনবার মন্দিরে যাওয়ার সমান পূণ্যের মনে করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শ্মশানে মৃতব্যক্তির কল্যাণে ধর্মদেশনা দেন এবং উপস্থিত সকলে এ সময় পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। ধর্মদেশনার পর মৃতব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠানের দিন উপস্থিত সকলকে জানান এবং সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সাধারণত মৃত্যুর সাতদিনের ভিতর এ আয়োজন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যার দিনকে বেছে নেওয়া হয়। চিতা সাজানোর বেলায় নারী-পুরুষ ভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের বেলায় তিন স্তরের আর নারীর বেলায় চার স্তরের চিতা সাজারো হয়ে থাকে। মারমা সমাজের বিশ্বাস মতে, নারীরা ঘরের রান্নায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার ও সংগ্রহ করেন। এ

www.pathagar.com

সূত্রে নারীদের জ্বালানী কাঠের প্রতি সর্বদা লোভ থাকে। শেষ বিদায়ে কাঠ কম পেলে মৃত্যের আত্মা শান্তি পাবে না এই বিশ্বাসে পুরুষের তুলনায় নারীদের চিতা শয্যায় এক স্তর কাঠ বেশি দেয়া হয়। চিতার পাশে একটি বাঁশে ৭ থেকে ১৫ হাত দৈর্ঘ্যের সাদা কাপড় দিয়ে বানানো স্বর্গীয় পতাকা উড়ানো হয়। মারমারা স্বর্গীয় পতাকাকে 'তাংখ্যই' বলে। কবর বা দাহ করার আগে মৃতের কফিন খুলে আত্মীয়-স্বজনদের শেষবারের জন্য দেখানো হয়। এ সময় মৃতের কফিনে আত্মীয়-স্বজনেরা কিছু টাকাপয়সা দিয়ে থাকেন। এটা পারপারে খেয়ায় পার হওয়ার ভাড়া হিসেবে দেয়া হয়। এরপর উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি চিতার উপর কফিন তুলে দিলে ভান্তে দ্বারা সাদা সুতা দিয়ে তিন/সাত পাক দিয়ে মৃত ব্যক্তির মুক্তির কামনায় সুতার একাংশ স্পর্শ করে আবার মন্ত্র পাঠ করা হয়। এসময় মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা চারপাশে সুতা স্পর্শ করে মন্ত্র শ্রবণ করেন। মন্ত্র শেষ হওয়ার সাথে সাথে সুতা স্পর্শকারীরা যে যার স্পর্শ অংশ হাত দিয়ে কেটে ফেলেন। এ দ্বারা মৃতের সাথে স্বজনদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াকে বুঝায়। মৃত ব্যক্তিটি যদি বিবাহিত হয় তাহলে ভান্তের মাধ্যমে মন্ত্র পাঠ করে প্রতীকী বিবাহ বিচ্ছেদ করাতে হয় ।সব অনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ার পর পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক প্রথম চিতায় আগুন দেওয়া হয়। এরপর অন্যান্যরা দিয়ে থাকেন।

শ্মশানে অনিষ্টকারী ভূত, প্রেত শ্মশানে সৎকারে আসা ব্যক্তিদের উপর ভর করে যেন অনিষ্ঠ করতে না পারে সে জন্য শ্মশানে গমণকারী পরিবার তার ঘরের দরজার পাশে 'কাংমই-রি' ও 'ফুই-আমূহ্' প্রস্তুত রাখেন। কাংমই-রি পানির সাথে কাচাঁ হলুদ মিশ্রিত পানি বিশেষ। 'ফুই-আমূহ্' থালায়--কয়লা দিয়ে সৃষ্ট ধোয়া বিশেষ। শ্মশান থেকে ফিরে প্রথমে মন্দিরের গিয়ে বুদ্ধ বন্দনা , পরে ঘরে গিয়ে 'কাংমই-রি' ও 'ফুই-আমূহ্' গায়ে ছিটিয়ে স্নান করে থাকেন। দু'ভাবে সৎকার সম্পন্ন করা হয়। যথা:

১। দাহ : বার্ধক্যজনিত,রোগজনিত মৃত্যুতে দাহ করা হয়।

২। কবর: নাবালক, অপমৃত্যু, আত্মহত্যা, খুন, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে কবর দেওয়া হয়।

নিজ পাড়া বা গ্রামের বাইরে মৃত্যুতে: নিজ পাড়া বা গ্রামের বাইরে এমনকি চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেলে নিজ বাড়িতে বা পাড়ায় নিয়ে আসার কোন বিধান নেই। এ ক্ষেত্রে শ্মশানে বা বাইরে কোনো পরিত্যক্ত ঘরে রেখে তা পরে সৎকার বা কবর দেওয়া হয়। মারমাদের বিশ্বাস মতে বাইরে থেকে মৃতদেহ আনা হলে অশুভ শক্তি দ্বারা গ্রামে অমঙ্গল সৃষ্টি হয়।

মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানের পুঁথিপাঠক মংক্য মগের সাক্ষাৎকার

নাম: মংক্য মগ (ক্যায়ং ত্যাগা), বয়স-৭৩, পেশা- কৃষি/বাড়ি ভাড়া ব্যবসা।

মংক্য মগের দুই স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সাথে একটি মেয়ে রয়েছে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দুই ছেলে রয়েছে। বর্তমান স্ত্রীর নাম ম্রাসাং মগিনী, বয়স-৬১।

সমন্বয়কারী: আপনি কত বছর ধরে পুঁথি পাঠ করছেন?

মংক্য মগ: আনুমানিক ৩০ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঠ করে আসছি।

www.pathagar.com

সমন্বয়কারী: পুঁথিটি কোন হরফে লেখা?

মংক্য মগ: এটি মারমা হরফে লেখা।

সমন্বয়কারী: কার কাছে পুঁথি পাঠ শিখেছেন?

মংক্য মগ: এই পুঁথি পাঠে আমার সুনির্দিষ্ট কোনো গুরু নেই। তবে মারমা হরফ পড়া শিখেছিলাম ছোট খেদা বৌদ্ধবিহারের তৎকালীন বিহার অধ্যক্ষ বারত ভান্তে কাছে।

সমন্বয়কারী: আপনি সাধারণত কি ধরনের পুঁথি পাঠ করেন?

মংক্য মগ: আমি বিশেষ করে 'নিবেংনেসু' পুঁথি পাঠ করি। 'নিবেংনেসু'-র সরল বাংলা করলে দাঁড়ায় 'নির্বাণ- প্রত্যাশী'।

সমন্বয়কারী: কী উপলক্ষে সাধারণত পুঁথিটি পড়া হয়?

মংক্য মগ: সাধারণত মারমা সমাজের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ পেলেই স্ব-উদ্যোগে নিজের পুঁথি সংগে করে মৃতের বাড়িতে গিয়ে পুঁথি পড়ি। পুঁথিটি আসলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষেই পড়া হয়।

সমন্বয়কারী: এই পুঁথি পড়ার জন্য আপনি কি কোন সম্মানী পান?

মংক্য মগ: না। আমি কোনো অর্থের বিনিময়ে পুঁথি পড়ি না। সম্মানীর চেয়ে সম্মানই বড়। মৃত ব্যক্তির মঙ্গল, শবদেহ দাহ কার্যে উপস্থিত সকলের এবং নিজের পূণ্য কামনায় পুঁথি পড়ি। তাই তো এর নাম 'নিবেংনেসু'। অর্থাৎ নির্বান প্রাপ্তির আশা।

সমন্বয়কারী: আপনি আপনার কোন ছেলে বা মেয়েকে এই পুঁথি পাঠ শিখিয়েছেন?

মংক্য মগ: না। নিজের একাগ্রতা না থাকলে এই পুঁথি পাঠ শেখা এতো সহজ নয়।

সমন্বয়কারী: এ পুঁথির বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে কিছু বলুন।

মংক্য মগ: পুরাতন জিনিসগুলোকে এখনকার দিনের ছেলে মেয়েরা আমল দেয় না। এই জিনিসগুলো কিন্তু একদিন হারিয়ে যাবে। তখন চাইলেও এসব পুঁথি শেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না। তাই নিজ উদ্যোগেই সকলের এ ধরনের পুঁথি পাঠ শেখা উচিত। অন্তত নিজের মঙ্গলের জন্য এটি কাজে লাগবে।

নিবেংনেসু পুঁথির ধরণ ও বিষয় বস্তু: নিবেংনেসু পুঁথি দৈর্ঘ্যে- ১ ফুট এবং ৪ ইঞ্চি মাপে বিশেষ কাগজ/তাল পাতা দিয়ে তৈরি। এটি অবশ্যই হলুদ রঙের হতে হয়। পাঠের নির্দিষ্ট সুর আছে। এ পুঁথির বিষয় বস্তু গৌতম বুদ্ধের সমগ্র জীবনকাহিনি, তাঁর দর্শন, ধর্ম দেশনা নিয়ে। এর সুনির্দিষ্ট লেখক নেই। অধ্যায় বিভাজন হয় লেখকের লেখার ধরনের উপর। তবে সাধারণত ১৮ থেকে ৩২ অধ্যায় পর্যন্ত হয়।

বিধি: নিবেংনেসু পুঁথি পাঠকারীকে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে; পাঠের শুরুতে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয় ও নিবেংনেসু পুঁথিকে প্রণাম করতে হয়। মৃত ব্যক্তির মাথার পাশে বসে নিবেংনেসু পুঁথি উঁচু ও পরিষ্কার জায়গায় রেখে পূর্ব পাশ ফিরে পড়ার রেওয়াজ রয়েছে। এ পুঁথি শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পড়ার সময় সুর করে পড়তে হয়। অন্য সময় অর্থাৎ অনুশীলন বা শিখার সময় সুর করে পড়া যাবে না। পাঠের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বয়সের উপর কোন বিধি -নিষেধ নেই। পড়ার শেষে গৌতম বুদ্ধের বন্দনা ও সকল প্রাণির মঙ্গল ও মুক্তি কামনা করে শেষ করতে হয়।

বিশ্বাস: মারমা সমাজে বিশ্বাস আছে যে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ পুঁথি পাঠ করা হলে মৃত ব্যক্তি, শ্রোতা এবং পাঠকারীর পূণ্য ও মঙ্গল হয়।

www.pathagar.com

চাকমাদের মৃতদেহ সৎকার

চাকমাদের কারো মৃত্যু ঘটলে সাধারণত শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হয়। তবে কলেরা, বসন্ত বা এরকম কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে ও দুগ্ধজাত শিশুর মৃত্যু ঘটলে কবর দেওয়া হয়। শ্মশান সাধারণত নদী বা খালের ধারে করা হয়।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়োজেষ্ঠ্যদের মাধ্যমে মৃত দেহের স্নান করানো হয় বাড়ীর উঠানে একটি পর্দার মাধ্যমে আড়াল করে। অনেক ক্ষেত্রে কারো স্ত্রী মারা গেলে তার স্বামী নিজেই তার স্ত্রীকে স্নান করায়। স্নানের পর মৃতদেহকে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর মৃত দেহ মেয়ে হলে সাতটি ও পুরু হলে পাঁচটি বাঁশ উপর দিয়ে শয্যা (সমরেং ঘর) তৈরি করে তার উপর রেখে বাড়ীর বৈঠকখানায় রাখা হয়। মৃত দেহ সমরেং ঘরে রাখার সাথে সাথে মৃতের মাথার দিকে একটি এবং পায়ের দিকে একটি ভাতের মোচা বেঁধে দেওয়া হয়। মোচার ভেতর ভাতের সাথে ডিমের তরকারি থাকে। মৃত ব্যক্তির বুকের উপর একটি টাকা সম্ভব হলে রূপার মুদ্রা রাখার নিয়ম রয়েছে। মৃতদেহের বুকের উপর বিনি চালের খই ও ফুল দেওয়া হয়। আত্মীয়স্বজনরা দেখতে আসলে ফুল ও টাকার কয়েন বুকের উপর রাখে। পরে লুরি বা ভিক্ষু'র নেতৃত্বে নানা মন্ত্রপাঠ করা হয়। চাকমারা সাধারণত দুই বা তিন দিনের বেশি মৃতদেহ ঘরে রাখে না।

চাকমা সমাজে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ঘরে লোকেরা মৃতদেহ সৎকার না করা পর্যন্ত বাড়িতে কোন রান্নাবান্না করে না। আত্মীয়দের বাসায় খাওয়া দাওয়া করে। মৃতদেহ সৎকার করার পরই তারা রান্নাবান্না করে। এছাড়া মৃতের পরিবারের লোকজন সপ্তাহব্যাপী নিরামিষ আহার করে, মৃতের গোষ্ঠিভুক্তরা এই সময় পাঁচদিন এবং অন্যান্য আত্মীয়রা তিনদিন পর্যন্ত নিরামিষ আহার করে।

শবদাহ করার রাতে মৃতের উদ্দেশ্যে আধ সের পরিমাণ চাউল নতুন মাটির হাড়িতে রান্না করে ডিম সিদ্ধসহ উনুনের উপর ঢেকে রাখা হয়। উনুনের চারিদিকে তুষ বা চাউলের গুঁড়া ছিটিয়ে রাখা হয়। চাকমা সামাজিক বিশ্বাস অনুসারে, মৃত ব্যক্তি পরকালে যেরূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, সেই মানুষ, পশু-পাখি বা কীটপতঙ্গের রূপ নিয়ে রাতের যে কোন সময় সে তা খেয়ে যাবে। শবদাহ করার জন্য আসা ভিক্ষুদেরকে সকালে হ্যাপ্রাই সুয়েং বা পিণ্ডপাত খাওয়ানো হয়।

শবদেহ সৎকারের পরদিন মৃতের পরিবারের লোকজন শ্মশানের ছাই ও হাড়গোড় নিয়ে মাটির হাড়িতে ভরে কাপড় দিয়ে হাড়ির মুখ বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দেয়। এরপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চিকন টেংরার চারটি ঘেড়া বানিয়ে তার ভেতর পুরনো দা, পানির কলসি, হাতপাখা, বাঁশের হুক্কা রেখে আসা হয় এবং মৃতব্যক্তিকে সাতদিন্যা বা সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। এই হাড় ও ছাই ভাসানোর দিনেই মৃতের ছেলেরা শুচিতা লাভের জন্য মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলে।

মৃতদেহ সৎকারের সাতদিনের দিন হাড় ও ছাই ভাসানোর দিনের নিমন্ত্রণ অনুসারে মৃতের আত্মাকে আকভাত দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হয়। সাপ্তাহিক ক্রিয়া ছাড়াও মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি কামনা করে প্রতি বছর মৃতের পরিবার পরিজনরা মৃত ব্যক্তির নামে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা বজরী করে থাকে।

www.pathagar.com

চাকমা সমাজের রাজা বা সম্ভ্রান্ত লোক মারা গেলে গাড়ি টানার বিধান রয়েছে। গাছের চাকার উপর স্থাপিত রথের উপর শবদেহ রেখে উভয় দিকে লম্বা দড়ি দিয়ে এই গাড়ি টানা হয়। ফুটবল খেলার মত করে এক দল হেরে গেলে পাশ বদল করে টানা হয়। গাড়ি টানা শেষে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।

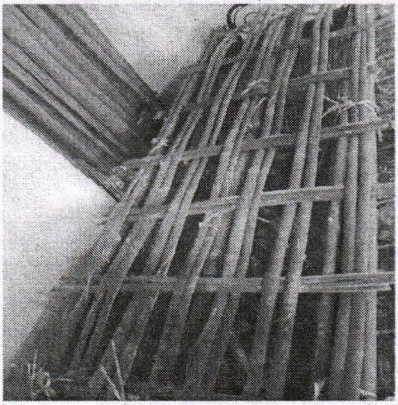

কাঁচা পবিত্র বাঁশ দিয়ে তৈরি চাকমাদের শবদেহ বহনের খাটিয়া

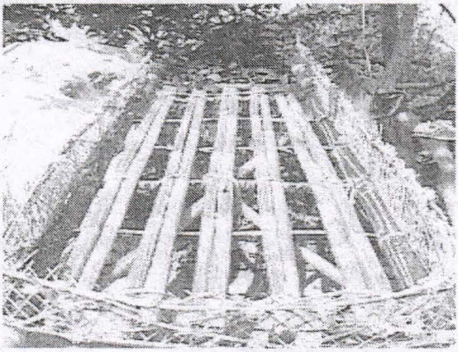

কারুকার্য খচিত বাঁশের তৈরি ত্রিপুরাদের শবদেহ বহনের খাটিয়া

ত্রিপুরাদের মৃতদেহ সৎকার

ত্রিপুরা আদিবাসীদের কোন লোক মারা গেলে মৃতদেহকে উঠানে নামিয়ে স্নান করানো হয়। এরপর নতুন কাপড় পড়িয়ে বাঁশের তৈরি মাচায় (চোক্ত) রাখা হয়। এরপর একটি মুরগি মৃতব্যক্তির পায়ের কাছে নিয়ে কেটে রান্না করে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় সাথে ভাত ও অন্যান্য তরকারিও দেওয়া হয়। ভাত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বেতের তৈরি ঝুড়ি বিশেষ (মাইচাম) এর উপর কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর দেওয়া হয়।

আত্মীয় স্বজনদের খবর পৌছানো হয়। ক্ষেত্র বিশেষে মৃতদেহ এক বা দুই দিনও রাখা হয় যদি না তাঁর সন্তানরা এসে পৌছে। এরপর শ্মশানে বাঁশের তৈরি একটি খাটিয়া (খায়নোক) করে নিয়ে যাওয়া হয়। সাথে বাঁশের একটি ছাতা তৈরি করে এর

www.pathagar.com

মাথায় বেতের একটি ঘুঘু পাখি বাসানো হয়। গ্রামের সবাই মিলে শ্মশানে লাকড়ি সংগ্রহ করে দেয়। শ্মশানে মাংচোক (চিতা) লাকড়ি সাজানোর বিশেষ কিছু নিয়ম রয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭টি ধাপে ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫টি ধাপে লাকড়ি সাজাতে হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় সংসারে মেয়েরাই লাকড়ি সংগ্রহ করে তাই মেয়েরা লাকড়ি বেশি ব্যবহার করবে। মৃতদেহ কখনো দুপুরের আগে দাহ করা হয় না। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর শবদেহ বহনকারীরা সাতবার চিতায় ঘোরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করা হয়। মৃত ব্যক্তিকে পুরুষ হলে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ও স্ত্রী হলে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর করে শোয়ানো হয়। চিতায় তোলার পর একজন অচাই (পুরোহিত) বাঁশের চোঙ্গায় পানি নিয়ে মন্ত্র জপ করে। এসময় মৃত ব্যক্তির ছেলে ও মেয়ে ও নিকট আত্মীয়রা সবাই ঐ বাঁশের চোঙকে স্পর্শ করে। মন্ত্র শেষে সুতার তৈরি প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়। মৃতব্যক্তির ছেলেরা লাকড়ি সংগ্রহকারীদের মূল্য পরিশোধ করে। লাকড়ি সংগ্রহকারীরা মৃত ব্যক্তির স্বর্গ লাভের জন্য প্রার্থনা করে। এসময় চিতার বাইরে চতুর্দিকে ৪টি ঘিলা ছুড়ে মারা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে-মৃত বৃক্তি কোন কারণে বা কোন পাপের কারণে যদি স্বর্গ লাভে সমস্যা হয় তখন এই ঘিলা চারা গজিয়ে লতা হলে যেন তা বেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। যারা মৃতব্যক্তিকে দাহ করতে আসে তারা সকলে মৃতব্যক্তির নামে নগদ টাকা (আলো) দান করে।

এরপর বড় ছেলে মৃতব্যক্তির মুখাগ্নি করে ও একে একে সকলে চিতায় আগুন দেয়। শ্মশান থেকে ফিরে সকলে স্নান সেরে তবেই যার যার বাড়িতে প্রবেশ করে।

মৃতব্যক্তি দাহ করার ১০ বা ১৩ দিন পর শ্রাদ্ধক্রিয়া করা হয়। দাহ করার সময় পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে কোন সময় শ্রাদ্ধ করা হবে তা ঘোষণা দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধক্রিয়া না করা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির বড় ছেলে বা এদের যে কেউ একজন নিরামিষ ব্রত পালন করে। এসময় তার সন্তানেরা উচ্চাসন ও জুতা-সেন্ডেল পরিহার করে। শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার সময় নিকট আত্মীয়রা ভোগ সামগ্রী (চাউল, সবজি, শুটকি মাছ, তেল, বিস্কুট ইত্যাদি) ও কাপড় চোপড় এনে দেয়। তাদের সব জিনিস একত্র করে (আইটেম ভিত্তিক) বাঁশের চোঙ্গায় নদীর ধারে গিয়ে রান্না করা হয় ও কাপড়সমূহ লম্বা বাঁশে টাঙ্গানো হয়। সেখানে একটি (নোকসা থুতরো) বাঁশের ঘর তৈরি করা হয়। ঘরে রান্না করা ভাত ও তরকারি মাইচাম (বেতের তৈরি ঝুড়ি বিশেষ) এর উপর কলা পাতায় পরিবেশন করা হয়। একজন অচাই (পুরোহিত) বাঁশের চোঙায় পানি নিয়ে মন্ত্র জপ করে। প্রথমে বড় ছেলে ও পরে নিকট আত্মীয়রা একে একে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভাত ও অন্যান্য তরি-তরকারি ও ফল ফলাদি উৎসর্গ করে। উৎসর্গ শেষে ভাতের সম্মুখে কলা পাতায় চাউলের গুড়া ছিটিয়ে দিয়ে সবাই চলে আসে। কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখা হয় যে যদি উৎসর্গকৃত খাদ্য কোন প্রাণি খেয়েছে তবে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ খাবার গ্রহণ করেছে হিসেবে ধরা হয়। যদি স্পর্শ না করে তাহলে ধরা হয় যে মৃত ব্যক্তি কোন কারণে অসন্তুষ্ট। এসময় করা পাতায় রাখা চাউলের গুড়ার উপর কোন পায়ের ছাপ আসে কিনা দেখা হয়। অনেক সময় বিড়াল বা হাঁস বা বাঘ বা বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের চিহ্ন দেখা হয়। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণীর দেহে গিয়েছে।

সবশেষে ব্রতপালনকারী খুমপ্লা (জুমের ফুল বিশেষ) পাতা নিয়ে তা দুহাতে ছিঁড়ে ফেলে এবং একটি বাঁশ দুই ফালা করে বলে আজ থেকে তোমার সাথে আমাদের সকল

www.pathagar.com

বন্ধন ছিন্ন হল, তুমি মুক্ত, আমাদের সাথে আর কোনো সম্পর্ক থাকল না। যেভাবে খুমপ্লা পাতা ছিন্ন করা হল তেমনি তোমার সাথের সম্পর্ক ছিঁড়ে গেল। এই বলে ছেঁড়া পাতা পিছন থেকে ছুঁড়ে মারা হয় ও শ্রাদ্ধক্রিয়ার স্থান ত্যাগ করা হয়। শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার পর শ্মশানের পাশে একটি ছোটঘর (চারাই নোক) নির্মাণ করা দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর কিছু পূজার বিবরণ

খ্রাং মাতাই : ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠি সাধারণত এ পূজাকে কোন সাধারণ অসুখ বিসুখের নিরাময়ের জন্য দিয়ে থাকে। এ পূজার জন্য একটি ছাগল, মুরগির বাচ্চা ৬টি ও একটি শুকর বা হাঁসের প্রয়োজন হয়। নদী বা ছড়ার পারে এ পূজা দেওয়া হয় সকালের দিকে। এ পূজায় মূলত বিখিত্রাই দেবতাকে পূজা দেওয়া হয়। এ পূজায় যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তা এই রূপ- আহাঁ..... আখাত্রাই বিখিত্রাই, নাসা অমুকনি কুলুম হাময়া, কাসা হাময়া সিয়ই তিলাংদি। তকসা গামবাই, খামচি গামবাই.. .. .. .. ।

খ্রোক/খরক সুনাই (পারিবারিক বাৎসরিক শুদ্ধিকরণ পূজা) : ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠি সাধারণত বৎসরে একবার এ পূজা দিয়ে থাকে তাদের পারিবারিক বিপদ আপদ বা কোন অসূচি হয়ে থাকলে তা শুদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। কোন বাড়িতে মৃত্যু বা এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকলেও পরবর্তীতে যে কোন কাজ আরম্ভ করার আগে বা গৃহ নির্মাণ করার আগে বা জুম চাষ শুরুর আগে এরূপ শুদ্ধি পূজা দিয়ে থাকে।

এ পূজার জন্য ৭টি মুরগীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি হাঁস বা একটি ছাগলের প্রয়োজন হয়। বড় গৃহস্থ বা মহাজনেরা ছাগল দিয়ে এ পূজা দেয়। এ পূজার সময় বাড়ীর সকলে ছড়া বা নদীর পাড়ে পূজার জন্য তৈরি মাচাই সারি বেঁধে বসতে হয়। অচাই তাদেরকে সাত পাকে মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঘুরে। তিন বার মন্ত্র

www.pathagar.com

পাঠ করে ঘুরার পর সকল সদস্য দিক পরিবর্তন কার ঘুরে বসতে হয়। অচাই সুর করে মন্ত্র পাঠ করেন এ রকম-

অঁ বান্ধে না বান্ধে
আজুগা সনিবার
আজুগা মঙ্গলবার
খুয়া না ফেলাইব
খুসি না ফেলাইব
অমুক-এর দুখ বান্ধে না বান্ধে
শোক বান্ধে না বান্ধে.........." ইত্যাদি।

এরপর অচাই ঐ পরিবারের সকল সদস্যদের মাথায় একটা ডিম স্পর্শ করে মন্ত্র মুখে মুখে পাঠ করে ছড়া বা নদীর ভাটির দিকে ফেলে দেয়। এসময় সেই দিকে উঁকি দেওয়া বা তাকানো মানা। নদীতে আসার সময় ঐ বাড়িতে কোনো আগুন এবং টক জাতীয় জিনিস রাখা নিষেধ। অচাই সবাইকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাড়িতে প্রবেশের পথে অচাই একটা মুরগির মাথা পুঁতে দেয় ও এর উপর আগুন জেলে দেয়। পরিবারের সদস্যরা একে একে ঐ আগুনে পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

হুক খাং (জুমচাষের প্রাক্কালে কৃত প্রতিজ্ঞা)

খাং মানে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া। ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠি জুম করার আগে এক বছরের জন্য জুম ভূমিকে শুদ্ধি করে থাকে। এ পূজার জন্য কোন কিছু লাগে না। শুধুমাত্র ৮টি বড় (বাজ্যা) বাঁশের ছোট ছোট কঞ্চি ও একটি বড় আকারের কঞ্চির প্রয়োজন। এ পূজায় প্রধানত বুড়াসা দেবতাকে একবছরের জন্য এ জুম ভূমির মালিকের সকল প্রকার আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য শপথ করানো হয় এবং জুমের মালিক এক বছরের জন্য যে কোন একটি সব্জি না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা রাখে। এ পূজার মন্ত্র সকলের সম্মুখে বলা/উচ্চারণ করা সিদ্ধ নয়।

জুমচাষের সময় ত্রিপুরাদের পালনীয় কিছু নিয়ম ও বিধি নিষেধ

ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠির লোকেদের জুম পাহাড় নির্বাচনের রাতে গৃহকর্তা স্নান করার নিয়ম নেই। জুম কাটার দিন ছাইয়ের পানি দিয়ে রান্না করা তরকারি ও দুধ নিতে হয় যাতে জুম পোড়া দেওয়ার সময় ভালভাবে জুম পুড়ে যায় ও দুধের মত সাদা হয়ে যায়। প্রথম জুম কাটার সময় বিজোড় সংখ্যক লোক থাকতে হয়। আর প্রথম দিন যতজন জুম কাটবে শেষ দিনেও ততজন লোক থাকতে হবে। মাঝখানে যে কোন সংখ্যক লোক থাকতে পারে। জুমে আগুন দেওয়ার পূর্ব রাতে কয়েকজন লোক কর্তিত জুমে গিয়ে কীট পতঙ্গসহ পশু পাখি তাড়ায় ও বন দেবতার উদ্দেশ্যে বলে আসে যে কাল জুমে আগুন দেওয়া হবে যাতে কোনো কীট পতঙ্গ ও পশু পাখি সেখানে না থাকে।

গৃহ নির্মাণ করা

আদিবাসীরা নতুন বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে কিছু রিচুয়াল করে থাকে। যেমন যে স্থানে ঘর নির্মাণ করা হবে সেখানে সুনির্দিষ্ট জায়গায় একটি খুঁটি স্থাপন করা হয়। ঐ খুঁটিতে একটি তীর-ধনুক ও আম পাতা দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং রাতে ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখা হয়। কোন কারণে খারাপ স্বপ্ন দেখলে ঐ স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে ঘর তৈরির জন্য পুনঃ নির্বাচন করা হয়। অথবা ভাল কোন স্থান না পেলে একজন অচাই এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

কিছু পূজা দেওয়া হয় যেন কোনো অপদেবতা থাকলে সেস্থান ছেড়ে চলে যায়। এক্ষেত্রে স্থানভেদে পূজার তারতম্য হয়ে থাকে।

মানাসি

ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা সকল সমাজে মানত প্রথা প্রচলিত। মনের বিশেষ কোনো শুভবাসনা পূরণ, রোগ-বালাই থেকে মুক্তিলাভ, বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার ইত্যাদির আশায় সাধারণত মানত করা হয়ে থাকে। মানতকে ত্রিপুরারা মানাসি বলে। মানত হিসেবে কেউ মঠ-মন্দিরে পূজো দেওয়া, ফুল দেওয়া, কবুতর ওড়ানো, জলাশয়ে মাছ ছেড়ে দেওয়া, দশজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো, বুড়ো-বুড়িদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো, বস্ত্রদান করা, শিশুদের খাওয়ানো, বুড়ো-বুড়িদের স্নান করানো, পশুবলি ইত্যাদি করে থাকে এবং আশা পূরণ হলে মানত অনুসারে তা সম্পাদন করে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. রিপ্রু মারমা, (বয়স ৬৫) সুদু কার্বারী পাড়া, রামগড়,খাগড়াছড়ি।
২. হজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (বয়স ৬২) অচাই, বিনয় কার্বারী পাড়া, জোরমরম, খাগড়াছড়ি।
৩. মংক্য মগ (বয়স ৭৩), চৌধুরী পাড়া, মাটিরাঙ্গা,খাগড়াছড়ি
৪. উক্যচিং চৌধুরী (বয়স ৪৭), মাস্টার পাড়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি
৫. ফনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা (বয়স ৬৫), হাজা পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৬. সমীরণ ত্রিপুরা (বয়স ৪২) , (অচাই), জোরমরম হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়ি।
কৃত্তিকা ত্রিপুরা (বয়স ৪০), অপর্না চৌধুরী পাড়া, খাগড়াছড়ি।
৭. দীপন চাকমা (বয়স ৩৭), চাকুরীজীবী, মিলনপুর খাগড়াছড়ি
৮. ছ মোহন ত্রিপুরা (বয়স ৮৬), জোরমরম, খাগড়াছড়ি
৯. হজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (বয়স ৬২), অচাই, বিনয় কার্বারী পাড়া, জোরমরম, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

ক. লুসি বা লুই

বাঁশে তৈরি ত্রিভূজ আকৃতির এই বিশেষ বস্তুটি মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বাংলা নাম জাখা। চালনির মতো ছিদ্রযুক্ত এই মাছধরার যন্ত্রের উপরের দিকে পুরোটাই ফাঁকা। ত্রিপুরারা বলে 'লুসি' আর চাকমারা বলে 'লুই'। পানি ছেঁকে মাছ খোঁজার সময় পানি যাতে সহজে পড়ে যেতে পারে সে জন্য চালনির মতো ছিদ্র রেখে এটি বুনা হয়। সামনের দিকে সমতল কিন্তু ক্রমাগত ছোট হয়ে লুসিটির দুই কোণ মিশে যায়। ধরার সুবিধার্থে দুই শিংয়ের মতো কঞ্চিগুলো শেষ কোণায় গিয়ে মিলিত হয়। মাঝখানে ধরার জন্য একটি দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। 'লুসি'টি লম্বায় ৩ থেকে ৫ ফুট এবং প্রস্থে দেড় থেকে ফুট পর্যন্ত হয়। লুসির চারিদিকে শক্ত করে এক ইঞ্চি পরিমাণের শক্ত বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাঁধা থাকে।

লুসি দিয়ে মাছ ধরার কৌশল: পাহাড়ির ছড়ার কিনারায় বা মাঝখানে জমে থাকা শেওলা বা পাথরের খাঁজের পাশে লুসিটি পেতে রেখে অতি সাবধানে কায়দা করে শেওলা বা পাথরের ভেতর থেকে ক্রমান্বয়ে হাতড়িয়ে আনতে হয়। সন্ত্রস্ত মাছ, কাঁকড়া ও চিংড়িগুলো এ সময় লুসির কোণের দিকে এসে জমায়েত হয়। তখন লুসিটি তুলে নিলে সব পানি পড়ে যায়। এবং মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়াগুলো রয়ে যায়।

www.pathagar.com

খ. দুক বা দুব

ছড়ার চলমান পানির স্রোতের বিপরীতে দুক পেতে রাখতে হয়। স্রোতের সাথে ভেসে আসা মাছ ও চিংড়িগুলো দুক-এর ভেতরে ঢুকে গেলে ফাঁদে পড়ে যায়।

পশু শিকারের জন্য ব্যবহার করে

১. জাল
২. খৈ
৩. হাকর (গর্ত)

পাখি শিকার কাজে ব্যবহার করে

১. ফু ওয়াসা
২. নীল
৩. বাদু
৪. গুরা

গ. কাপড় বুননের প্রযুক্তি

বুনন শিল্পে আদিবাসী জাতিসমূহ আত্মনির্ভরশীল। আদিবাসী নারীরা জুমের তুলা থেকে নিজস্ব প্রযুক্তিতে চখি, চখার মাধ্যমে সুতা তৈরি করে কাপড় বুনে থাকে। বর্তমানে তুলা পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত না হওয়ায় এবং কষ্ট সাধ্য বলে বাজারের সুতা দিয়ে নিজেদের কাপড় তৈরি করে। বিশেষ করে মেয়েদের রিনাই (পিনন), রিসা (খাদি) ও মাফলার তৈরি করে। কাপড় বোনার জন্য যে সব উপকরণ (যন্ত্রপাতি) দরকার তা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে কাঠ ও বাঁশের তৈরি। নীচে এর নাম উল্লেখ করা হল-

১. **রিথ্রক:** বুনন কাজের জন্য কোমর তাঁতের প্রথম ভাগের বাঁশের খণ্ড বিশেষ, যেখানে সুতা ভর দিয়ে থাকে।
২. **বেসকে/ বেসেকে:** কোমর তাঁতের শেষভাগের বাঁশের খ- বিশেষ।
৩. **স'র' (মাকু):** বাঁশের তৈরি বিশেষ ধরণের প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। বুননের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অংশ।
৪. **রাচামে:** কাঠের তৈরি সুতাকে শক্তভাবে বুননের জন্য যন্ত্র বিশেষ।
৫. **থুরি (মাকু):** বাঁশের তৈরি একধরনের মাকু যা কোমর তাঁতে ব্যবহার হয়।
৬. **সিঁয়া-দক:** বেসকের সাথে দড়ি দিয়ে সংযুক্ত একধরনের কোমরবন্ধনী। পশুর চামড়া বা বেতের তৈরি নমনীয় একটি অংশ। কোমর তাঁত বোনার সময় কোমরের সাথে তাঁতের ভারসাম্য রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।
৭. **সুলে:** সুতার ঘনত্ব সমানভাবে বজায় রাখার জন্য পশুর পাঁজরের হাড়কে সরু ভাবে ছেঁচে বা সজারুর কাঁটা দিয়ে তৈরি।
৮. **রংদা:** নাইলনের সুতা বিশেষ যার সাহায্যে সুতার বুনন বা নকশা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।
৯. **রংদা ওয়াসা:** নাইলনের সুতাকে আটকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি।
১০. **ওয়ানদাই:** কোমর তাঁতকে শক্তভাবে রাখার জন্য খুঁটির সাহায্যে বাঁধা বাঁশের খণ্ড।

www.pathagar.com

ঘ. দাবা (বাঁশের তৈরি হুঁক্কা)

দাবা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ধুমপানের একটি বহুল প্রচলিত বাঁশের তৈরি সরঞ্জাম। দাবা দিয়ে তামাক সেবন করা হয়। আদিবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য লোকাচারে অত্যাবশ্যকীয় একটি বস্তু হচ্ছে দাবা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠি এটি তৈরি করে ও ব্যবহার করে। বাড়ীতে কোন অতিথির আগমনে প্রথমে দাবায় তামাক সাজিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। ত্রিপুরাদের অন্যতম সামাজিক পার্বণ কের পূজার সময় দাবায় তামাক দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পন করতে হয়। ত্রিপুরাদের মৃতব্যক্তির সৎকারের সময় ও পরবর্তীতে শ্রাদ্ধক্রিয়ার সময়ও তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে দাবায় করে তামাক দিতে হয়। দাবায় তামাক সেবনের ক্ষেত্রে মাটির কল্কে ব্যবহার করতে হয়। দাবায় ধুমপানের ক্ষেত্রে যেহেতু পানি ব্যবহার করা হয় তাই ধুমপানে কিছুটা হলেও বিষের পরিমাণ কম হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আদিবাসীরা দাবায় ধুমপান করে থাকেন। জুমের কাজে বিশ্রামের সময় দাবা দিয়ে তামাক সেবন করা হয়।

www.pathagar.com

দাবা তৈরির উপকরণ

এক থেকে দেড় বছর বয়সী দুই গিরা বিশিষ্ট বাজ্যা বাঁশ ও এক গিড়া বিশিষ্ট ছোট মলি বাঁশ।

দাবা তৈরির প্রক্রিয়া

দুই গিড়া বিশিষ্ট মাঝারি আকারের বাজ্যা বাঁশের নিচের দিকের গিড়ায় মাঝামাঝি স্থানে একটি আড়াআড়ি ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রে ছোট আকারের মলি বাঁশের অর্ধেক অংশ চতুর্ভুজাকৃতি করে ছেঁচে প্রবেশ করা হয়। ছোট মলি বাঁশ সংযুক্ত করার সময় এমনভাবে প্রবেশ করতে হয় যেন বাতাস বের হতে না পারে। বাজ্য বাঁশের দুই গিড়ার মধ্যবর্তী সংযোগ পর্দায় ভিতরের থেকে একটি ছোট ছিদ্র করতে হয় ও এর ভেতরে পানি অর্ধেক করে দিতে হয়। দাবা তৈরির সময় তৈরিকারী ব্যক্তি তাঁর কর্মদক্ষতা দাবায় বিভিন্ন আল্পনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

ঙ. গাদা (লাঙ্গল)

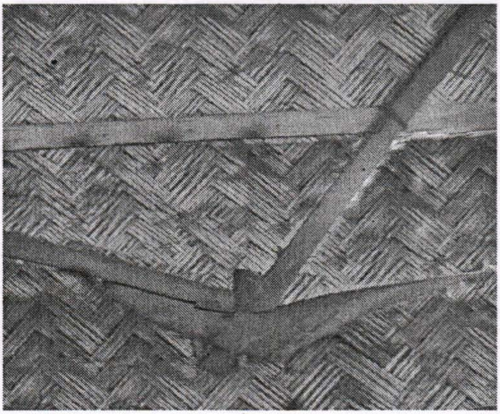

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমতল এলাকার জমি চাষাবাদের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি কৃষি যন্ত্রপাতি হচ্ছে গাদা, যার বাংলা নাম লাঙ্গল। তবে সমতল অঞ্চলের কাঠের লাঙ্গলের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের লাঙ্গলের ফালে ও কাঠের হাতার প্রান্তভাগে কিছুটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গরু বা মহিষের সাহায্যে লাঙ্গল টানা হয়। কলের লাঙ্গলের ভিরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামেও কাঠের লাঙ্গলের চল প্রায় শূণ্যের কোঠায় এসে পড়েছে। তারপরও কিছু কিছু এলাকায় এখনও কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করে চাষাবাদ করা হয়।

লাঙ্গল তৈরির প্রধান উপকরণ হচ্ছে ইংরেজি L এল বর্ণের আকৃতির গাছে গুড়ি, সোজা গাছের ডাল, লোহার তৈরি ফাল (হুকসহ)। বাইস নামক একধরনের লোহার তৈরি কোদালের মত যন্ত্রের সাহায্যে এল আকৃতির গাছকে ছেঁচে নীচের অংশে দেড়ফুট

www.pathagar.com

ও উপরের দিকে আড়াই ফুটের মত লম্বা করে রাখা হয়। এল কোণে বাটালির সাহায্যে চতুর্ভুজাকৃতির একটি ছিদ্র করতে হয় ও এতে সোজা কাঠের তৈরি ঈশ যুক্ত করা হয়। ঈশের শেষ প্রান্তে কিছু খাঁজ করা হয় যা পরবর্তীতে জোয়ালের সাথে দড়ি দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। নিচের অংশের প্রান্তে লোহার তৈরি রম্বসাকৃতির ফাল যুক্ত করা হয়। এই ফাল দিয়ে মাটি কাটা হয়।

চ. বাংবু (মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ)

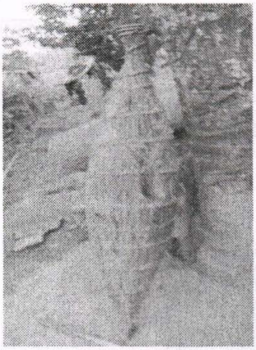

বাংবু ত্রিপুরা শব্দ। নালায় মাছ ধরার ফাঁদ বাংবু যা বাঁশের কঞ্চির তৈরি গোলাকৃতি যার দুইপ্রান্ত ছোট ও মধ্যভাগ মোটা। সাধারণত বাংবু দিয়ে বিভিন্ন মৌসুমে নালায় মাছ ধরা যায়, কারণ এর ফাঁদ দুইমুখী। নালায় ছোট ও মাঝারি আকারের মাছ যেমন পুঁতি, বাইন, মাগুর, শিং, কৈ, শোল, টাকি ইত্যাদি ধরা হয় বাংবু দিয়ে ধরা হয়। বাংবু তৈরির ক্ষেত্রে সুদক্ষ নির্মাণ শৈলী ও পারদর্শিতা দেখা যায়।

বাংবু তৈরির উপকরণ : বাঁশের কঞ্চি ছোট করে ছাঁচা চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা, মরিচার বেত।

বাংবু তৈরির পদ্ধতি : বাঁশের কঞ্চিগুলো একটি গোল করে তৈরি দেড় থেকে দুই ফুট ব্যাসের চাকতির উপর ঘন করে বেতের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে বাঁধা হয়। এই গোল চাকতির উভয়পাশে একটি শক্ত বাঁশের কাঠি একনভাবে পেঁচিয়ে নেওয়া হয় যা শেষ দুইপ্রান্তে ছোট হয়ে শেষ হয়। এরপর ভর দিয়ে ছোট কঞ্চিগুলো বেতের সাহায্যে বাঁধা হয়। মাঝখানে যেখানে গোল চাকতি রয়েছে সেখানে দুইদিকে দুটি ছিদ্র কাটা হয় ও দুটি ফাঁদ স্থাপন করা হয়।

নালায় একটি বাঁধ (পাতার সাহায্যে) দিয়ে বাঁধের ঠিক মাঝ বরাবর বাংবু স্থাপন করা হয়। এতে বর্ষার প্রথম মৌসুমে উজানে উঠেআসা মাছ ধরা পরে এবং বর্ষা শেষে উজান থেকে নেমে আসা মাছ ধরা পড়ে।

ছ. মদ বানানোর পদ্ধতি

আদিবাসী জীবন সংস্কৃতির সাথে মদের একটি সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণে মদের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। সামাজিক চাহিদা মেটানোর জন্য পাহাড়ি পরিবারগুলো নিজেরাই তৈরি করে এবং সন্মানীত অতিথি ও বয়স্কজনরা বেড়াতে আসলে তা পরিবেশন করে। কোনো সম্মানীত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে বা সামাজিক সালিশ-মীমাংসায় গেলে মদের বোতল সাথে নেওয়া একটি সামাজিক শিষ্টাচার। ভাত, আখ, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদি দিয়ে মদ তৈরি করা যায়। আদিবাসী পাহাড়িদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি এবং সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও

www.pathagar.com

পালা পার্বণে সামাজিকভাবে নির্ধারিত পরিমাণের মদ ব্যবহার সিদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি পাহাড়ি নারী পারিবারিকভাবেই মদ তৈরি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে। সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে থেকেই মদ ব্যবহার করতে হয়। অতিরিক্ত মদ্যপান পাহাড়ি সমাজে ঘৃণিত এবং অতিরিক্ত মদ্যপানকারী সমাজে সবসময় অবজ্ঞার পাত্র।

নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মদ প্রস্তুত করতে হয়। প্রথমে ভাতরান্না করার পর ঠাণ্ডা করা হয়। এরপর মুলি (একজাতীয় ইষ্ট) দিয়ে মেখে হাঁড়ি বা ঝুড়িতে ৩ থেকে ৪ দিন ঢেকে রাখা হয়। মুলি নামের ওষুধটিকে ত্রিপুরারা চুয়ান বলে। রসুন ও মরিচের গুঁড়ো এবং সুঘ্রানের জন্য কমলার খোসা চাউলের গুঁড়োর সাথে মিশিয়ে ভিজিয়ে জড়ো করে বিস্কুটের মতো করে দলা পাকিয়ে রোদে শুকিয়ে এই বিশেষ ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। অভিজ্ঞ নারীরা বনের নানা ভেষজ পাতা, শেকড় ও বাকলও এই মুলি তৈরিতে ব্যবহার করে। মুলি মেশানো ভাত মজে গিয়ে এক ধরনের সুঘ্রাণ বের হয়। এরপর পরিষ্কার পানি পরিমাণমত দিয়ে আবারো ৩ থেকে চার দিন রাখতে হয়। মজানো ভাত দিয়ে পরে পাতন প্রণালীর মাধ্যমে মদ তৈরি করা হয়।

চুলার উপর বসানো কলসির ভেষজ উপাদান মেশানো ভাত ঈষৎ-গরম আগুনের তাপে গরম হয়ে ধীরে ধীরে বাষ্প ছেড়ে দিলে সেই বাষ্প অপর প্রান্তে থাকা জগে (এখানে আগে মাটির কলসি ব্যবহার করা হতো) গিয়ে জমা হয়ে তা বোতলে এসে জমতে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. চাকতে ত্রিপুরা (বয়স ৩৮), জোরমরম হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়ি

২. তৈসা ত্রিপুরা (বয়স ১৫), খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

লোকভাষা

চাকমা জাতির ভাষা 'চাঙমা কথা': জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার পরের অবস্থানে রয়েছে চাকমা ভাষা। চাকমারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশ এবং মায়ানমারের কিছু অঞ্চলে বসবাস করেন। এই জাতিগোষ্ঠি পূর্বে ভোটচিনীয় ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে জানা যায়। তবে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বিচারে চাকমা জাতির বর্তমানে ব্যবহৃত ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিকরা ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত করেছেন। জর্জ গ্রিয়ারসন চাকমা (চাঙমা) ভাষাকে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির প্রাচ্য শাখার দক্ষিণ-পূর্বী উপশাখার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। চাকমা ভাষার লেখনরীতি মন-খ্মের লেখ্যরীতির অনুরূপ বলে ভাষাবিদরা মনে করেন। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। বর্তমানে এই ভাষায় ৩৩টি বর্ণ ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে চাকমা বর্ণসংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে নানা মত। ড. গ্রিয়ারসন তাঁর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গবেষণাগ্রন্থে চাকমা ভাষার ৩৩ টি বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে এই বর্ণমালার সংখ্যা ৩৭ টি বলে উল্লেখ করেছেন অন্যদিকে ১৯৫৯ সালে নোয়ারাম চাকমা প্রকাশিত 'চাকমা বর্ণমালার পত্তম শিক্ষা' শিশুপাঠ্য বইয়ে এই সংখ্যা ৩৯টি বলে উল্লেখ করেছেন। মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী চাকমা সমাজে বিশেষত পুরোহিত বা বৈদ্য শ্রেণির লোকেরাই মূলত চাঙমা হরফ চর্চা করতেন। তাঁরা বিভিন্ন তান্ত্রিক বিধান এই হরফে লিখে রাখতেন এবং চর্চা করতেন। নিজস্ব হরফে লিখিত এই চিকিৎসা শাস্ত্রটি 'তান্ত্রিকশাস্ত্র' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এই শাস্ত্রটি চাকমা বৈদ্যদের দ্বারা লিখিত এবং বংশপরম্পরায় ও তাঁদের শিষ্যদের দ্বারা অনুশীলিত। 'আঘরতারা' পুঁথিটি চাঙমা হরফে লিখিত চাকমাদের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে প্রচলিত চাঙমা বর্ণমালার নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো –

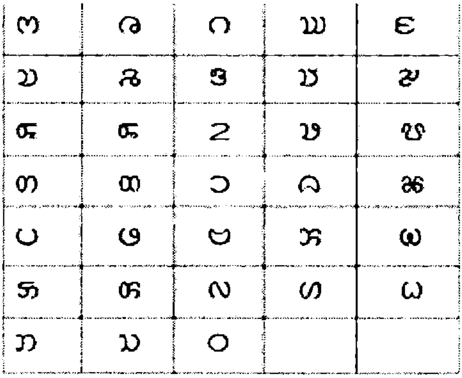

www.pathagar.com

মারমাদের ভাষা 'ম্রাইমা চ্গা': মারমা জাতির ভাষা মারমা ভাষা, যা ম্রাইমা চ্গা নামে পরিচিত। এই ভাষা তিব্বতি-বর্মী শাখার বর্মী দলভুক্ত। মারমা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে, যা ম্রাইমা জা নামে পরিচিত। মারমাদের ধর্মগুরুরা নানা ধর্মীয় পুঁথি ও মন্ত্র-তন্ত্র লিখে রাখার জন্য তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করতেন। অনেকটা বার্মিজ বর্ণমালার অনুরূপ মারমা বর্ণমালায় আঃ আক্খ্রা বা স্বরবর্ণ রয়েছে ১২ টি এবং ব্যয়ঞ আক্খ্রা বা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩ টি। বিচারপতি হাবিবুর রহমান তাঁর লেখা 'বাংলাদেশের নানান ভাষা' নিবন্ধে মারমা ভাষায় ১৩ টি স্বরবর্ণ ও ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। মারমাদের গীতিনাট্য ও প্রাচীন পুঁথিগুলো তাঁদের নিজস্ব হরফে লিখিত। এই ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাই এসব প্রাচীন পুঁথি পাঠ করেন। বর্তমানে প্রচলিত মারমা হরফের ১২ টি স্বরবর্ণ ও ৩৩ টি ব্যঞ্জনবর্ণের নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

আঃ আক্খ্রা (স্বরবর্ণ-১২টি)

အ আঃ	အာ আ	ဣ ইঃ	ဤ ঈ	ဥ উঃ
ဦ উ	ဧ এ	အဲ এহ্	ဩ অঃ	ဪ অ
အံ এইং	အား আহ্			

ত্রিপুরাদের ভাষা 'ককবরক': ত্রিপুরা জাতির ভাষা ককবরক। ককবরক- মানুষের ভাষা, বরক জনগোষ্ঠির ভাষা। সাধারণ অর্থে 'কক' অর্থ 'ভাষা' এবং 'বরক' অর্থ 'মানুষ' বোঝালেও 'ককবরক' মানে বরকদের ভাষা বা ত্রিপুরাদের ভাষাকেই বোঝানো হয়। ঐতিহাসিক বিচারে এই ভাষাটি চীনা-তিব্বতীয় বা ভোট-চীনীয় বা সিনো-টিবেটান ভাষার অন্তর্গত। ভাষা বিশ্লেষকদের মতে সিনো-টিবেটান ভাষার তিনটি মূল শাখা রয়েছে; যেমন- (ক) চীনীয় (Chinese), (২) থাই (Thai) এবং (৩) ভোট-বর্মী (Tibeto-Burmese)। ভাষাবিদ কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী সিনো-টিবেটান ভাষার দুইটি মূল শাখার কথা উল্লেখ করেছেন- (১) ভোট-বর্মী (Tibeto-Burmese) ও (২) শ্যাম-চীনীয় (Siamese-Chinese)। ভোট-বর্মী শাখাটি বার্মা, তিব্বত, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। এই শাখার অসংখ্য উপ-ভাষা রয়েছে। এর মধ্যে হিমালয়ান গ্রুপ, উত্তর আসাম গ্রুপ, তিব্বতী গ্রুপ, আসাম-বর্মী গ্রুপ অন্তর্ভূক্ত। আসাম-বর্মী গ্রুপের অধীনে রয়েছে বোডো-নাগা, মিকির, বর্মী-কুকিচীন গ্রুপ। বোডো-নাগা ভাষাগোত্রের 'বোডো' ভাষা আবার কালের বিবর্তনে

www.pathagar.com

নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। ককবরক এই শাখা-প্রশাখার মধ্যে অন্যতম। শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণের দিক থেকে ককবরক অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা। এটি বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম রাজ্যভাষা। ত্রিপুরাদের প্রায় ৩৬টি দফা বা গোত্র ককবরকের বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে।

পূর্বে 'কলমা' নামের একটি নিজস্ব হরফে ককবরকে লেখা হতো বলে জানা যায়। ত্রিপুরা মহারাজাদের বংশানুক্রমিক পরিচয় নিয়ে লেখা 'রাজরত্নাকর' নামের পুস্তকটি দুর্লভেন্দ্র চন্তাই নামের একজন রাজপুরোহিত কর্তৃক 'কলমা' হরফে লেখা হয়েছিল বলে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের বরাতে জানা যায়। পরে শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর পণ্ডিতদ্বয়ের মাধ্যমে এটি সংস্কৃত ও বাংলায় অনুবাদ করা হয়। ভাষাগবেষক ড. ফ্রাঁসিস জেকুইসন ককবরক লেখার জন্য ৬ টি স্বরধ্বনি ই, এ, অৗ (উ এবং ও-এর মাঝামাঝি উচ্চারণ), আ, অ, উ (এখানে ইংরেজি এ + আই যুক্ত করে 'আই' এবং ডব্লিউ + আই যুক্ত করে 'ঐ' দুটি 'যুক্ত-স্বরধ্বনি' বা 'ডিপথাং'-এর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন) এবং ২০ টি ব্যঞ্জনধ্বনি ম, ন, ং, ব, গ, প, ত, ফ, থ, খ, জ, চ, স, র, ল, হ, য়, ওয়া এবং দুইটি নিম্নস্বর ও উচ্চস্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে ককবরক লেখার জন্য বাংলা ও রোমান উভয় হরফ ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের ত্রিপুরারা রোমান হরফে ককবরক চর্চা করে।

ব্যয়এঙ আক্ষ্রা (ব্যঞ্জন বর্ণ -৩৩টি)

কাঙ্খ্রী	খাঃখুয়ে	গাঃএঙ	ঘাঙ্খ্রী	ঙাঃ
চাঃলুং	ছাঃলিং	জাঃগুয়ে	ঝাঃম্রাংছুয়ে	এ্রাঃ
টাঃসলাংখে	ঠাঃওয়েংবে	ডাঃরেংগৌ	ঢাঃরিমু	নাঙ্খ্রীঁ
তাঃওয়েংবু	তাঃছেংথু	দাঃদুয়ে	ধাঃউগ্রহ্	নাঃএঙ
পাঃজৌ	ফাঃউথু	বাঃথাগ্রহ্	ভাঃগুং	মাঃ
য়াঃ	রাঃগৌ	লাঃ	ওয়াঃ	সাঃ
	হাঃ	লাঙ্খ্রী	আঃ	

তথ্যনির্দেশ

১. বিদ্যুৎ জ্যোতি চাকমা (বয়স ৪৫), চাকমা ভাষা বিষয়ক প্রশিৰক, মধুপুর, খাগড়াছড়ি।

২. উক্রাচিং মারমা (বয়স ৩৩), মারমা ভাষা বিষয়ক প্রশিক্ষক, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

www.pathagar.com